মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র)

আল-কুরআনের আলোকে

শির্ক ও তওহীদ

আল-কুরআনের আলোকে শির্ক ও তওহীদ
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র)

আল-কুরআনের আলোকে

শির্‌ক ও তওহীদ

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০, দোকান নং – ২০৯
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২।

আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম ঃ ১৯৮৮ ইং
৭ম প্রকাশ ঃ আগস্ট ঃ ২০১২ ইংরেজি
রমযান ঃ ১৪৩৩ হিজরী
ভাদ্র ঃ ১৪১৯ বাংলা

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
খায়রুন প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ
মোস্তফা রশিদুল হাসান
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ঃ
আবদুল্লাহ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তফা কম্পিউটার্স
ফকিরা পুল, ঢাকা।

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস,
২/১, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা।

মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা

AL QURANER ALOKE SHIRK O TAWHID : (Shirk and Tawhid in the Light of Holy Quran) Written by Maulana Muhammad Abdur Rahim and Published by Mustafa Rashidul Hassan, Director, Khairun Prokashani.

August : 2012

Price : TK. 160.00
US. $: 3.00

ISBN : 984-8455-06-X

মুখবন্ধ

একটি ইমারত নির্মাণ করতে হলে সর্বপ্রথম তার বুনিয়াদটি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে হবে। বুনিয়াদ দুর্বল থেকে গেলে তার উপর কোন সুদৃঢ় ইমারত নির্মিত হতে পারে না। নিরেট ইমারতের ন্যায় আদর্শিক ইমারতের বেলায়ও কথটি সমভাবে প্রযোজ্য। একটি আদর্শ যতই আকর্ষণীয়, চিত্তাকর্ষক ও কল্যাণধর্মী হোক না কেন, তার বুনিয়াদটা দৃঢ়ভাবে স্থাপিত না হলে তা ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণে কোন ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে না।

ইসলাম দুনিয়ায় আল্লাহ্ প্রদত্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। তওহীদ এ জীবন ব্যবস্থার বুনিয়াদ। সুতরাং ইসলাম-রূপ ইমারত কোথাও নির্মাণ করতে হলে সর্ব প্রথম এর বুনিয়াদ–তওহীদকেই দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে হবে। এর অন্যথা কোনক্রমেই হতে পারে না। আর এটা করতে হলে তওহীদ-এর বিপরীত শির্ককে সর্বপ্রথমে পরিহার করতে হবে। আলোকে চিহ্নিত করতে যেমন অন্ধকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা দরকার, তওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করতেও তেমনি শির্ক সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকা প্রয়োজন।

তওহীদ শুধু আল্লাহ্র সত্তা সম্পর্কিত একটি তাত্ত্বিক ধারণাই নয়, এটি বাস্তব জীবনেরও এক সুস্পষ্ট নিয়ামক। পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুসারে আল্লাহ্ যেমন সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মৃত্যুদাতা তেমনি তিনি বিধানদাতা, রিযিকদাতা ও মঙ্গলদাতাও। আল্লাহ্র এই গুণরাজি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা এবং সে সূত্রটিই হলো তওহীদ। সুতরাং তওহীদকে গ্রহণ করলে এই গুণরাজির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা চলবে না, করলে তা হবে শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

মানব জীবনে তওহীদ-এর গুরুত্ব অপরিসীম। তওহীদ মানুষকে জীবনের সব মৌল প্রশ্নেরই সুস্পষ্ট জবাব দান করে। এ দুনিয়ায় মানুষ কোত্থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কিভাবে এসেছে–এখানে তার কি করণীয় কি বর্জনীয়-এখান থেকে সে কোথায় যাবে, কেন যাবে–ইত্যাকার সব প্রশ্নেরই ইতিবাচক জবাব পাওয়া যায় তওহীদ থেকে। এই জবাব থেকে মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস যেমন স্থিতি লাভ করে, তেমনি তার কর্মজীবনেও আসে শৃঙ্খলা। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবন থেকে তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পর্যন্ত সর্বত্র গড়ে উঠে এক পূর্ণ সাযুজ্য। জীবনের সব

ক্ষেত্রেই মানুষ হয় এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র বান্দা, অসংখ্য প্রভুর গোলামীর দাবী অগ্রাহ্য করে তার উত্তরণ ঘটে এক পূর্ণ স্বাধীন মানব সত্তায়।

'আল-কুরআনের আলোকে শির্‌ক ও তওহীদ' মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)-এর এক অনবদ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তওহীদ-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যায় শুধু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রমাণেরই আশ্রয় নেন নি, আল-কুরআন থেকে প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহও উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত মুনশীয়ানার সাথে। বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এ ধরনের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এ-ই প্রথম। গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হয়েছিল ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসেই; কিন্তু গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় এর প্রকাশ সম্ভব হয়নি নানা কারণে। অতপর তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয় ১৯৮৮ সালের মাজামাজি সময়ে। আল্লাহ্‌র শোকর, গ্রন্থটি পাঠক মহলে ব্যাপক সাদর লাভ করে। বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এর মুদ্রণ-পরিপাট্যও পূর্বের চেয়ে অনেক উন্নত হচ্ছে।

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন গ্রন্থকারের এই দ্বীনি খেদমত কবুল করুন এবং এর সাহায্যে দেশের মুসলিম জনমানসকে তওহীদের প্রোজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলুন—এই প্রার্থনা করি।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন

গ্রন্থকারের বক্তব্য

কুরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। বিশ্ব মানবতার প্রতি আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ। দ্বীন-ইসলামের যাবতীয় তত্ত্ব এবং জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধানের মৌলিক ধারাসমূহ কুরআন মজীদেই বিধৃত, তা থেকেই গ্রহণীয়।

দ্বীন ইসলামের প্রধান পরিচয়–তা তওহীদী দ্বীন। এই দ্বীন আল্লাহ্ তা'আলার সার্বিক এককত্ব ও অনন্যতা বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল। শির্ক এই তওহীদী আকীদা'র সম্পূর্ণ পরিপন্থী, সোজা বিপরীত দিকে স্থিত। কুরআন শির্ককে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে তওহীদী আকীদা পুরাপুরি গ্রহণের আহবান জানায়। শির্ককে সমূলে উৎপাটিত ও শির্ক-এর যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে ভিত্তিসহ ধ্বংস করে তওহীদী জীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাই কুরআনের লক্ষ্য।

অতীতে প্রথম অবতীর্ণ হওয়াকালে কুরআন মজীদ আকীদার ক্ষেত্রে এই বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল তদানীন্তন জাজীরাতুল আরবে ও পৃথিবীর প্রায় অর্ধাংশে। এখনও কুরআন সেই বিপ্লবেরই ধারক ও বাহক। আকীদা'র ক্ষেত্রে এই বিপ্লব ইসলামী জীবনের প্রথম পদক্ষেপ। তার-ই উপর গড়ে উঠা সম্ভব সুস্থ নির্ভুল সুদৃঢ় এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-প্রাসাদ। তাই তওহীদী আকীদা কুরআন থেকেই জানতে হবে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তওহীদ ও শির্ক-এর স্বরূপ এবং তওহীদের তত্ত্ব ও ব্যাপকতা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে একই তত্ত্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা আয়াতসমূহকে একত্রিত করে। কুরআনের তাফসীর লেখার এ এক অভিনব পদ্ধতি। কতটা সার্থক ও ফলপ্রসূ হয়েছে, তা সুধী পাঠক মণ্ডলীরই বিচার্য।

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
১৯৮৩ইং

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

ইসলামের দৃষ্টিতে শির্ক ও তওহীদ সম্পর্কিত ব্যাপারটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটির রূপ ও প্রকার যত বিভিন্ন ও বিচিত্রই হোক, সেই সব সহ তা দ্বীন-ইসলামে ভিত্তি প্রস্তরের মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী। শুধু ইসলাম-ই নয়, **সকল আসমানী দ্বীন** ও আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতেই এর গুরুত্ব সাধারণভাবেই **স্বীকৃত।**

কুরআনের আয়াতসমূহের উপর একটি উড়ন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, কুরআন আল্লাহ্‌র 'ইলাহী তওহীদ' ও 'রবুবী তওহীদে'র উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে, আকীদা সংক্রান্ত মস্‌লা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্বের উপর ততটা আরোপিত হয়েছে বলে লক্ষ্য করা যায় না।[১]

পরকাল তথা কিয়ামতের দিনের পুনরুত্থানের ব্যাপারটি কুরআনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই। কেননা এ বিষয়টির প্রতি ঐকান্তিক ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যতীত ইসলামী জীবন অবলম্বন কোন ক্রমেই সম্ভব বলে মনে করা যায় না। এই বিশ্বাস ব্যতীত আল্লাহ্ প্রদত্ত কোন আকীদা ও আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন

---

১. তার অর্থ নিশ্চয়ই এ নয় যে, ইসলামে কেবল ঈমানেরই গুরুত্ব, আমল বা শরীয়াত পালনের গুরুত্ব নেই। না, তা আদৌ সত্য নয়। কুরআনে ঈমান ও আমল উভয়ের উপরই প্রবল গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। কুরআনের ৬৩ টিরও বেশী সংখ্যক আয়াতে ঈমানের সাথে সাথে ও পর-পরেই নেক আমলের উল্লেখ হয়েছে। আসল বক্তব্য হলো, ঈমানই মানুষকে নেক আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে বলে ঈমানের গুরুত্ব আমলের তুলনায় বেশী ও প্রথম।

রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

اَلايْمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلُ بِاللّسَانِ وَعَمَلُ بِالارْكَانِ -

ঈমান বলতে বোঝায় দিল দিয়ে আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ, মুখে বলা বা উচ্চারণ কিংবা স্বীকৃতি এবং বিধানসমূহ কাজে পরিণত করা।

অন্য কথায় ঈমান অনুযায়ী আমল হচ্ছে ঈমানের শর্ত। ঈমানের বাস্তবতার প্রমাণ। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالا تَفْعَلُوْنَ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالا تَفْعَلُوْنَ - (الصفت : ٢)

পদ্ধতির ধারণা মাত্র করা সম্ভব নয়। মানুষের দিলের গভীরে কোন কোন দ্বীনী বিশ্বাসের পক্ষেই দৃঢ়মূল হয়ে স্থিত হওয়া সম্ভব নয় পরকাল বিশ্বাস ব্যতীত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআনে সে বিশ্বাসকে গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রথম স্থান দেয়া হয়নি, দেয়া হয়েছে দ্বিতীয় স্থান। এই দৃষ্টিকোণে কুরআনের আয়াতসমূহ বিভক্ত করে চিন্তা-বিবেচনা করলে তা-ই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

কুরআনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করা হয়েছে দ্বীন-ইসলামের মৌল স্তম্ভ (امر الدين) পর্যায়ে। তারই বীজ জনগণের মনের পটভূমিতে সুচারুরূপে বপন করাই কুরআনের প্রথম লক্ষ্য। খুঁটিনাটি বিষয়ের তুলনায় মৌল বিষয়সমূহ বিবেক-বুদ্ধির ক্ষেত্রে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুরআনের চেষ্টা সর্বাধিক। এই বিচারেও পরকাল বিশ্বাসের অপেক্ষা এক আল্লাহ্‌র প্রতি–আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব অনেক বেশী।

লক্ষ্য করা যায়, কুরআনে পরকাল বিশ্বাস পর্যায়ে আয়াতের সংখ্যা হাজার অতিক্রম করে যাবে। আর আইন-বিধান–আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত ও খুঁটিনাটি পর্যায়ের আয়াত সংখ্যা ২৮৮-র কিছু বেশী।[১]

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কুরআন মজীদ চিন্তাগত ও বিশ্বাসমূলক বিষয়াদির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং বেশী সংখ্যক আয়াতে সে বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

আকীদা-বিশ্বাসগত বিষয়াদির উপর কুরআনের এই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের তাৎপর্য সহজেই বোধগম্য হতে পারে।

আমরা নিজস্ব স্বজ্ঞা দ্বারাই বুঝতে পারি, মানুষের বাহ্যিক আচরণ তার চিন্তা-বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। মানুষের কাজকর্ম তার অন্তরের গভীরে নিহিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধেরই প্রতিক্রিয়া, তার বাহ্যিক প্রতিফলন মাত্র। মানুষ যা বিশ্বাস করে তাই সে বাস্তবে করে। ফলে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ দেখেই নিঃসন্দেহে বুঝতে ও জানতে পারা যায় তার অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের স্বরূপ, যেমন ফল দিয়েই চিনতে পারা যায় গাছটি কোন প্রজাতীয়।

বিশ্বাস ও বাহ্যিক কাজের মধ্যস্থিত এই নিবিড় সম্পর্ক ও অনিবার্যতার দরুন মানুষের বাহ্যিক ও বাস্তব জীবনের সংশোধন ও সুষ্ঠু সংগঠন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের অন্তর পরিশোধন ও বিশুদ্ধকরণের উপর নির্ভরশীল এবং অন্তর সংশোধনের পরিণতিতেই বাস্তব জীবন পরিশুদ্ধকরণ সম্ভব। অন্য কথায়, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অন্তর্লোক–তথা ঈমান ও বিশ্বাসকে সংশোধন করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের বাস্তব জীবনের সংশোধন কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

১. হ্যাঁ, ফিকাহ্‌বিদদের মতে আহকাম সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা প্রায় ৫০০ অর্থাৎ স্পষ্ট আদেশ বা নিষেধের উল্লেখ না হলেও এত সংখ্যক আয়াত থেকে শরীয়াতী হুকুম বের করা যায়। অথচ কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা হচ্ছে ৬২৩৬।

মানুষের কর্ম, ক্রিয়াকলাপ ও আচার-আচরণের পরিশুদ্ধি ও সুষ্ঠুতা বিধান অন্য কোন উপায়ে যে আদৌ সম্ভব নয়, তাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। যে ফল পেতে চাওয়া হবে সেই ফলের বীজ বপণ করে তার গাছ সৃষ্টি করাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য ও অব্যাহতভাবে সেই ফল পাওয়ার কার্যকর পন্থা, এ বিষয়ে কারোর মনেই কোনরূপ সংশয় সৃষ্টি হওয়ার একবিন্দু কারণ থাকতে পারে না।

দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণকরণে বিশ্বাসের ভূমিকা

মানুষ স্বভাবতই মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় ও সচেষ্ট। পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার জন্য মানুষ কোন কালেই সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে ও সর্বাধিক মাত্রায় ত্যাগ স্বীকার করতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয়নি। দুনিয়ার জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের করুণ ও রক্তাক্ত ইতিহাস তার অকাট্য প্রমাণ। কেননা মানুষ স্বভাবতই দাসত্ব ও অধীনতা বিরোধী। মানুষের মন জন্মগতভাবেই স্বাধীন–স্বাধীনতাপ্রিয়। দাসত্ব ও পরাধীনতার প্রতি তার তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ একান্তই স্বভাবজাত, নিতান্তই জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিহিত ভাবধারা। পরাধীন জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্পের দৃঢ়তা ও অনমনীয়তার মূলে নিহিত থাকে সেজন্য সর্বশেষ মাত্রার ত্যাগ ও কুরবানী করার জন্য অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা। এই উৎসাহ-উদ্দীপনাই মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করে, তা-ই মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রাম–তথা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। দুনিয়ার কত দেশে কত মানুষই যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য রক্ত ও জীবন অকাতরে দান করে যাচ্ছে, হাসিমুখে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে পড়ছে, শত্রুর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মুখে বুক পেতে দিচ্ছে, মৃত্যুবরণ করছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। পাশাপাশি এ দৃশ্য-ও বিরল নয় যে, মানুষ নীরবে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরে জীবনাতিবাহিত করছে, সকল প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও অপমান-লাঞ্ছনা কোনরূপ প্রতিবাদ ছাড়াই বরদাশত্ করে যাচ্ছে। তারা মৃত্যুবরণের চাইতে জীবনে বেঁচে থাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে যাচ্ছে–তা যত কষ্টের ও লাঞ্ছনার জীবনই হোক না কেন।

কিন্তু একই মানুষ–একই দেশের সমাজের ও অভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন এই মানুষের মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ কেন?... নিশ্চয়ই এর মূলে বাস্তব কারণ রয়েছে এবং সে কারণ যে দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ ও চিন্তা-বিশ্বাসজনিত পার্থক্য, তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রয়েছে, মূল্যবোধে যে তারতম্য রয়েছে, তা-ই উক্ত মানুষগুলিকে দুটি পরস্পর বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছে।

যারা মনে করে নিয়েছে যে, এ জীবন যত লাঞ্ছিত অপমানিতই হোক, মৃত্যুর তুলনায় তাই অধিক প্রিয়, অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারা মৃত্যুর সামান্য আশঙ্কাপূর্ণ অবস্থাকেও বরদাশ্‌ত করা তো দূরের কথা, তার আগমন সম্ভাবনার কথা শুনতেও প্রস্তুত নয়। পক্ষান্তরে যারা লাঞ্ছনায় জর্জরিত জীবনের অপেক্ষা মৃত্যুকে অধিক সম্মানার্হ–অধিক কাম্য বলে মেনে নিতে পেরেছে, তারা মৃত্যুকে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, তার সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেও একবিন্দু দ্বিধাবোধ করবে না। তাই কোথাও মৃত্যু ভয় মানুষকে একান্তই কাতর ও অক্ষম-নিষ্কর্ম বানিয়ে রেখেছে। আবার কোথাও পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল মানুষকে অকাতরে মৃত্যুবরণের উন্মাদনায় পাগল করে তুলেছে। প্রথমোক্ত মানুষ বেঁচে থাকতে পেরেই নিজেদেরকে সার্থক বোধ করেছে। আর শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষ মৃত্যুবরণেই নিজেদের চরম সার্থকতা নিহিত মনে করে অকাতরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। একই মানুষের মধ্যে এ পার্থক্য অনিবার্য এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর তা কেবল মাত্র এজন্য যে, উভয়ের ঈমানে, মূল্যবোধে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

এক শ্রেণীর মানুষ স্বীয় আদর্শ রক্ষা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে। আর তারই পাশাপাশি অপর এক শ্রেণীর মানুষ বস্তুগত জীবনের জন্য মহান আদর্শকে নিঃসংকোচে বিক্রয় করছে, আদর্শ বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্বকে এড়িয়ে যাচ্ছে, অস্বীকার করে চলেছে।...... বস্তুত এ এক বিচিত্র জগত, আরও বিচিত্র এখানকার মানুষ। বর্তমান মুহূর্তে[১] আফগানিস্তান, ইরান ও ফিলিপাইনের মুসলিম মুজাহিদ জনতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রক্তের যে স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে, চীন ও রাশিয়ার অধীন মুসলিম জনতার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত তার ছিটেফোটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অন্তত বাহ্যিক দৃশ্য আমাদেরকে উপরোক্ত তত্ত্বের তাৎপর্য বুঝতে অনেকখানি সাহায্য করছে। এক শ্রেণীর মানুষ দুনিয়ার জীবনের বিনিময়ে পরকালীন জীবনকে অকাতরে বিক্রয় করে দিচ্ছে। আর এক শ্রেণীর মানুষ পরকাল পাওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাসে দুনিয়ার তুচ্ছ সীমাবদ্ধ জীবনকে উপেক্ষা করে চলছে। এ পার্থক্য দুনিয়ার জীবন ও পরকালীন জীবনের মূল্যায়নে মৌলিক পার্থক্যেরই ফসল, তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।

মানুষের জীবনে আকীদা-বিশ্বাসের যে তীব্র ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া রয়েছে তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, কুরআনে যে ইসলামী আকীদা সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর অন্যান্য বিষয়ে

১. উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার এই কথাগুলো বলেছেন ১৯৮৩ সালে। বর্তমানে দৃশ্যপট কিছুটা পরিবর্তিত হলেও মূল বক্তব্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। বরং এর সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছে কাশ্মির আলজেরিয়া, বসনিয়া ও চেচনিয়ার জিহাদ।

অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে তা খুবই স্বভাবসম্মত, যুক্তিসঙ্গত এবং ভারসাম্যপূর্ণ। আর এই দৃষ্টিতেই 'শির্ক ও তওহীদ' পর্যায়ের বিষয়াদি কুরআনে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে আলোচিত হয়েছে। আমাদের নিকটও এই অগ্রাধিকার দান ও অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে। কেননা দ্বীন-ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের ভিত্তি রচনা করে এই আকীদা ও বিশ্বাস। আমাদের বর্তমান গ্রন্থে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি এই মর্যাদা দানই বিশেষভাবে বিধৃত।

কুরআনের তাফসীর রচনার নতুন পদ্ধতি

ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিম দার্শনিক ও কালাম-শাস্ত্রকিদগণ শির্ক ও তওহীদের বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে গবেষণা ও আলোচনা চালিয়েছেন। তাঁরা এ আলোচনায় তওহীদ প্রমাণের অনুকূলে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণও উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সে যুক্তি-প্রমাণসমূহ নিতান্তই তাঁদের চিন্তাপ্রসূত, বিবেক উৎসারিত ও গবেষণালব্ধ। কুরআন ভিত্তিক আলোচনা ও যুক্তি বিশ্লেষণের দৃষ্টান্ত বিরল পর্যায়ের। কুরআন উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-বিশ্লেষণের প্রতি তাঁরা কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এমন প্রমাণ কদাচিৎ পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও তাঁদের মস্তিষ্ক নিঃসৃত যুক্তির অনুকূলে ও সমর্থনে দু'একটি আয়াতের উল্লেখ হলেও তা প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার পায়নি। সে আয়াতকে আলোচনার ভিত্তি বানানো হয়নি। তাতে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে তাঁদের নিজস্ব উদ্ভাবিত যুক্তি ও প্রমাণকেই। সে আলোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তি যে কুরআন ছিল না, তা কুণ্ঠাহীন ভাষায়ই বলা যায়।

বস্তুত যুক্তি উপস্থাপন ও প্রমাণ-বিশ্লেষণের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে নিজস্ব চিন্তা ও যুক্তির সমর্থনে ও তার অধীন কুরআনের আয়াতের উল্লেখ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কুরআন ভিত্তিক আলোচনা, বিশ্লেষণ, নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তি-বিশ্লেষণ তার অনুকূলে প্রয়োগ। প্রথমটিতে মানুষ স্বাধীন ও নিঃসংকোচ, আর দ্বিতীয়টিতে কুরআন আরোপিত চার প্রাচীরের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত। কুরআন উপস্থাপিত আকীদা-বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রমাণে প্রাচীনকালে মুসলিম দার্শনিক, কালাম শাস্ত্রবিদ্গণ প্রথমোক্ত পদ্ধতিরই অনুসরণ করেছেন। যদিও ইসলামী দৃষ্টিকোণে দ্বিতীয় পদ্ধতিই সহীহ্ এবং কাম্য। কেননা কুরআন শুধু আকীদা পেশ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, তার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণের অকাট্য দলীলও উপস্থাপিত করেছে। তাই কুরআনের দাবি ও ঘোষণাবলীর যৌক্তিকতা ও অকাট্যতা প্রমাণে কুরআন উপস্থাপিত দলীলকে যথেষ্ট মনে করতে হবে। মানবীয় চিন্তা-গবেষণা কুরআনী দলীলের আনুষঙ্গিকভাবে সমর্থন দিতে

পারে—একথা ঠিক, কিন্তু তা মৌলিকভাবে কোন কিছু প্রমাণ করতে পারে না। কেননা এমন অনেক দাবিই কুরআনে রয়েছে, যার যৌক্তিকতা ও অকাট্যতা মানবীয় চিন্তা-ভাবনার আওতার মধ্যে নাও আসতে পারে; বরং সেখানে তা ব্যর্থও হয়ে যেতে পারে। তাই বলে কুরআনের দাবি ও ঘোষণা তো মিথ্যা ও যুক্তিহীন হতে পারে না।

প্রাচীন তাফসীর লেখকগণ শির্‌ক ও তওহীদ পর্যায়ের আয়াতসমূহের ব্যাপক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, সন্দেহ নেই। তাঁরা সে আলোচনায় নিজেদের তাত্ত্বিক ও হাদীস সংক্রান্ত ইলমের যথেষ্ট সমাবেশও ঘটিয়েছেন। তবে তা হয়েছে এক-একটি সূরা ও এক-একটি আয়াত অনুক্রমে। তাতে কোন একটি বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত আয়াত এক সাথে আলোচিত হয়নি। ফলে কোন একটি বিষয়ও সম্যক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এক স্থানে পাওয়া সম্ভব নয়। একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় অনুরূপ আরও দু-একটি আয়াতের উল্লেখ হয়নি, তা-ও নয়। কিন্তু তবুও বলা যেতে পারে যে, কোন বিষয়ের সমস্ত আয়াত একত্রিত করে সেসবের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৎসংক্রান্ত সম্যক জ্ঞান ও তত্ত্ব উপস্থাপিত করতে চেষ্টা আজ পর্যন্ত করা হয়নি। (প্রাচীন তাফসীরসমূহ সম্পর্কে এটা সাধারণ কথা। ব্যতিক্রম নেই, তা বলা হচ্ছে না।) ফলে শির্‌ক ও তওহীদ ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা ও জ্ঞান বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এক স্থানে সেই বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা ও তা পাঠ করে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ সম্ভবপর হয় না।

এই কারণে আমাদের বর্তমান গ্রন্থে আমরা এক ভিন্নতর এবং অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। এ পদ্ধতি হচ্ছে, শির্‌ক ও তওহীদী আকীদার বিভিন্ন সূরায় বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা এ আয়াতসমূহকে যথাসম্ভব এক স্থানে উদ্ধৃত করে এবং সেসবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে সে বিষয়ে কুরআনের সম্যক বক্তব্যকে উদ্ঘাটিত ও স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করা। এক কথায় বলা যায়, এ হচ্ছে কুরআনের বিষয়ভিত্তিক তাফসীর রচনা। এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়নি বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না।

এ পদ্ধতির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কিছুমাত্র সামান্য নয়। তা উপেক্ষণীয়ও নয়। কেননা এক-একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের আয়াত বিভিন্ন সূরা বা একই সূরার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। অথচ কুরআনের প্রত্যেকটি সূরায় অথবা বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত আয়াতে সেই বিষয়ের বিভিন্ন দিকে ইঙ্গিত করেছে। এমনকি কোন একটি আয়াতের বিভিন্ন অংশেও রয়েছে বিভিন্ন—এমনকি পরস্পর বিরোধী বা বাহ্যত সম্পর্কহীন বিষয়ের দিকে ইশারা। এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এক-একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের আয়াত বা আয়াতাংশকে এক স্থানে একত্রিত করা

হলেই সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের সর্বদিক সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এজন্য আয়াত সংগ্রহের এবং এক-এক বিষয়ের অধীন সেগুলিকে একত্রিতকরণের একটা সার্থক ও ব্যাপক অভিযান চালানো অপরিহার্য বোধ হয়েছে। এর ফলে আরও একটি বড় ফায়দা পাওয়া গেছে। তা হচ্ছে, কোন একটি আয়াত হয়ত সম্যকভাবে বুঝতে পারা সম্ভব হয়নি। 'ওহী' নাযিল হওয়ার সময় থেকে আমরা অনেক দূরে অবস্থিত এবং সে আয়াতসমূহের নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিত বা পটভূমির সাথে আমরা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত নই, সেই সাথে আয়াত নাযিল হওয়াকালীন সামাজিক অবস্থাও বর্তমানে নেই। এমত অবস্থায় এক-এক প্রসঙ্গের সমস্ত আয়াত বা আয়াতাংশ এক স্থানে একত্রিত করে সার্বিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করেই আমরা সে আয়াতসমূহের গভীরে নিহিত তত্ত্বের মণি-মুক্তা আহরণ করতে পারি এবং এভাবে প্রত্যেকটি আয়াতের অস্পষ্টতাও দূর হতে পারে। স্বয়ং রাসূলে করীম (স) এ দিকেই ইশারা করেছেন তাঁর এই বাণীর মাধ্যমেঃ

إِنَّ الْقُرْآنَ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا-

কুরআনের কতকাংশ অপর কতকাংশের ব্যাখ্যা করে।

আমাদের অনুসৃত বর্তমান পদ্ধতিতেই রাসূলে করীম (স)-এর এ কথার সার্থকতা ও বাস্তবতা নিহিত। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এ পর্যায়ে হযরত আলী (রা)-র এই কথাটি উদ্ধৃত হয়েছেঃ

كِتَابَ اللّٰهِ تُبْصِرُوْنَ بِهٖ وَ تَنْطِقُوْنَ بِهٖ وَ تَسْمَعُوْنَ بِهٖ وَ يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ يَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلٰى بَعْضٍ.

আল্লাহ্‌র কিতাব এমন যে, তারই সাহায্যে তোমরা দেখবে, কথা বলবে, শুনবে। এই কিতাবের কতকাংশ অপর কতকাংশের সাহায্যে কথা বলে, কতকাংশ অপর কতকাংশের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

কুরআনের আয়াতসমূহের বিভিন্ন দিক ও দিগন্ত

আমরা যখন লক্ষ্য করি যে, চিন্তাবিদ-গবেষকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকতর বিকাশ ও বিবর্তন এবং কালের অগ্রগতির কারণে নবতর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠী তাদের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তত্ত্ব সামষ্টিক রাজনৈতিক, নৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে উচ্চতর ও চিরন্তন প্রশস্ততা সহকারে

কুরআন থেকে গ্রহণ করতে শুরু করেছেন, তখন আমাদের অবলম্বিত পদ্ধতির তাফসীরের গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

সমকালীন ইসলামী গবেষকগণ এই নরতর পদ্ধতিতে অধ্যয়ন, আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কুরআনুল করীম থেকে এমন সব মহামূল্য তত্ত্ব উদ্ধার করছেন, যা প্রাচীন চিন্তাবিদ গবেষকদের নিকট ছিল সম্পূর্ণরূপে অচিন্তনীয়। কেননা কুরআন মজীদ থেকে এসব তত্ত্ব উদ্ধার ও দিগন্ত উম্মোচনের আধুনিক পদ্ধতি তাঁদের করায়ত্ত ছিল না।

বস্তুত কুরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার এক চিরন্তন ও শাশ্বত কিতাব। তা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এক কূল-কিনারাহীন মহাসমুদ্র। তার মধ্যে রয়েছে অশেষ অফুরন্ত জ্ঞান তত্ত্ব, অনায়ত্ত অসংখ্য দিক ও দিগন্ত। মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-শক্তি তা থেকে নিত্য নতুন তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম। তাতে যতই অনুসন্ধিৎসু ডুব চালানো হবে, তার গভীর তল থেকে ততই নিত্য নতুন জ্ঞান-মুক্তা আহরণ সম্ভব। প্রত্যেক ডুবেই সম্ভব সম্পূর্ণ অভিনব মুক্তা লাভ। প্রত্যেক যুগের সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ, গবেষকগণ মানব জীবনের জন্য যুগোপযোগী আইন-বিধান ও তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম হবে যদি তাঁরা কোন পর্যায়েই নির্ভুল পথ না হারান।

কাজেই বিশ্বাস করতে হবে যে, কুরআন থেকে কল্যাণ লাভ কেবলমাত্র প্রাচীনকালীন বিশেষজ্ঞ, ফিকহ্‌বিদ, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের অবদানের উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে থাকা এবং মনে করা যে, কুরআন থেকে অতীতে যা কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তা-ই তার শেষ দান— এক্ষণে তা বন্ধ্যা, নতুন কিছু দিতে অক্ষম—একেবারেই অসমীচীন।

পদার্থবিজ্ঞানী, গণিত শাস্ত্রবিদ ও মানবীয় জ্ঞান তাত্ত্বিকদের পক্ষে কুরআনুল করীম থেকে নবতর সূক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্ধার করতে পারা—মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস দর্শন পর্যায়ে সম্পূর্ণ নতুন তত্ত্ব লাভ অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন আদৌ কোন শূন্য ভাণ্ডার নয়, কুরআন কিছুমাত্র বন্ধ্যা হয়ে যায় নি। বরং কুরআন এক শাশ্বত মু'জিযা। তাতে আজও নিহিত রয়েছে বিচিত্র দিগন্ত ও অফুরন্ত বিভিন্ন তত্ত্ব। তাতে এত বিশাল তাৎপর্য নিহিত যা ধারণ করা সংকীর্ণ মানবীয় চিন্তা-ভাবনার সাধ্যের অতীত। এ সত্য বর্তমানে বড় তাকীদ লয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে যে, এই নবতর দৃষ্টিকোণ দিয়ে ব্যাপকভাবে কুরআন অধ্যয়ন একান্তই জরুরী এবং একালের ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকগণকে এদিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

এ পর্যায়ে আমরা সর্বপ্রথম স্মরণ করতে চাই কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর একটি কথা। তিনি বলেছেনঃ

إِنَّ الْقُرْآنَ يُفَسِّرُهُ الزَّمَانُ (النورة فى حقل الحياة تايف مفتى الوصل الشيخ العبيدين)

নিশ্চয়ই কাল ও সময়ই কুরআনের তাফসীর করে।

কাল ও সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও বিকাশ ঘটে। আর তা এ কালের পদার্থবিদদেরই কেবল কুরআন মজীদ থেকে নতুন নতুন তত্ত্ব ও দিগন্ত লাভ সক্ষম করেনি, বরং কুরআনের তাফসীর লেখকগণকেও অনেক ব্যাপক জ্ঞান-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে অভাবিতপূর্ব সহজতা এনে দিয়েছে। মানুষের জন্য খুলে দিয়েছে মানবীয় বিজ্ঞানের নতুন নতুন পথ। এরই আলোকে বিশ্বনবী (স)-এর নিম্নোদ্ধৃত কথাটির সারবত্তা ও যথার্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠে, প্রমাণিত হয় তাঁর এই উক্তির বাস্তবতা। তিনি কুরআন সম্পর্কে ইরশাদ করেছেনঃ

ظَاهِرُهُ اَنِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَهُ نُجُومٌ وَعَلَى نُجُومِهِ لَا تُحْصَى عَجَائِبُهُ وَلَا تُبْلَى غَرَائِبُهُ فِيهِ مَصَابِيحُ الْهُدَى وَمَنَارُ الْحِكْمَةِ -

কুরআনের বাইরের দিক অত্যন্ত স্বচ্ছ, তার ভেতরের দিক অত্যন্ত গভীর। তার অনেকগুলো তারকা রয়েছে, তারকাসমূহের উপর আরও অনেক তারকা। কিন্তু তবুও তার বিস্ময়করতা অসীম, অনায়ত্ত। তার অভিনবত্ব কোন দিনই পুরাতন বা জীর্ণ হয়ে যাবে না।

ইসলামী জীবন-বিধানের ভিত্তি তওহীদ

কুরআন মজীদ যে 'দ্বীন'—জীবন-বিধান উপস্থাপিত করেছে, তাতে আল্লাহ্র **সার্বিক** একত্ব এবং তার সাথে কোন এক দিক দিয়েও সামান্যতম শির্ক করার ব্যাপারটি সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ত্রিশ পারা কুরআনের ১১৪টি সূরার বিভিন্ন আয়াতে এই পর্যায়ে স্পষ্ট অকাট্য ঘোষণাবলী উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু তা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকার কারণে তওহীদ বা শির্ক—কোন বিষয়েই কুরআনের প্রকৃত বক্তব্যকে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা ও সেই অনুযায়ী নিজেদের ঈমান ও আকীদাকে গড়ে তোলা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হয় না।

এই কারণে বর্তমান গ্রন্থে তওহীদ ও শির্ক সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে একত্রিত করে এ দুটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাঠকদের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে তোলার চেষ্টা পেয়েছি।

তওহীদের বিভিন্ন পর্যায়

ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী মনীষীবৃন্দ তওহীদী আকীদাকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন এবং এ চারটি পর্যায়েই কুরআনের বিপুল সংখ্যক আয়াত রয়েছে।

মূল সত্তার তওহীদঃ প্রথমে আল্লাহ্র মূল সত্তার তওহীদ বা একত্ব। তার অর্থ—আল্লাহ্ এক ও একক। তাঁর শরীক কেউ নেই, কেউ নেই তাঁর সমতুল্য (Equal, parallel), তাঁর মত কাউকে কল্পনাও করা যায় না।

তাঁর সত্তা একক, অবিভাজ্য, কয়েকটি অংশে সংমিশ্রিতও নয়, যেমন বস্তুগত দেহ হয়ে থাকে।

গুণাবলীর তওহীদঃ দ্বিতীয়, গুণাবলীর দিক দিয়ে তওহীদ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বহু প্রকারের গুণে গুণান্বিত ও ভূষিত। জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, জীবন, প্রভৃতি বহু মহৎ গুণ তাঁর রয়েছে বলে কুরআনেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু গুণাবলীর এ বৈচিত্র্য ও বহুত্ব মানসিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে মাত্র। প্রকৃত ও বাহ্যিক অস্তিত্বের দিক দিয়ে নয়। অন্য কথায়, প্রত্যেকটি গুণ অপর গুণের মূল। তা থেকে স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন বা ভিন্নতর নয়। উপরন্তু সেই গুণাবলীও আল্লাহ্র মূল সত্তায় নিহিত, তাঁর বাইরে নয়।

যেমন আল্লাহ্র ইল্ম বা জ্ঞান। তাঁর গোটা সত্তাই ইল্ম, ঠিক তখন যখন তিনি কুদরতগুণে ভূষিত। আল্লাহ্র সত্তায় জ্ঞানের বাস্তবতা কুদরতের বাস্তবতা

থেকে স্বতন্ত্র নয়। বরং এর প্রত্যেকটিই অন্যটির মধ্যে নিহিত। আর এ সবের ব্যাপক সমন্বয় আল্লাহ্র মহান সত্তা। যেমন আমরা প্রত্যেকেই আল্লাহ্র সৃষ্ট, ঠিক সেই সময়ই আল্লাহ্র জ্ঞাত (معلوم)। যদিও সৃষ্ট হওয়া ও জ্ঞাত হওয়া দুটি ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য পেশ করে মানসিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে। কিন্তু বাহ্যিক সমন্বয় সাধনে তা এক—অভিন্ন। কেননা আমাদের গোটা সত্তা আল্লাহ্র জ্ঞাত, যেমন আমরা সম্পূর্ণরূপেই আল্লাহ্র সৃষ্ট সেই একই সময়ে। এভাবে আমাদের সত্তা একই সময় দুটি দিকের ধারক। একই সময় তা আল্লাহ্র সৃষ্ট যেমন, তেমনিই আল্লাহ্র জ্ঞাত-ও।

ক্রিয়া-কর্মে তওহীদঃ প্রাকৃতিক জগতে যে কার্যকারণ ধারাবাহিকতা সদা সক্রিয় রয়েছে, তা আমরা সকলেই জানি এবং মানি। তাতে একথাও স্বীকৃত যে, প্রাকৃতিক কার্যকারণের একটা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া অবশ্যই আছে।

যেমন সূর্য—চতুর্দিক উজ্জ্বল ও আলোকোদ্ভাসিত করা তার ক্রিয়া, সূর্যোদয় তার কারণ। তরবারি ও কর্তন এর মধ্যেও কার্যকারণ রয়েছে। তরবারির ক্রিয়া কাটা এবং কাটার কারণ হচ্ছে তরবারি।

ক্রিয়া-কর্মে তওহীদী আকীদার তাৎপর্য হচ্ছে, আমরা বিশ্বাস করি যে, এই ক্রিয়া ও কর্মসমূহও মূলত আল্লাহ্রই সৃষ্টি। আল্লাহ্রই সৃষ্টি হচ্ছে কারণসমূহ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই এই কারণসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাতে ক্রিয়ার গুণ দান করেছেন। সূর্যকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তার গুণ বা ক্রিয়া উজ্জ্বল-উদ্ভাসিতকরণ-এর বিশেষত্বও তাঁরই অবদান। আগুন তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাতে দাহিকা শক্তি তিনিই দান করেছেন। এভাবে তওহীদী আকীদা অনুযায়ী প্রাকৃতিক জগতে সদা কার্যকর কার্যকারণ পরম্পরা ধারার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এগুলি যেমন আল্লাহ্র সৃষ্ট, তেমনি আল্লাহ্র জ্ঞাতও। কার্যকারণের কার্যকারিতা আল্লাহ্রই সৃষ্টি, আল্লাহ্ তা কার্যকর করেন—হতে দেন, তবেই তা হয়। তার কোনটিরই একান্ত স্বতন্ত্র ও নিজস্ব কোন অস্তিত্ব বা ক্ষমতা নেই। তাই আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন, তার কার্যকরতা থাকে। আর যখন ইচ্ছা করেন, তখন তার কার্যকরতা বন্ধও হয়ে যায়।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়, তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মূল সত্তার (ذات) দিক দিয়ে যেমন লা-শরীক, তেমনি তাঁর কর্মশীলতা ও কার্যকরণ তার দিক দিয়েও তেমনি শরীকবিহীন। সব কারণ ও সক্রিয়তা মূলত ও প্রকৃতপক্ষে সে দুটির ক্রিয়াশীলতা ও কার্যকরতাসহ মহান আল্লাহ্র সাথেই সংশ্লিষ্ট। ক্ষমতা ও শক্তি যা কিছু, তা কেবল আল্লাহ্রই—আল্লাহ্র ছাড়া আর কারোই কিছু নেই।

মানুষ পৃথিবীতে-বর্তমান বস্তু ও জীবসমূহেরেই অন্তর্ভুক্ত, তারই অংশ। তার রয়েছে সক্রিয়তা এবং তার কার্যাবলীর ক্ষেত্রে তার একটা কার্যকরতা (effect) রয়েছে। যেমন তার স্বাধীনতা রয়েছে নিজের জন্য জীবন পথ ও জীবনাচরণ গ্রহণের, নিজ জীবনের যে কোন একটা পরিণতি পছন্দ করার। কিন্তু তা তার জন্য নিজস্ব বানিয়ে দেয়া হয়নি, তা আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতায়ই কার্যকর হয়—দাঁড়ায়, বসে, কারণ হয়, ক্রিয়া করে।

ক্রিয়া-কর্মে তওহীদী আকীদায় এই প্রকৃতিগত কার্যকারণ (cause and effect)-কে অস্বীকার করে না। ক্রিয়াশীলতায় তার কিছু দখল নেই—তাও বলে না। effect সৃষ্টিতে তার কিছু করার নেই, এমন ধারণাও জাগায় না। বরং ফলাফল (effect) সৃষ্টিতে তার পূর্ণমাত্রায় কর্তৃত্ব চলে—একথা স্বীকার করা সত্ত্বেও তওহীদী আকীদা যথাযথভাবে স্বীকৃত। কেননা এ ফলাফল তো আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কারণেরই পরিণতি।

কিন্তু তার কার্যকরতা প্রকৃত অস্তিত্ব পায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে। এ ছাড়া অন্যান্য কারণ ও ফলাফল আল্লাহ্‌র কুদরতের অধীন। আল্লাহ্‌র কুদরতই হচ্ছে প্রকৃত মৌল কারণ। আর এসব 'কারণ' হচ্ছে আল্লাহ্‌র কুদরতের কার্যকরতার মাধ্যম।

তাই বলতে হবে, সূর্য আলো দানের ক্ষমতা আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই অর্জন করে, যেমন তার মূল সত্তাটা আল্লাহ্‌রই দান মাত্র। আগুন দাহিকা ও তাপ দান শক্তি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পায়, যেমন তার সত্তাটাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ফল। আল্লাহ্ তা'আলাই এসব কারণ ও কার্যকরতার বিশেষত্ব দান করেছেন। এ সবের ক্রিয়াশীলতা আল্লাহ্‌র দান, যেমন এগুলির অস্তিত্বও মৌলিকভাবেই আল্লাহ্ প্রদত্ত।

অন্য কথায় এ সবই ক্রিয়াশীলতা ও কার্যকরতা আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী, কেবল আল্লাহ্ই এমন সত্তা, যিনি কোন কিছু উদ্ভাবনে, ফলদানে ও কার্যকর করণে কারোরই মুখাপেক্ষী নন।

এ আলোচনার দ্বারা এ পর্যায়ের দুটি প্রতিষ্ঠিত মতের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'আশায়েরা' মতাবলম্বীদের বক্তব্য হচ্ছে—ফলাফল (effect) সৃষ্টি কার্যকারণের কোন দখল আদপেই নেই। আর অপর মতটির ব্যাখ্যা উপরে এসেছে।

'আশায়েরা' পন্থীদের বক্তব্য হচ্ছেঃ সূর্য, আগুন, তরবারি প্রভৃতির নিজস্ব কোন ক্রিয়াশীলতা আদপেই নেই। আলো, তাপ ও কর্তন সৃষ্টিতে এ তিনটি

জিনিসের একবিন্দু দখল নেই। বরং এটা আল্লাহ্‌র নিয়ম যে, সূর্যের উদয় হলে সাথে সাথে উজ্জ্বল্য, আগুন হলে তাপ ও জ্বালানো এবং তরবারি চালালে কর্তন সংঘটিত হবে, যদিও এই সূর্য, আগুন, তরবারি—এসব ফল সৃষ্টি করায় নিজস্ব কোন দখল নেই।

বিবেক-বুদ্ধি ও কুরআনের আলোকে এই মতটি কি গ্রহণযোগ্য? কুরআনের অয়াতঃ

هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ* يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ-

(النحل: ١٠-١١)

তিনি-ই আল্লাহ্‌, যিনি আকাশমণ্ডল থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন, যা থেকে তোমরা নিজেরাও সিক্ত-পরিতৃপ্ত হও, আর তোমাদের জন্তু জানোয়ারগুলির জন্য খাদ্যও উৎপাদিত হয়। তিনি এই পানির সাহায্যে ক্ষেতে ফসল ফলান এবং যয়তুন, খেজুর, আঙুর ও অন্যান্য নানাবিধ ফল পয়দা করেন।

আয়াতের 'তিনি এই পানির সাহায্যে' অংশ স্পষ্ট অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এসব ফল-ফলাদি ফলানোতে পানির ক্রিয়াশীলতা রয়েছে।

'আশায়েরা' পন্থীরা যেখানে কার্যকারণের কোন ভূমিকা আছে বলে স্বীকারই করেন না, সেখানে ক্রিয়া-কর্মে তওহীদবাদীরা বলেন যে, কার্যকারণের একটা ভূমিকা আছে; কিন্তু তা মৌলিক নয়, প্রকৃত নয়। তা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন। এ বিশ্বাসে ক্রিয়া-কর্মে এক আল্লাহ্‌র নিরংকুশ কর্তৃত্বের পরিপন্থী কিছু নয়। ফলে এ মতের যুক্তিতে দ্বৈততা বা ত্রিত্ববাদ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত।

এ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষ তার অস্তিত্ব লাভে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী হলেও তার কাজ-কর্মে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী নয়, স্বাধীন কর্তৃত্বশালী—তারা অজ্ঞাতসারেই শির্‌কী আকীদায় নিমজ্জিত হয়েছে। কেননা সে বিশ্বাসে দুই স্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তি স্বীকার করা হয়, যার প্রত্যেকটিই অপরটি থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর এটাই সুস্পষ্ট শির্‌কী আকীদা।

কিছু লোকের বিশ্বাস হচ্ছে, এ জগত দুটি প্রাথমিক মৌলনীতির ভিত্তিতে সূচিত হয়েছে। সেখানে একদিকে রয়েছে সমস্ত 'ভালো'র স্রষ্টা এবং অপর দিকে

সমস্ত 'মন্দ'র স্রষ্টা। 'ভালো'র স্রষ্টা 'মন্দ'র স্রষ্টা নয়। আবার মন্দ-এর স্রষ্টাও নয় 'ভালো'র স্রষ্টা। তারা ক্রিয়া-কর্মে তওহীদী আকীদা হারিয়ে ফেলেছে এবং দ্বৈততার শিরক-এ নিমজ্জিত হয়েছে।

ইবাদতে তওহীদঃ অর্থ, ইবাদত এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্যই করা যাবে না। তা হতে হবে একান্তভাবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য, এক আল্লাহ্র উদ্দেশে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই অধিকার নেই মানুষের নিকট ইবাদত পাওয়ার বা চাওয়ার। মানুষেরও অধিকার নেই এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করার, সে যত বড় পূর্ণত্ব, ক্ষমতা ও দাপটের বা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারীই হোক-না-কেন।

তার কারণ, ইবাদতে যে বিনয়-নম্রতা, নতি, নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের ভাবধারা থাকে তা যে দুটি কারণে হয়ে থাকে, সে দুটি কারণ পূর্ণ মাত্রায় কেবলমাত্র আল্লাহ্তেই পাওয়া যায়। অন্য কোথাও কারোর নিকটই তা নেই—থাকতে পারে না।

কারণ দুটির একটি হচ্ছে, মা'বুদকে সর্বতোভাবে পূর্ণত্বের অধিকারী হতে হবে। সকল প্রকারের দোষ-ত্রুটি-অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র হতে হবে। এ পূর্ণত্বই তাকে এই মর্যাদায় অভিসিক্ত করে যে, যেই এ পূর্ণত্বের মূল্য ও মর্যাদা যথার্থভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, এমন প্রত্যেকেই তাঁর সমীপে নিবেদিত হবে, তার ইবাদত ও দাসত্ব করবে।

পূর্ণত্বের চরম পর্যায় ও মর্যাদা বলতে বোঝায়, তার সত্তা হবে সীমা শেষ-হীন, অনস্তিত্বতা (عدم) কোন দিনই তাকে এক বিন্দুও স্পর্শ করবে না। তার থাকতে হবে সীমা-শেষ হীন 'ইল্ম'। একবিন্দু অজ্ঞতা বা মুর্খতা তার সম্পর্কে চিন্তাও করা যাবে না। তার শক্তি ও ক্ষমতা হতে হবে নিরংকুশ, নিঃশর্ত। কোনরূপ দুর্বলতা, অক্ষমতা বা অবসন্নতা তার কাছেও ঘেষতে পারবে না।

বস্তুত এসব ব্যাপারই প্রত্যেক সুস্থচিন্তা অনুভূতি ও জীবন্ত মন-মানসিকতার মানুষকেই সেই সবের অধিকারী সত্তার নিকট বিনীত নিবেদিত হতে এবং তার দাসত্ব ও বন্দেগীতে সতত সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করে। আর যার তা নেই, তার দাসত্ব করা কারোর পক্ষে সম্ভব হয় না, সমীচীন ও বিবেচিত হয়-না।

আর দ্বিতীয়, সে মা'বুদের হাতেই নিবদ্ধ হতে হবে মানুষের সূচনা, মানব জীবনের উন্মেষ। তাকেই হতে হবে মানুষের স্রষ্টা, তার দেহ ও প্রাণের প্রদাতা। তার জীবন-জীবিকা ও প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রীর একমাত্র পরিবেশক।

এমনভাবে যে, তার দানের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন বা রহিত হয়ে গেলে অতঃপর নিছক অস্তিত্বহীনতা ও ব্যাপক শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু এ দুটি গুণ কি এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর মধ্যে পাওয়া যায়? এ পূর্ণত্বের অধিকারী আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ হতে পারে বলে মনে করা যায় কি? তিনি ছাড়া আর কেউ দুনিয়াকে—বিশ্বলোককে, এখানকার সমস্ত বস্তুকে—মানুষকে অস্তিত্ব ও জীবন দিয়েছে বলে মুহূর্তের তরেও বিশ্বাস করা যায় কি? তিনি ছাড়া এমন আর কেউ কোথাও আছে কি, যার নিকট মানুষের জীবন সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেয়া হলে এবং তার নিয়ামত পরিবেশন নিমিষের তরেও বন্ধ হয়ে গেলে মানুষের জীবন সহসাই এমন হয়ে যাবে যে, তা কোন দিন-ই ছিল না?

নবী-রাসূল-নেক্কার লোকেরা এক আল্লাহ্র ইবাদতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তো কেবল এই জন্যই যে, সকল দিকের বিচারে কেবল তিনিই পূর্ণত্বের অধিকারী, ইবাদত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তা কেবল তিনিই। তাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে জানতে পেরেছেন যে, আল্লাহ্ই হচ্ছেন নিরংকুশ সৌন্দর্যের একচ্ছত্র মালিক, সীমাহীন পূর্ণত্বের একমাত্র অধিকারী।

এক কথায় ইবাদত পাওয়ার—ইবাদত করার যোগ্য একমাত্র সত্তা আল্লাহ্। এ ব্যাপারে কেউ তাঁর শরীক নেই। কেননা যে সব কারণে আল্লাহ্ এই অধিকার লাভ করেছেন, তা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর মধ্যেই পাওয়া যায় না। ফলে সেই এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর ইবাদত যেমন যুক্তি বিরোধী, বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থী, তেমনি ইসলামী শরীয়াতেও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কর্তৃত্বের তওহীদঃ নিরংকুশ কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এক আল্লাহ্কে স্বীকার করতে হবে। সে কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহ্রই আছে, অন্য কারোর নেই—থাকতে পারে না বলে মানতে হবে। সে কর্তৃত্ব কেবল প্রাকৃতিক জগত কেন্দ্রিকই নয়, নয় নিছক রবুবিয়্যত—লালন-পালন-পরিচালনা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই; বরং আইন-বিধান রচনার ক্ষেত্রেও কেবল তাঁরই পূর্ণ কর্তৃত্ব স্বীকৃতব্য। ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন-যাত্রা নির্বাহের নিয়মকানুনও কেবল তাঁর নিকট থেকেই গ্রহণীয়। আদেশ-নিষেধ করার অধিকার কেবল তাঁরই। এই কর্তৃত্বের তিনটি পর্যায় রয়েছেঃ

১. সার্বভৌমত্ব ও প্রশাসনিক আইনে সর্বাত্মক কর্তৃত্বের অধিকারীরূপে এক আল্লাহ্কেই স্বীকার করতে হবে। কুরআন মজীদে এ পর্যায়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। কুরআন হুকুম দান ও আইন-বিধান প্রদানের কর্তৃত্বে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর অধিকারের প্রতি একবিন্দু স্বীকৃতি বা অনুমতি দেয়নি। তিনি ছাড়া মানুষকে আর কেউই কোন কাজের হুকুম দিতে পারে না, কোন কাজ করা

থেকে নিষেধও করতে পারে না। অন্য কারোর দেয়া আইন-কানুন মানুষ মেনে নিতে প্রস্তুত হতে পারে না, যদি না তা আল্লাহ্র দেয়া আইন-কানুন থেকে গৃহীত ও তৎকর্তৃক সমর্থিত হয়। তা না হলে সব হুকুম-ই তাগুতী হুকুম হয়ে যাবে। তা শরীয়াত নামে অভিহিত হতে পারে না, কুরআনও তা সমর্থন করে না

কিন্তু আমরা যখন বলি যে, হুকুমদানের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র এবং সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই নেই, তখন তার অর্থ এই হয় না যে, আল্লাহ্ নিজেই এই সার্বভৌমত্ব সরাসরিভাবে প্রয়োগ করবেন এবং মানুষের মধ্যে হুকুম চালাবেন শহর-নগর-রাজ্য প্রত্যক্ষভাবে ও কোন মাধ্যম ছাড়া তিনি নিজেই পরিচালনা করবেন। কেননা তা আল্লাহ্র নীতি নয়। বরং তার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তিই সার্বভৌমত্ব চালাতে চায়, সংকল্পবদ্ধ হয় দেশ শাসনের জন্য, তাকে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধিনতা গ্রহণ করতে হবে, আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধসমূহই যথাযথভাবে কিংবা তার ভিত্তিতে গড়া আইন-কানুন চালাতে হবে। যদি তাতে আল্লাহ্র অনুমতি না থাকে, তা যদি আল্লাহ্র আইন থেকে গৃহীত না হয়, তাহলে তার কোন মূল্য বা গুরুত্ব স্বীকৃতব্য হতে পারে না।

শাফা'আতের ক্ষেত্রেও এই ধারণাই কুরআন-অনুমোদিত। যেমন কুরআন বলেছেঃ

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا۔ (الزمر: ٤٤)

বল, শাফাআত সম্পূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য।

তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া শাফাআত আর কেউ করবে না। বরং তার অর্থ, আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া শাফাআত কেউ করতে পারবে না। করলে তা গ্রহণীয় হবে না।

২. আনুগত্যের তওহীদঃ মানুষের উপর হুকুম চালানোর নিরংকুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোরই আনুগত্য স্বীকার করা যেতে পারে না। আনুগত্যের ব্যাপারেও শরীক কেউ নেই। কেউ তা নিয়ে আল্লাহ্র সাথে ঝগড়া বা বিবাদও করতে পারে না।

তবে আল্লাহ্ নিজেই তাঁকে ছাড়া অন্য—যেমন নবী-রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন কোন কোন ক্ষেত্রে। তার অর্থ, সেই অন্যদের আনুগত্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অন্য নিরপেক্ষ বা নিঃশর্তভাবে কর্তব্য নয়। বরং তা কর্তব্য শুধু এ হিসেবে যে, সে আনুগত্যে আল্লাহ্রই আনুগত্য সম্পন্ন হয়। আল্লাহ্র আদেশ পালনার্থেই তা করতে হবে, করতে হবে শুধু এ জন্য যে, তা করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ই দিয়েছেন।

৩. আইন-বিধান রচনায় তওহীদঃ কুরআনের দৃষ্টিতে আইন-বিধান রচনার অধিকার কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই সংরক্ষিত। অন্য কারোর অধিকার নেই মৌলিকভাবেই আইন-বিধান রচনা করার এবং তা মানবার জন্য আদেশ করার। যারা এই অধিকার নিঃশর্তে অন্যকে দিয়েছে, তারা শির্‌কে লিপ্ত হয়েছে। তওহীদের বেষ্টনী ভেদ করেছে ও মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে। এখানে যে আইন-বিধানের কথা বলা হচ্ছে তা কেবল প্রাকৃতিক জগতকেন্দ্রিক আইন-ই নয়, মানব জীবন ও সমাজ সংক্রান্ত আইন বিধানও এর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের জন্য হালাল-হারাম ঘোষণা যদিও প্রাকৃতিক জগতকেন্দ্রিক ব্যাপার নয়, তবুও তা প্রাকৃতিক জগতকেন্দ্রিক আইন-বিধানের ন্যায় কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌রই একচ্ছত্র কর্তৃত্বভুক্ত।

এভাবে মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে এই তিনটি বিষয়ওঃ

—সার্বভৌমত্ব ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বে তওহীদ

—আনুগত্যে তওহীদ

—আইন রচনায় তওহীদ

এ আলোচনায় 'ইসলামী হুকুমতে'র প্রকৃতি ও শাসন ব্যবস্থার চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'ইসলামী হুকুমত' তার আসল রূপে প্রতিভাত হবে আমাদের সম্মুখে।

কেননা উক্ত মৌল চিন্তা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়া হুকুমত 'ব্যক্তির হুকুমত সমষ্টি বা জাতির উপর' হবে না। হবে না 'জাতির শাসন জাতির উপর' (Government of the people, by the people and for the people) ধরনের। বরং তা হবে 'আল্লাহ্‌র হুকুমত সমাজ-সমষ্টির উপর—সমষ্টির মাধ্যমে। কিংবা 'সমাজ-সমষ্টির উপর আল্লাহ্‌র আইনের শাসন' পর্যায়ের।

আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সরকারকে সাধারণত তিনটি শাখায় বিভক্ত করা হয়ঃ

আইন-রচনা বিভাগ (পার্লামেন্ট)

বিচার বিভাগ

ও প্রশাসনিক বিভাগ

ইসলামের দৃষ্টিতেও এ বিভক্তি অগ্রহণযোগ্য নয়। তবে তার জন্য শর্ত হচ্ছে—এ তিনটি বিভাগের মূল ভিত্তি হতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের উপর। কোন একটি বিভাগও তা থেকে একবিন্দু মুক্ত হতে পারবে না। আইন-রচনা বিভাগও আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নিকট থেকে পাওয়া আইনসমূহকেই আইন হিসেবে গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজন বোধে তারই আলোকে ও

আল্লাহ্-রাসূল নির্ধারিত সীমার মধ্য থেকে নতুন আইন তৈরী করবে। বিচার বিভাগ সেই আইনকে ভিত্তি করেই বিচার কার্য সম্পন্ন করবে এবং প্রশাসনিক বিভাগ সেই আইনের আওতার মধ্যে থেকে আইন-প্রয়োগ ও প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করবে। কেননা ইসলামী ব্যবস্থায় আইন-বিধান ও নিয়ম-নীতি রচনার মৌলিক অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র। তখন কার্যত অবস্থা এই হবে যে, যে আল্লাহ্র আইন সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিতে কার্যকর রয়েছে, তাঁরই আইন অনুযায়ী চলবে মানুষের স্বাধীন কর্ম জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র।

তওহীদী আকীদার এ সব কয়টি পর্যায়ের আলোচনার সাথে সাথে—বরং তার পূর্বে তওহীদ ও শির্ক সম্পর্কিত আকীদাকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য কুরআনের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য।

১. আল্লাহ্ ও বিশ্ব প্রকৃতি
২. আল্লাহ্ ও অনুজগত
৩. আল্লাহ্ ও তাঁর অস্তিত্বের কুরআনী দলীল।

এ ছাড়াও হিদায়তে তওহীদ, মালিকত্বে তওহীদ, রিযিক্দানে তওহীদ প্রভৃতিও আলোচিতব্য। কিন্তু তা স্বতন্ত্রভাবে না করলেও ক্রিয়া-কর্মে তওহীদের আলোচনায় এ সবও শামিল করা যেতে পারে।

তাই আমরা এই গ্রন্থের মূল আলোচ্যকে উপরোক্ত তিনটি পর্যায়ের পর আরও নয়টি পর্যায়ে গ্রহণ করতে চাচ্ছি। এই নয়টি পর্যায় হচ্ছেঃ

৪. আল্লাহ্ এবং তাঁর অস্তিত্বে তাঁর পরিচিতির ব্যাপকতা
৫. আল্লাহ্ এবং তাঁর মৌল সত্তার তওহীদ
৬. আল্লাহ্ এবং তাঁর মৌল সত্তার অবিভাজ্যতা
৭. আল্লাহ্ এবং তার স্রষ্টা হওয়ার তওহীদ
৮. আল্লাহ্ এবং রবুবিয়াতে (ব্যবস্থাপনায়) তওহীদ
৯. আল্লাহ্ এবং তাঁর ইবাদতে তওহীদ
১০. আল্লাহ্ এবং আইন প্রণয়নে তওহীদ
১১. আল্লাহ্ এবং তাঁর আনুগত্যে তওহীদ
১২. আল্লাহ্ এবং সার্বভৌমত্ব ও আইন চালনায় তওহীদ

কুরআনের আয়াতসমূহের ভিত্তিতে এই সবকয়টি পর্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা করাই এ গ্রন্থের লক্ষ্য। অবশ্য কুরআনের আয়াতের সাথে সাথে বিবেক-বুদ্ধি সঞ্জাত যুক্তিসমূহকেও উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করা হবে।

আল্লাহ পরিচিতি ও বিশ্বপ্রকৃতি

যান্ত্রিক জীবন ও প্রকৌশল বিদ্যার পরাজয়

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবর্তনে জগতের বিজ্ঞানী আবিষ্কারক-উদ্ভাবকগণ মানব জগত সম্পর্কে আক্ষেপ করে বলেছেন, বস্তু জগতের উপর কর্তৃত্বকারী নিয়মাদি যদি তাঁরা জানতে পারতেন, বিশ্ব প্রকৃতির বাহ্যিক প্রকাশমান ঘটনাবলীর পরস্পরের মধ্যে প্রভাবশালী সম্পর্ক নিহিত গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্ব যদি তাঁরা আয়ত্ত করতে সক্ষম হতেন, আর অতঃপর মানবতার উপর যে মুর্খতার অপদেবতার প্রচ্ছায়া প্রভাবশালী হয়ে রয়েছে, তা উৎপাটিত করতে পারতেন, তাহলে তাঁরা দার্শনিক প্লেটোর প্রতিশ্রুতি 'উন্নত সভ্যতা মণ্ডিত সমাজ' গঠন করতে—এমন কি নবী-রাসূলগণ দীর্ঘকাল ধরে যে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন তাও এ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করে দেখাতে পারতেন। অতঃপর আর কোন দ্বীন বা ধর্ম কিংবা ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার কোন প্রয়োজনই থাকতো না। তার অর্থ, তাঁদের মতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রকৌশল বিদ্যাই মানুষের জন্য বাঞ্ছিত সম্মান-মর্যাদা ও সুখ অর্জনে সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট।

কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথম ও মধ্য পর্যায়ে যে সব বিস্ময়োদ্দীপক ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে, বিশেষ করে দুই বিশ্বযুদ্ধে যা চরমে উন্নীত হয়েছে, তাতে বলি হয়েছে কয়েক শত মিলিয়ন মানুষ। তাতে মানুষের কল্যাণ বলতে কিছুই লক্ষ্য করা যায় নি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অর্ধশতাব্দী কালেরও বেশী সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তেমন কোন কল্যাণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

ফলে একদিকে ওসব বড় বড় বাকচতুর লোকদের মনে যেমন চরম নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘণীভূত হয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষ এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার আর কোন আশা-ভরসা পাচ্ছে না। এ কারণে পূর্ণ শক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্বীন প্রতিশ্রুত জগত আজও কায়েম হয়নি এবং দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজও একবিন্দু ফুরিয়ে যায়নি। সেই সাথে এ কথাও প্রকট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের পক্ষে প্রকৃত সৌভাগ্য লাভ, সুখময় জীবন অর্জন, দ্বীন গ্রহণ, আল্লাহ্মুখী হওয়া ব্যতীত কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। পরন্তু দ্বীনকে পরিহার করে আল্লাহ্ বিমুখ জীবন যাপন করা হলে তার পরিণতি অধিকতর মর্মান্তিক হওয়া এবং দুঃসাধ্য জটিল সমস্যাবলীতে জীবন আচ্ছন্ন হওয়া একান্তই অনিবার্য হয়ে পড়বে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই উন্নতি এবং প্রকৌশল বিদ্যার যত অগ্রগতি হোক, সে সব সমস্যার সমাধান করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

দ্বীন-বিমুক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই করায়ত্ত হোক এবং প্রকৌশল বিদ্যার যত বিস্ময়কর উদ্ভাবনই সংঘটিত হোক, মানুষকে যুদ্ধ বিগ্রহের ধ্বংসকারিতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। এমন কোন মতাদর্শ দুনিয়ায় আছে কি যা মানুষকে তার যাবতীয় অধিকার ইনসাফ পূর্ণভাবে পরিবেশন করতে পারে? মানুষের সামাজিক সামষ্টিক সম্পর্কে যে প্রচণ্ড ফাটল ধরেছে তার জোড়া লাগাতে পারে?

এ যুগ আদর্শ ও মতবাদের যুগ, বলা যায়। কিন্তু বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন একটি মতাদর্শও মানুষকে ঠিক মানুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে পারে নি, মানুষকে ধন্য করতে পারেনি ইনসাফ ও সুবিচারের মহিমা দিয়ে। মানব জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যমানকে সমন্বিত করে এক ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ উপস্থাপনও সম্ভব হয়নি কারোর পক্ষেই। ফলে মানুষ দ্রুতগতিতে চির অবলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। অতঃপর মানুষের চিরন্তন ধ্বংস ছাড়া আর কোন নিয়তির একবিন্দু আশা করা যায় না।

মার্ক্সবাদ অর্থনীতিকে ইতিহাসের গতির মূল কার্যকারণ এবং প্রত্যেক সামাজিক বিবর্তনের মৌল কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানবতাকে দিতে পারেনি এক মুঠি খাবার, নিবৃত্ত করতে পারেনি মানুষের মনের অন্তরের অনন্ত পিপাসা। শেষ পর্যন্ত মার্ক্সীয় দর্শন মানব জীবনের জটিল প্রশ্নসমূহের কোন একটিরও মননশীল জবাব দানেও সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

মানুষ সব সময় এবং স্বভাবত জানতে চায়ঃ
সে কোত্থেকে এসেছে?
কেন এসেছে এই জগতে?
অতঃপর এখান থেকে সে কোথায় যাবে?

মার্ক্সবাদে এসব প্রশ্নের কোন একটিরও জবাব নেই। এসব ব্যাপারে তা সম্পূর্ণ নির্বাক। কোন একটির জবাব দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও সুষ্ঠু জবাব না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ তার জীবনের কোন অর্থ খুঁজে পেতে পারে না, জানতে পারে না তার জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য, তার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। অথচ এ কয়টি প্রশ্নের যথার্থ জবাব না জানতে পারলে মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ঠিক মানুষের মত জীবন যাপন করা, সমস্যাবলীর মানবীয় সমাধানে উপনীত হওয়া। জীবনের শত-সহস্র জটিলতার মধ্যে কোন একটি জটিলতাকেও দূর করা।

মার্ক্সবাদ এসব প্রশ্নের জবাব দিবেই বা কি করে? তারা এই বিশ্ব লোককে তো এমন একখানি পুরাতন হয়ে যাওয়া গ্রন্থ মনে করে নিয়েছে, যার প্রাথমিক ও শেষের দিকের পৃষ্ঠাগুলি হারিয়ে গেছে। ফলে এর না আছে কোন শুরু, না আছে শেষ আর এর-ই ফলে গোটা সৃষ্টি কর্মটাই হয়ে পড়েছে নিতান্তই অর্থহীন।

এ কারণে এ যুগের স্বাধীন চিন্তাবিদ ও বিশ্বলোকের প্রতি বাস্তবতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপকারীরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন যে, আজকের বিশ্ব মানবতাকে অবশ্যই দ্বীন পালনের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, দ্বীনী বিশ্বাস ও শিক্ষাসমূহকে পুনরায় শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে, তারই ভিত্তিতে গড়তে হবে ব্যক্তি জীবন ও সামষ্টিক জীবন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক 'জন দেওরস' বলেছেনঃ

> ধর্মীয় বিষয়াদির যে ব্যাখ্যাই আমরা করি না কেন, সে বিষয়ে যে ধারণাই আমরা গ্রহণ করি না কেন, মানব জীবনের সমগ্র যুগেই দ্বীন বা ধর্মের একটা প্রাণবন্ত ভূমিকা অবশ্যই ছিল। এখনও তার কার্যকর ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং সন্দেহ নেই, ভবিষ্যতেও তার একটা প্রচণ্ড ভূমিকা অবশ্যই স্বীকৃতব্য।[১]

আল্লাহ্-বিশ্বাস ভিত্তিক আদর্শ ও আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনাচরণ গ্রহণের অর্থ এই নয় যে, আমরা কেবল অতি প্রাকৃতিক জগতের দিকেই দৃষ্টি নিবন্ধ করব এবং এ দুনিয়ার বস্তুগত বা বাস্তব জীবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করব। বরং নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে, আল্লাহ্ বিশ্বাস প্রকৃতি জ্ঞানকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে। অতি-প্রাকৃতিক জ্ঞান (Metaphysical) অর্জনের জন্য বস্তুগত ও পদার্থ জ্ঞান বস্তু-উর্ধ্ব জগত সম্পর্কিত জ্ঞানের ভাণ্ডার ও মাধ্যম হতে পারে। অথচ বস্তুবিজ্ঞান বস্তুলোক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তার ঊর্ধ্বে কিছু আছে বা থাকতে পারে, তাও তাতে স্বীকৃত নয়। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত

সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষকগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও ঈমানের শিকড় অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত ও গ্রথিত। মানব জীবনের বিকাশ ক্ষেত্রে তার ইতিহাস বিস্তীর্ণ। কোন এক কালেও মানুষের পক্ষে এই বিশ্বাসকে অস্বীকার করে চলা সম্ভবপর হয়নি।

কমিউনিস্ট সমাজ অবশ্য আল্লাহ্ এবং তার প্রতি ঈমানের ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েই চলেছে। স্রষ্টা বলতে কাউকে মানতে তারা প্রস্তুত নয়। তারা অতি প্রাকৃতিক বা প্রকৃতি ঊর্ধ্ব কোন সত্তার প্রতি বিশ্বাস রাখাকে নিতান্ত অন্ধত্ব

---

১. مذهب در ازمایشها و روایدادهائ زندگی-۹

ও মুখ্যতা বলে মনে করে। কিন্তু তাদের এই মানসিক অবস্থা তাদের জীবনে মর্মান্তিক ট্রাজেডি হয়েই দেখা দিয়েছে. একবিন্দু সুখ-শান্তি বা সৌভাগ্য এনে দিতে পারে নি। এ কথা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

মানব জাতির বিগত হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এবং সভ্যতার উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করলে নিঃসন্দেহে জানা যেতে পারে যে, ধর্ম ও ধর্ম পালন মানুষের জীবন, সমাজ ও সভ্যতা গড়ার কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং তা মানুষের মৌল স্বভাবগত প্রবণতা, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনরূপে গণ্য হয়েছে। কালের আবর্তন ও অবস্থার পরিবর্তনে তাতে আজও একবিন্দু ব্যতিক্রম ঘটেনি। ওয়েল ডুরান্ট সমকালীন ইতিহাসবিদ লিখেছেনঃ

> এ কথা সত্য যে, প্রাথমিক পর্যায়ে কোন জাতির জীবনে বাহ্যত ধর্ম পরিলক্ষিত হয় না; কোন আফ্রিকান বামন (Dwarf) জাতির সাধারণভাবে কোন ধর্মীয় বিশ্বাস বা আচার-আচরণ ছিল না। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ অবস্থা অত্যন্ত বিরল। প্রাচীনতম বিশ্বাস চিরকাল এই ছিল যে, ধর্ম সুস্থ বিশ্বাস হিসেবে সমগ্র মানবতার মধ্যে প্রকাশমান ছিল। আর সমাজ দার্শনিকদের তাই অভিমত।[১]

পরে লিখেছেনঃ দার্শনিকগণ ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রাচীনতম প্রকাশ ও চিরকাল অবস্থিত থাকার কথা বিশ্বাস করেন।

স্যামউল কোনিক নামে খ্যাত সমাজ বিশেষজ্ঞ প্রাচীন মানুষের জীবনে ধর্ম দৃঢ়ভাবে থাকার কথা অকৃত্রিমভাবে স্বীকার করেছেন। বলেছেনঃ

> প্রত্নতাত্ত্বিক খোদাইর মাধ্যমে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে, বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষরা ধর্মপালনকারী ছিল। ধার্মিক ছিল। তার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, তারা তাদের মৃত লাশ দাফন করত, সেজন্য বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করত, লাশের সাথে তারা তাদের কাজের যন্ত্রপাতিও দাফন করে দিত। এভাবে তারা তাদের এই জগতের পরে অবস্থিত পরকালের প্রতি বিশ্বাস প্রমাণ করত।[২]

এসব মানুষ ধর্ম পালনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করত এবং প্রকৃতি ঊর্ধ্ব জগতের দিকে লক্ষ্য দানকে তাদের এক অপরিহার্য অংশরূপে মনে করত। ওয়েল ডুরান্ট এই প্রশ্ন তুলেছেনঃ

---

১. ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্য।

২. کتاب جامعه شناسی

মানুষের প্রথম কাল থেকেই এই যে 'তাকওয়া' অবলম্বন করত—যাকে কোন জিনিসই মুছে ফেলেনি, তার ভিত্তি কি ছিল?[১]

পরে নিজেই জবাব দিয়ে বলেছেনঃ

গণকদার নতুন করে ধর্মকে সৃষ্টি করেনি বরং সে তা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, যেমন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ঝোঁককে ব্যবহার করে। তাহলে বোঝা যায়, ধর্মীয় বিশ্বাস কৃত্রিমভাবে তৈরী হয়নি, তা পুরোহিতদেরও বানানো নয়, বরং তা মানুষের প্রকৃতি নিহিত তাকীদেই গড়ে উঠেছে।[২]

বস্তুত দূর অতীত কাল থেকে মানব প্রকৃতির অধ্যয়ন চালালে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ধর্মবিশ্বাস মানব প্রকৃতির গভীরে নিহিত রয়েছে। মূল আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্বাসেও বস্তুর্ধ্ব জগতের প্রতি লক্ষ্য আরোপে কোন বিরোধ কোন দিনই ছিল না। বিরোধ দেখা গেছে এ বিশ্বাসের বিশেষত্ব ও পদ্ধতি পর্যায়ে মাত্র। তার অর্থ, মূল বিশ্বাসে অতীত কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন পার্থক্য বা বিরোধ দেখা দেয় নি, তার খুঁটিনাটি বিস্তারিত ব্যাপারের মধ্যেই বিরোধ সীমাবদ্ধ রয়েছে। তার অর্থ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্বাসে বিশ্ব মানবতার পরম ঐক্য চিরকাল—ইতিহাসের প্রত্যেকটি পর্যায়েই তা লক্ষ্য করা যায়।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব কি স্বতঃস্ফূর্ত?

বহু বিশেষজ্ঞই দাবি করেছেন যে, এই বিশ্বলোকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। আর কুরআনের আয়াত থেকে এ সত্য উদ্‌ঘাটন অতীব সুস্পষ্ট। সে জন্য কোন যুক্তি-প্রমাণ অবতারণার আদৌ কোন প্রয়োজন পড়ে না। বিশেষভাবে কোন চিন্তা-ভাবনা-গবেষণারও আবশ্যকতা নেই।

ইংরেজ দার্শনিক থমাস কারেল এই ধারণাই পোষণ করেন। তিনি তাঁর এক রচনার এক স্থানে লিখেছেনঃ

যাঁরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, তাদের অবস্থা এ থেকে ভিন্নতর নয় যে, তারা আকাশে দেদীপ্যমান সূর্যকে প্রদীপ দিয়ে দেখতে চেষ্টা পায় মাত্র।[৩]

---

১. فصل الحضارة ج:١، ص: ৭৭

২. فصل الحضــارة ج:١،ص: ৭৭

৩. گلشن راز ص ٥١

বস্তুত কুরআনের এ পর্যায়ের আয়াতসমূহের উপর দৃষ্টিপাত করলেও এই কথাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। বস্তুত আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বতঃস্ফূর্ত, কোন রূপ অস্পষ্টতার স্থান নেই তাতে।

আর এই দৃষ্টিতেই আল্লাহ্‌র এই কথাটি অনুধাবনীয়ঃ

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ (ابراهيم: ١٠)

আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সংশয়? তিনিই তো আসমান জমীনের স্রষ্টা।[১]

এ আয়াতে 'আল্লাহ্‌র স্বতঃস্ফূর্ততারই প্রকাশ ঘটেছে। উক্ত আয়াতেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে স্বতঃস্ফূর্ততার ঘোষণা সত্ত্বেও যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে দ্বিতীয় অংশে এই বলেঃ তিনিই তো আসমান জমীনের স্রষ্টা। অর্থাৎ এই আসমান জীমনই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ।

এ আয়াতটিতেও আল্লাহ্‌র স্বতঃস্ফূর্ততার দিকই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেঃ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.(الحديد: ٣)

তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিন প্রকাশমান, তিনি গুপ্তও এবং তিনি সর্ব বিষয়েই পূর্ণ অবহিত।

একটি প্রখ্যাত মুনাজাতের কথা হচ্ছেঃ

তোমাকে কি করে প্রমাণিত করা যাবে সে জিনিস দিয়ে
যার অস্তিত্বই তোমার মুখাপেক্ষী?
তুমি কবে অদৃশ্য ছিলে যে, তোমাকে প্রমাণ করতে
দলীলের প্রয়োজন হবে?
তুমি কখন দূরবর্তী হলে যে, নিদর্শন তালাশ করতে হবে
তোমা পর্যন্ত পৌছাতে?
অবশ্য চক্ষু অন্ধ হতে পারে যা তোমাকে তার উপর
সদা দৃষ্টিমান দেখতে পায় না।
হে মহান সত্তা। তুমি তো পূর্ণ চাকচিক্য সহকারে চির ভাস্বর,
তুমি কেমন করে প্রচ্ছন্ন হতে পার, তুমি তো সদা প্রকাশমান!

১. আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বতঃস্ফূর্ত, একথা বলে আমরা নিশ্চয়ই এ দাবি করছি না যে, তাতে দুইজনের মধ্যেও কোন মতবিরোধ হতে পারে না কিংবা সে বিষয়ে কোন যুক্তি আলোচনারও প্রয়োজন পড়ে না। কেননা স্বতঃস্ফূর্ততারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। তার কোন কোন দিক অবশ্যই আলোচনা ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

অথবা তুমি কেমন করে অদৃশ্য হতে পার,
তুমি তো চিরদিন উপস্থিত, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষক।

অবশ্য আমাদের জানতে হবে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং তাঁর প্রতি ঈমানের স্বাভাবিকতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই তাঁর অস্তিত্ব স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ার এবং তাঁর অস্তিত্বের স্বাভাবিক ঈমান হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকও নেই।

আর আসল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁর সহজাত হওয়ারই পরিণতি। কেননা স্বতঃস্ফূর্ত জিনিসেরই একটা ভাগ হচ্ছে স্বভাবসিদ্ধ হওয়া-ই। অতএব আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারটি একই সময় যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি স্বভাবসিদ্ধ। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আমাদের সহজাত প্রবণতা ও সত্ত্বার সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এ কারণেই আমাদের নিকট তাঁর অস্তিত্ব একটা স্বতস্ফূর্ত ব্যাপার।

মানুষ স্বভাবতই আল্লাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করে

বিপুল সংখ্যক মুফাস্‌সিরের মত হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান সহজাত ও স্বভাবসিদ্ধ হওয়ার কথাটি কুরআনের আয়াতসমূহ থেকেই প্রমাণিত। সে আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতি প্রত্যয় মানুষের নিকট স্বভাবগত। মানুষ যেমন স্বাভাবিকভাবেই কল্যাণের প্রেমিক, অকল্যাণের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণকারী, তেমনি মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্ প্রবণ, আল্লাহ্ সম্পর্কে অকুণ্ঠিত মনে কথা বলে, আলোচনা করে। বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরালবর্তী রহস্যাচ্ছন্ন জগত সম্পর্কে কৌতুহলও স্বাভাবিক। তার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ সম্পর্কে আলোচনা ও স্রষ্টার সন্ধান মানুষের স্বভাব নিহিত ব্যাপার। ফলে মানুষ যখন আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ্ অস্বীকৃতি একটা ঘৃণ্য ব্যাপাররূপে চিহ্নিত হয়ে যায় তার নিকট।

এ পর্যায়ে আমরা দু'ধরনের আয়াতের সাক্ষাৎ পাইঃ

এক ধরনের আয়াতে দ্বীনী শিক্ষার মৌল-আকীদা ও আমল—স্বভাবগত ব্যাপার রূপে গণ্য করা হয়েছে, যা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে রোপিত হয়ে আছে। এরূপ অবস্থায় দ্বীনী মৌলনীতি সমূহের শিক্ষা মনের প্রতিধ্বনি ও স্বভাবের চাহিদা মাত্র।

আর অপর ধরনের আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা—বিশেষ করে কঠিন বিপদ কালে—একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এই স্বভাব জন্মগতভাবেই মানুষের রয়েছে।

এই দুই প্রকারের আয়াতসমূহ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

দ্বীনী শিক্ষার স্বাভাবিকতা

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ* (الروم: ٣٠)

অতএব তুমি একমুখী হয়ে নিজের সমগ্র লক্ষ্য এই দ্বীনের দিকে নিবদ্ধ কর, দাঁড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির উপর, যার উপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র বানানো কাঠামোর কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। এ-ই সর্বতোভাবে সত্য দ্বীন, যদিও অনেক লোকেই তা জানে না।

এ আয়াতে আল্লাহ্র পরিচিতি ও তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণকেই শুধু স্বাভাবিক ব্যাপার বলা হয়নি, দ্বীনকে তার মৌল নীতিসমূহ—যা দ্বীনের ভিত্তি—এরও স্বভাবসিদ্ধ হওয়ার কথা বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে। এ আয়াতে 'দ্বীন' শব্দটি নিছক আনুগত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। যেমন অন্যান্য কোন কোন আয়াতে সেরূপ করা হয়েছে। কেননা দ্বীনের যাবতীয় শিক্ষা, আকীদা ও আমল—সবই মানুষের স্বভাবগত প্রয়োজনের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতি সম্পন্ন। আয়াতটি সম্পর্কে গভীরভাবে বিবেচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, দ্বীন মানব প্রকৃতির সাথে মাখামাখি হয়ে গেছে। একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন, তার মূল সত্তার অংশ। আর দ্বীন এক অতীব উত্তম জীবন পথ, পরম সৌভাগ্য লাভের পক্ষে যা অবলম্বন ও অনুসরণ করা বিশ্ব মানবতার পক্ষে একান্ত কর্তব্য। মানুষ-সৃষ্টির মূল লক্ষ্যও হচ্ছে সেই সৌভাগ্য ও পূর্ণত্ব অর্জন। আল্লাহ্ তা'আলা এ কারণে প্রত্যেকটি মানুষকে এবং তাঁর সৃষ্ট প্রজাতিসমূহের প্রত্যেকটি প্রজাতিকেই সেই পথ দেখিয়েছেন, সেই সৌভাগ্য অর্জনের পথ ও পন্থা সুষ্ঠুরূপে জানিয়ে দিয়েছেন। কুরআন মজীদ সেই সাধারণ স্বভাবসিদ্ধ জীবন পদ্ধতিই প্রদর্শন করেছে, কেবলমাত্র মানুষকেই নয়, সাধারণভাবে সমগ্র সৃষ্টিলোককে।

নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহেও এ কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়ঃ

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (طه- ٥٠)

আমাদের রব্ব তো তিনি, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর জীবনাচরণের পন্থা জানিয়ে দিয়েছেন।

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ- وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ- (الاعلى: ٢-٣)

আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর পূর্ণ ভারসাম্য স্থাপন করেছেন এবং যিনি তকদীর নির্দিষ্ট করেছেন, পরে পথ দেখিয়েছেন।

এ আয়াতদ্বয়ের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, এই জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টি সত্তাকে—তা মানুষ হোক, কি মানুষ বহির্ভূত অন্যান্য সৃষ্টি—সকলকেই আল্লাহ্ তা'আলা স্বভাবসিদ্ধ ও প্রকৃতিগত হিদায়ত দান করেছেন। তাতে প্রত্যেকেরই জীবন পদ্ধতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে প্রত্যেকেই তার সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন নিয়ম-নীতি মেনে চলে এবং পরিহার করে চলে তা যা তার সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন নয়। আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়তের আলোকে প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে জেনে নিতে পারে, তার পক্ষে কল্যাণকর কি, কি তার জন্য ক্ষতিকর ও মারাত্মক। দুনিয়ায় কাকে কি কাজ করতে হবে, সে কাজের পরিমাণ কি, তার গুণাবলী কি, কোথায় তার স্থান ও অবস্থিতি—ক্ষেত্র ও উপায়-উপকরণ কি কি, কোন্ সময় তা অস্তিত্ব লাভ করবে, কত দিন পর্যন্ত তা নিজের জন্য নির্দিষ্ট কাজ করবে, আর কখন কিভাবে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে, এই সব কিছু পূর্ব থেকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়াই হচ্ছে 'তকদীর' ঠিক করা।

মানুষের যে স্বাভাবিক হিদায়ত বিশেষভাবে দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا (الشمس : ٧-٨)

শপথ মানব প্রকৃতির এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তার পাপ ও তার পরহিযগারী তার প্রতি ইলহাম করেছেন।

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ (بلد: ٨-١٠)

আমরা কি তাকে দুই চক্ষু, একটি জিহবা ও দুইটি ওষ্ঠ দেই নি? আর (ভাল ও মন্দের) উভয় স্পষ্ট পথ কি তাকে দেখাই নি?

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ * ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ * (عبس: ١٩-٢٠)

শুক্রের একটি ফোটা দিয়ে আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার তকদীরও ঠিক করে দিয়েছেন। পরে তার জন্য জীবনের পথ সহজ বানিয়ে দিয়েছেন।

এসব আয়াতে সমগ্র সৃষ্টিলোক সম্পর্কেই কথা বলা হয়েছে। তাতে মানুষ আছে যেমন, তেমনি মানুষ ছাড়া অপরাপর সৃষ্টিও। এ সবই স্বভাবগত ও প্রকৃতিগত হিদায়তের অধীন রয়েছে। এই হিদায়তই প্রত্যেককে পূর্ণত্বের দিকে পরিচালিত করে।

এ পর্যায়ে মানুষের হিদায়তকারী হচ্ছে তার সৃষ্টিগত প্রকৃতি, তার অস্তিত্ব ও দেহ-সংস্থা। আল্লাহ্‌র এ দানে সব মানুষই সমানভাবে অংশীদার। তাতে কোন লোকই অপর থেকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নয়। সমগ্র মানুষকেই এক ও অভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন।

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ (الروم: ٣٠)

আল্লাহ্ সৃষ্ট প্রকৃতি তারই উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র এই সৃষ্টি নিয়মে কোন পরিবর্তন নেই।[1]

ফলে একদলকে স্বভাবগত ঈমান ও অপর লোকদেরকে স্বভাবগত নাস্তিকতার উপর তিনি সৃষ্টি করেন নি। কিছু লোককে কল্যাণের প্রবণতা দিয়ে ও অপর কিছু লোককে অকল্যাণের প্রবণতা দিয়েও অস্তিত্ব দান করেন নি। বরং এক ও অভিন্ন প্রকৃতির উপরই নির্বিশেষে সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব দ্বীনী মৌলনীতিসমূহের শিক্ষা অত্যন্ত স্বভাব সিদ্ধ ও প্রকৃতিগত গুণ বিশেষ। কাজেই আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ এবং তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণ দ্বীনী শিক্ষার মৌল নীতিরূপে গণ্য হওয়া একটা খুবই স্বভাব-সম্মত ব্যাপার।

বিপদকালে মানুষের আসল প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান স্বাভাবিক ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও সার্বক্ষণিকভাবেই মানুষ আল্লাহ্ মুখী হবে, সব সময় কেবল তাকেই স্মরণ করবে এবং সকল অবস্থায় তাঁরই নিকট আত্মসমর্পিত হয়ে থাকবে, এমন কোন ধরা-বান্ধা কথা নেই। মানুষের মধ্যে এমন অনেক কারণই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যা তার এ স্বভাবগত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। কিন্তু যখনই সেই আবরণ ও প্রতিবন্ধক দূরীভূত হয়ে যাবে, তখনই মানুষের প্রকৃতি স্পষ্ট ভাষায় কথা বলবে। তা হবে মানব প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ।

এ এমন এক মহাসত্য, যা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। মানুষ যখনই কোন বিপদ বা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে পড়ে, ঠিক সেই মুহূর্তেই মানুষ আল্লাহ্‌মুখী হয়ে পড়ে। তখন একান্তভাবে তাঁরই নিকট আত্মসমর্পিত হয়। তার মাধ্যমেই মানুষের ভিতরে নিহিত প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করে। চিৎকার করে উঠে

১. আবদুর রউফ মিসরী লিখেছেনঃ 'ফিতরাত' বা প্রকৃতি বলতে কতগুলি বিশেষ গুণ বোঝায়, যেগুলির সমন্বয়ে কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে, তা ভালো কিংবা মন্দ। যেমন বীরত্ব, সাহসিকতা, শক্তি, মেধা, বুদ্ধিমত্তা, শ্রমশীলতা। ইমাম রাগের লিখেছেনঃ আল্লাহ্‌র 'ফিতরাত' বলতে মানুষের সেই জন্মগত সৃষ্টিগত শক্তি বোঝায়, যার দরুন ঈমান লাভ করা সম্ভব হয়। (مفردات، معجم القران)

একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের জন্য। কেননা সেই মুহূর্তে আর কেউই তাকে উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে—এমন কথা সে বিশ্বাসই করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে একথা বলা যায় না যে, ধর্মবিশ্বাস, বিপদ ও ঝড়-ঝঞ্ঝার উৎপাদন—যেমন মার্ক্সবাদীরা বলে থাকে। বরং বলা যায়, ভয় ও আতঙ্ক মানুষের অনুভূতি ও চেতনা আচ্ছন্নকারী আবরণকে দীর্ণ করে আসল মানুষটিকে—মানুষের আসল রূপটিকে—বাইরে উপস্থাপিত করে।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰى اِذَاكُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْابِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ * فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ اِذَاهُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ-(يونس: ٢٢-٢٣)

তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগ ও জলভাগে পরিচালনা করেন। এমনকি, তোমরা যখন জলযানে আরোহণ করে অনুকূল হাওয়ায় আনন্দ-স্ফূর্তিতে সফর করতে থাক, আর সহসাই বিপরীত প্রচণ্ড বাতাস ছুটে আসে, চারদিক থেকে তরঙ্গমালা এসে আঘাত হানে, সফরকারীরা মনে করে যে, তারা বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলেই নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহ্র জন্যই খালেস করে, তাঁরই নিকট দোয়া করে যে, তুমি যদি আমাদের এই বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দাও, তাহলে আমরা শোকরকারী বান্দাহ হয়ে থাকব। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করেন তখন সেই লোকেরাই সত্য দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করতে শুরু করে।

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ * (العنكبوت: ٦٥)

ওরা যখন জল-যানে আরোহণ করে, তখন তারা আল্লাহ্কে ডাকে, তাঁরই জন্য নিজেদের আনুগত্য একান্তভাবে নিয়োজিত করে। পরে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা আল্লাহ্র সাথে শিরক করতে শুরু করে।

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ* (لقمان:٣٢)

যখন উচ্চ তরঙ্গমালা চন্দ্রাতপের ন্যায় তাদেরকে গ্রাস করে, তখন তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাঁরই জন্য আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে। পরে তিনিই যখন তাদেরকে রক্ষা করে স্থলভাগে নিয়ে আসেন তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যম নীতি অবলম্বনকারী হয়ে দাঁড়ায়। আর আমাদের নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে কেবল কাফির লোকেরা।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَا اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ * (يونس: ١٢)

মানুষের অবস্থা এই যে, যখন তার উপর কোন কঠিন সময় এসে পড়ে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আমাদেরকে ডাকে। কিন্তু আমরা যখন তার বিপদ দূর করে দেই তখন সে এমনভাবে চলে যায় যেন মনে হয়, তার কোন দুঃসময়ে আমাদের কাতরভাবে ডাকেই নি। এ ধরনের সীমালংঘনকারী লোকদের জন্য তাদের কার্যকলাপ চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ * ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ* (النحل:٥٣-٥٤)

যে নিয়ামতই তোমরা লাভ করেছ তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই এসেছে। পরে যখন কোন কঠিন সময় তোমাদের উপর আসে তখন তোমরা নিজেরা নিজেদের ফরিয়াদ লয়ে তাঁরই দিকে দৌড়াতে থাক। কিন্তু আল্লাহ্‌ যখন সেই দুঃসময়টি দূর করে দেন তখন সহসা তোমাদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক লোক নিজেদের রব্ব-এর সাথে অন্যান্যদের (এই অনুগ্রহের শোকর গুজারী স্বরূপ) শরীক বানাতে শুরু করে।

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (بنى اسراءيل: ٦٧)

নদী-সমদ্রে যখন তোমাদের উপর বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে তখন সেই এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য যাদেরই তোমরা ডেকে থাক তারা সবাই হারিয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি তোমাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে নিয়ে আসেন তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বাস্তবিকই বড় অকৃতজ্ঞ।

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (الروم: ٣٣)

লোকদের অবস্থা এই যে, যখন তারা কোন কষ্টের মধ্যে পড়ে তখন তারা নিজেদের রব্ব-এর দিকে ঐকান্তিকভাবে ঋজু হয়ে যায়। কিন্তু পরে যখন তিনি তাদেরকে রহমতের কিছুটা স্বাদ আস্বাদন করিয়ে দেন, তখন সহসাই তাদের কিছু লোক শির্ক করতে শুরু করে দেয়।

এসব কয়টি আয়াতই স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান প্রত্যেকটি মানুষের প্রকৃতির মধ্যে রোপিত হয়ে আছে। তবে একথা মিথ্যে নয় যে, মানুষ এই ঈমানের ব্যাপারে অনেক সময় সম্পূর্ণ কিংবা কিছুটা অসচেতন হয়ে যায়। এই অসচেতনতাকে গাফিলতি, বিভ্রান্তি-বিস্মৃতি ও বে-খেয়াল অবস্থাই বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার প্রথম আঘাতেই এই গাফিলতি-বিভ্রান্তি-বিস্মৃতির পর্দা দীর্ণ হয়ে যায় এবং প্রকৃতি নিহিত ঈমান প্রবল হয়ে জেগে উঠে। তখন আল্লাহ্ ছাড়া মানুষ আর কোথাও আশ্রয় খুঁজে পায় না। তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই পায় না রক্ষাকারী ও ত্রাণকর্তা হিসেবে।

আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস কি স্বভাবগত?

অনেকে মনে করেন, উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহ এ কথাও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র একত্ব বিশ্বাসও একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। আল্লাহ্র অস্তিত্ব বিশ্বাসের স্বাভাবিকত্বে নয়। কেননা এসব আয়াতে তো প্রধানত মুশরিকদের সম্পর্কেই কথা বলা হয়েছে, যারা এক আল্লাহ্র সাথে অন্যান্য মা'বুদকে শরীক করে। এসব আয়াতের নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিত থেকেও এ কথাই বোঝা যায়।

আমরা জবাবে বলতে চাই, যেসব আয়াতে (সূরা ইউনুস-এর ২৩, আন-কাবুত-এর ৬৫, লুকমান-এর ৩২ এবং আল-ইসরা'র ৬৭ আয়াত)

জল-যান আরোহীদের বিপদকালে এক আল্লাহ্মুখী হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেসব আয়াত সম্পর্কে উপরোক্ত কথা সত্য ও প্রযোজ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু যেসব আয়াতে দ্বীনী মৌল নীতিসমূহের শিক্ষার স্বাভাবিকত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাতে আল্লাহ্র একত্বের প্রতি বিশ্বাসকে মানুষের মধ্যে নিহিত প্রকৃতিরই প্রকাশ বলে ধরা হয়েছে। সেসব আয়াত সম্পর্কে উপরোক্ত কথা প্রযোজ্য নয়। আর দ্বিতীয় কথা আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাস এবং আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাসের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। কেননা এ উভয় জিনিসই দ্বীনী মৌল শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

উপরন্তু, মুশরিকরা যদিও আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী, কিন্তু তারা আল্লাহ্র ইবাদত করত না, ইবাদত-বন্দেগী যা কিছু তা তারা করত মূর্তিদের সম্মুখে। আর সেই ইবাদতের সময় আল্লাহ্র প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ মাত্র থাকত না। কিন্তু কঠিন বিপদে পড়লে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টা হয়ে যেত। তখন তারা একান্তভাবে আল্লাহ্মুখী হয়ে পড়ত এবং তাই হচ্ছে মানুষের আসল প্রকৃতি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র একত্ব বিশ্বাসটি একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন মৌলিকভাবে তাঁর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসও একান্তই স্বভাব সম্মত।

স্বাভাবিক তওহীদ ও যুক্তিভিত্তিক তওহীদ

আল্লাহ্র পরিচিতি লাভ এবং তা অর্জন দুটি পন্থায় হতে পারেঃ

১. প্রকৃতির পন্থায় ২. যুক্তির পন্থায়।

'প্রকৃতির পন্থায়' বলতে বোঝায়, প্রত্যেকটি মানুষ তার গভীর সূক্ষ্ম মনের মধ্যে আল্লাহ্র প্রতি একটা চেতনা ও তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। সে জন্য কোন যুক্তি প্রমাণের একবিন্দু অপেক্ষা রাখে না। কোন শিক্ষকের শিক্ষার বা কোন ওয়ায়কারীর ওয়াযেরও মুখাপেক্ষিতা থাকে না।

আর যুক্তিভিত্তিক তাওহীদ বলতে বোঝায়, মানুষ যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করে। সেজন্য বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণের মুখাপেক্ষী থাকে।

অনেক সময় এ দুটি পন্থা পরস্পর মিলে মিশেও যায়। এ কারণে এ দুটি পন্থার মধ্যে পার্থক্য করারও প্রয়োজন দেখা দেয়।

পার্থক্য করার পদ্ধতি পর্যায়ে বলা যায়, মানুষের জীবনে তার দ্বারা দু'ধরনের কাজ সম্পাদিত হতে দেখা যায়ঃ

১. স্বাভাবিক কাজকর্ম
২. অভ্যাসগত কাজকর্ম

স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বলতে সে সব কাজ বোঝায়, যা মানুষ তার মধ্যে নিহিত স্বভাবের তাকীদে করে বা করতে বাধ্য হয়। যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, আত্মরক্ষামূলক কাজ—বিপদের সময়।

এ পর্যায়ের কাজ নিম্ন শ্রেণীর জন্তু-জানোয়ার ও ইতর প্রাণীর দ্বারাও সম্পাদিত হয়ে থাকে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে এবং প্রকৃতির তাকীদে ও স্বভাবের পথ প্রদর্শনের আলোকে। সে জন্য বাহ্যিক কোন তাকীদের একবিন্দু অপেক্ষা থাকে না।

পক্ষান্তরে অভ্যাসগত কাজ-কর্ম হচ্ছে সেগুলো যা ঠিক স্বভাবপ্রসূত নয়। যা করতে মানুষ বাধ্য হয় তার অস্তিত্বের বাইরে কোন কারণের দরুন।

দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়, মানুষের স্বভাব নিহিত যৌন প্রবৃত্তি (Impulse)। মানুষ নর কিংবা নারী একটা বিশেষ বয়সে উপনীত হলে তার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করা নিতান্তই স্বভাবগত ব্যাপার। এ ব্যাপারে বাইরের কোন শিক্ষাদান বা পথ-প্রদর্শনের একবিন্দু অপেক্ষা থাকে না।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে, সম্মান, সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের প্রবণতা। এ জিনিসের ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি থেকেই মানুষ তাকীদ অনুভব করে। এ জন্যও কোন উপদেশদাতার উপদেশের মুখাপেক্ষিতা থাকে না।

এ পর্যায়ের তৃতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ধন-মালের আকর্ষণ, তা সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের প্রয়োজন বোধ।

এ সবই স্বভাবের তাকীদের ফল এবং তাতে বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলেও একবিন্দু পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

এ সব কাজের বিপরীত হচ্ছে, অভ্যাসের কারণে করা কাজসমূহ, যা একান্তভাবে বাহ্যিক অবস্থার ও তার অব্যাহত ধারাবাহিকতার উপর নির্ভরশীল।

যেমন লজ্জা নিবারণ স্বভাবগত ব্যাপার হলেও সেজন্য পোশাক পরিধানের রীতি-পদ্ধতির ক্ষেত্রে জাতিতে জাতিতে ও দেশে দেশে, এমনকি যুগে যুগেও পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহের আলোকে স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার মধ্যে পার্থক্য করা যায় নিম্নোদ্ধৃত চিহ্নসমূহের ভিত্তিতেঃ

১. স্বাভাবিক ব্যাপারাদি ও মানুষের মধ্যে নিহিত প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি নিঃসৃত। তা সব মানুষের মধ্যেই থাকে। কোন মানুষই তা থেকে মুক্ত নয়।

২. স্বাভাবিক কার্যাদি মানুষ করে স্বভাবের তাকীদে। বাইরের কোন শিক্ষা বা প্রেরণার মুখাপেক্ষিতা থাকে না।

৩. মানুষের প্রকৃতি নিহিত ভাবধারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ভৌগোলিক কার্যকারণের প্রভাবে প্রভাবিত হয় না। তা এসব কার্যকারণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে।

কিন্তু অভ্যাসগত কাজকর্ম এ থেকে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তা পরিবর্তিত কার্যকারণে প্রভাবিত হয়। তা বিশেষ শিক্ষার ফসল।

আল্লাহ্ সম্পর্কিত আলোচনা বিশ্বজনীন প্রপঞ্চ

উপরের আলোচনা থেকে এই তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে আলোচনা এবং প্রকৃতি ঊর্ধ্ব বা বস্তু-অতীত জগতের প্রতি মানুষের তীব্র আকর্ষণ একটি সার্বজনীন ব্যাপার। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক মনীষিগণও একথা অকপটে স্বীকার করেছেন।

ফরীদ অজীদ লিখেছেনঃ

ভূমি খোদাই ও গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, পৌত্তলিকতা একশ্রেণীর প্রাচীন মানুষের সবচেয়ে প্রকাশমান ও অধিক স্পষ্ট উপলব্ধি ছিল। বিশ্বলোকের সূচনার প্রতি বিশ্বাস মানুষের আত্মপ্রকাশের পাশাপাশিই সূচিত হয়েছিল।[১]

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জন ডাউরস "ধর্ম ও মানব সমাজে তার মৌলিকতা" পর্যায়ে লিখেছেনঃ

প্রাচীন জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে কোন একটি জনগোষ্ঠীর জাতিসমূহের মধ্যে কোন একটি জাতির সংস্কৃতি এমন পাবে না, যাতে ধর্মের স্পষ্ট নিদর্শন ও কোন না কোনরূপে ধর্ম পালনের রীতি রয়েছে। ... ... বস্তুত ধর্ম পালনের শিকড় ইতিহাসের গভীর পরতে নিহিত। দূর অতীতে অলিখিত ইতিহাসের অজানা গভীরেও তার সন্ধা পাবে।[২]

মানব প্রকৃতিই আল্লাহ্র সন্ধান দেয়, শিক্ষা নয়

মানুষের মনের গভীর গহনে ধর্মীয় চেতনার অবস্থান কোন শিক্ষকের শিক্ষাদান কিংবা কোন উপদেশদাতার উপদেশ ব্যতীতই হয়ে থাকে। মানুষ

---

১. دائرة المعارف - ماده اله، وثن

২. الدين في التجارب

যেমন মান-সম্মান, ধন-দৌলত বা সৌন্দর্য ও যৌনতার অনুভূতি নিজের সত্তার ভিতর থেকেই লাভ করে, তা স্বতঃই হয়, কোন শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না— আল্লাহর প্রতি ঝোঁক প্রবণতাও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার। সেজন্য স্বতন্ত্রভাবে ও বিশেষ ব্যবস্থাপনাধীন অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন হয় না। পাশ্চাত্য দার্শনিক স্ট্যানলী হল-এর মতে, প্রত্যেক মানুষ তার বয়সের ষষ্ঠদশ পর্যায়ে পড়লেই এই চেতনা আপনা-আপনি জেগে উঠে। যে সব ব্যক্তি বাল্যকালে ধর্মীয় শিক্ষা পায়, তাদের মধ্যে অনুরূপ অনুভূতির বিস্ফোরণ লক্ষ্য করা যায় না। পূর্ব থেকে জেগে উঠা অনুভূতিই সেই বয়সকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয় মাত্র।

বস্তুত কোনরূপ শিক্ষা বা প্রেরণা দান ব্যতীতই দ্বীন, আল্লাহ্ ও ঈমানী বিষয়াদির প্রতি আকস্মিকভাবে যে প্রবণতা জেগে উঠে, তা-ই এই বিষয়ের স্বাভাবিক অকাট্য প্রমাণ।

তবে একটি কথা আমাদের সকলকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, এ অনুভূতি যদি নির্ভুল পর্যবেক্ষণেও পরিলক্ষিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, অনুভূতি মূলত ছিল; কিন্তু পরিবেশের চাপে তাতে বিকৃতি ঘটেছে। যেমন পৌত্তলিক ও আল্লাহ্র ইবাদত ত্যাগকারী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মীয় চেতনা চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ কার্যকারণের পরিণতি নয়

আমরা এই দুনিয়ার সর্বত্রসর্বত্র সকল অঞ্চল ও ভূখণ্ডে ধর্মীয় চেতনাকে বিস্তীর্ণ ও ব্যাপকরূপে দেখতে পাচ্ছি। মানবেতিহাসের কোন একটি অধ্যায়ও তা থেকে শূন্য নয়, এ দাবি বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত। ফলে একথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিভাত যে, এ চেতনা অভ্যন্তরীণ স্বভাবেরই প্রতিধ্বনি। স্বভাব ও প্রকৃতি ছাড়া তার উদ্রেগকারী অন্য কিছু নয়। কেননা তা যদি বিশেষ যুগে বা বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে তা কোন কোন স্থানে পাওয়া যেত এবং অন্য অনেক স্থানে লক্ষ্য করা যেত না; কোন কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্য করা যেত, অপর অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যেই তা পাওয়া যেত না।

কিন্তু ব্যাপার তো তা নয়। সকল অঞ্চলে সকল সময়ে সকল মানুষের মধ্যেই এই চেতনা সাধারণভাবে ও মানবেতিহাসের সকল অধ্যায়েই পরিলক্ষিত। আর তাই প্রমাণ করে যে, এই চেতনা কোন বাহ্যিক কার্যকারণের উৎপাদন বা পরিণতি নয়। এটা সম্পূর্ণরূপেই অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বেকার প্রখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক 'ব্লুওয়ার তাক' এ পর্যায়ে বলেছেনঃ

আমরা অনেক নগর-শহর পেতে পারি যার চারদিকে প্রাচীর নেই, বাদশাহ নেই, ধন-সম্পদ নেই, নিয়ম-নীতি বা বিহার ক্ষেত্র নেই, কিন্তু উপাসনালয় নেই বা অধিবাসীরা কোন-না-কোন ধরনের উপাসনায় অভ্যস্ত নয় এমন শহর-নগর-জনপদ কুত্রাপি পাওয়া যায় না।[১]

প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ সলীম হাসান বলেছেনঃ

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেছে যে, সাধারণভাবে দুনিয়ার জনগোষ্ঠীসমূহের প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর—তাদের সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা যা-ই হোক—একটি ধর্মমত রয়েছে। তারা সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তার শিক্ষাকে তারা মেনে চলে।[২]

ধর্মীয় অনুভূতি চাপা দেয়া গেলেও উৎপাটিত করতে পারেনি

সন্দেহ নেই, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে, সমাজে ও অঞ্চলে ধর্মীয় চেতনার বিকাশ বৃদ্ধির পথে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু কোথাও এবং কারোর পক্ষেই সেই চেতনাকে নির্মূল করা সম্ভবপর হয়নি। এমনকি বর্তমানে—যখন পৃথিবীর এক উল্লেখযোগ্য অংশে বামপন্থী বস্তুবাদী চিন্তা মতবাদের যাঁতাকলের নিষ্পেষণ চলছে মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্বাসের উপর বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক-কমিউনিস্ট শাসন-শৃঙ্খলের অধীন, তখনও ধর্মীয় চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার সাধ্য কারোরই হয়নি।[১] বর্তমান বিশ্বের—এই বস্তুবাদী জগতেরও অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা প্রবলতর হয়ে উঠেছে। যে সোভিয়েট রাশিয়ায় ব্যাপক আল্লাহ্ বিরোধী ও ধর্ম-বিরোধী প্রচারণা চলছিল প্রথম দিক থেকেই, সেখানেও তার প্রাবল্য দেখে কমিউনিষ্ট শাসন কর্তৃপক্ষ রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, বরং শেষ পর্যন্ত কিছু-না-কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি দিতেও বাধ্য হয়েছিল। কমিউনিস্ট চীনেও এ খেলা চলছে প্রায় শুরু থেকে। আর বর্তমানে তো সেখানে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, সরকারীভাবেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সুবিধা দান করা হয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে।

ফলে ধর্মীয় চেতনার মানব-প্রকৃতি নিহিত হওয়া সংক্রান্ত কুরআনী ঘোষণার যথার্থতাই প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনের মতই পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্ববিদরাও অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ধর্মীয় চেতনা হচ্ছে মানবাত্মার চতুর্থ দিগন্ত।

---

১. بين العلم والدين ص: ٣٦

২. بين العلم والدين ص: ٣٥

তাঁরা একথাও বলেছেন যে, মানবদেহের যেমন চারটি দিগন্ত রয়েছেঃ দৈর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা ও গতি, তেমনি মানব মনেরও পূর্বে বর্ণিত তিনটি স্বভাবগত প্রবণতা—যৌনতা, মান-সম্মান ও ধন-সম্পত্তি লাভ—রয়েছে, সেই সাথে রয়েছে ধর্মীয় চেতনাবোধ।

মার্ক্সবাদের প্রতি মার্ক্সবাদীদের আচরণ

মার্ক্সবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও অব্যাহত প্রচারণা চালিয়ে এসেছে এবং এখনও ব্যাপকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণের মন-মগজ থেকে ধর্মীয় চেতনাকে চিরতরে নির্মূল করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাদের মতে ধর্ম হচ্ছে পশ্চাদপদতার প্রধান কারণ। তা মানুষের স্বাধীনতার পরিপন্থী। সকল প্রকারের উন্নতি, অগ্রগতি ও উৎকর্ষের প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক। কিন্তু আগেই বলেছি, এ পর্যায়ে তাদের চরম ব্যর্থতা অত্যন্ত করুণ। ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে ধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র বীতশ্রদ্ধ বা তার পবিত্রতা বোধহীন বানাতে তারা সামান্য মাত্রায়ও সফলতা অর্জন করতে পারে নি।

মার্ক্সবাদীরা ধর্মবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে যে, তাদের মনে ধর্মের প্রতি চরম অন্ধ বিশ্বাস বাসা বেঁধেছে এবং তার মাত্রাও অনেক বেশী। অথচ মাক্স্যবাদী ব্যক্তিরা মার্ক্সীয় দর্শন ও মতবাদের প্রতি তাদের চাইতেও অনেক বেশী মাত্রায় অন্ধবিশ্বাস পোষণ করে। এ ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাসী ও মার্ক্সবাদ বিশ্বাসীদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। মার্ক্সবাদীরা কার্লমার্ক্স, এঞ্জেলস ও লেনিনের কথাকে শতকরা একশ' ভাগ সত্য ও নির্ভুল মনে করে। তাদের ধারণায় তা হচ্ছে সকল ভুল-ভ্রান্তি ও অযৌক্তিকতার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। তা নিতান্তই অকাট্য, কোন দিক দিয়েই কোন ত্রুটি তাতে প্রবেশ করতে পারে না। এ ধারণা ঠিক তেমনি, যেমন ধর্ম বিশ্বাসীরা তাদের ধর্মের উৎস আসমানি গ্রন্থকে সর্বৈব সত্য ও ভুল-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করে।

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র প্রাভদা ১৯৪৯ সনের ২৬ এপ্রিল সংখ্যায় লিখেছিলঃ 'আমরা তিনটি জিনিসে বিশ্বাসীঃ কার্লমার্ক্স, লেনিন ও স্ট্যালিন'। আর 'আল্লাহ্, ধর্ম ও ব্যক্তি-মালিকানা—এই তিনটির প্রতি আমরা বিশ্বাসী নই।'

তারা মার্ক্সীয় দর্শনে কোনরূপ পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে বলে বিশ্বাস করতে আদৌ প্রস্তুত নয়। এ যে নিতান্তই অন্ধত্ব ছাড়া আর কিছু নয়, তা প্রমাণের জন্য ভিন্নতর কোন প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন আছে কি?

এ প্রেক্ষিতে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও ধর্মীয় প্রবণতা মানব প্রকৃতিতে নিহিত এক পরম সত্য।

একজন লোক ইমাম জা'ফর সাদেক (র)-কে বলেছিলঃ 'আল্লাহ্ কে তা আমাকে চিনিয়ে দিন, এ নিয়ে বহু লোকের সাথে আমার বিতর্ক ও ঝগড়া হয়েছে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ 'তুমি কি কখনও নৌকায় চড়ে নদীতে গেছ? লোকটি বলল, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন দিন কি এমন অবস্থা দেখা দিয়েছে যে, নৌকা বিপদে পড়েছে, তা আর তোমাকে বাঁচাতে পারছে না? সাঁতার কেটে কিনারে যাবে, তারও কোন উপায় জানা নেই? বলল, হ্যাঁ, এরূপও হয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বল, এরূপ অবস্থায় তোমার মন কি বলে উঠেছে যে, বাহ্যত রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় দেখা না গেলেও নিশ্চয়ই এমন কেউ আছেন, যিনি এই কঠিন মহূর্তে তোমাকে রক্ষা করতে পারেন? বলল, হ্যাঁ, তা মনে হয়েছে। বললেন, তবে জানবে, সেই নিরুপায়ের উপায় চরম আশ্রয় যে সত্তা, তিনিই হচ্ছেন মহান আল্লাহ্। যেখানে মুক্তিদাতা কেউ নেই, রক্ষাকর্তা কেউ নেই, সেখানে তিনিই মুক্তিদাতা ও রক্ষাকর্তা হয়ে বান্দার সম্মুখে আসেন। যার ফরিয়াদ শুনার কেউ কোথাও নেই, তিনিই হচ্ছেন তার ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও আশ্রয় দানকারী।

পূর্ববর্তী দীর্ঘ আলোচনা প্রমাণ করছে যে, মানুষের স্বভাবগত অনুভূতি তার জন্মকাল থেকেই এবং তা তার জীবনের সকল পর্যায়েই অব্যাহত থাকে। ক্রমাগতভাবে তার অস্তিত্ব পূর্ণত্ব পায় এবং তার আচার-আচরণের মাধ্যমে ক্রমশ উন্মোচিত ও বিকশিত হয়। অবশ্য নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি উক্ত কথার বিপরীত বক্তব্য দেয় বলে কেউ কেউ মনে করেছেনঃ

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۝ (النحل: ٧٨)

এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মা'দের গর্ভ থেকে এমনভাবে বের করেছেন যে, তোমরা তখন কিছুই জানতে না। আর তিনি তোমাদের জন্য শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও চিন্তাশক্তির উৎস বানিয়েছেন, যেন তোমরা শোকর কর।

এ আয়াতটি মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মতকেই সমর্থন করছে। তা হলো মানুষের প্রথম সৃষ্টিকালে তাদের মন জ্ঞান-তথ্যাশূন্য থাকে, প্রাকৃতিক জ্ঞান কিংবা অন্য কিছুই তাদের জানা থাকে না।

এর জবাবে বলা যায়, تصورات বা ধারণাসমূহ এবং تصديقات বা সিদ্ধান্তসমূহ হয় উপার্জিত হবে, না হয় হবে স্বতঃস্ফূর্ত। উপার্জিত হতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ সংযোজিত করার মাধ্যমে। ফলে এই স্বতঃস্ফূর্ত পর্যায়ের জ্ঞানসমূহের পূর্বাহ্নে শিক্ষা লাভ একান্ত জরুরী।

তবে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানসমূহের কিছুই পূর্বে আমাদের মনে অর্জিত থাকে না। তা পরে অর্জিত হয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। শিশু যখন একটি জিনিস বারবার দেখে, তখনই তার স্বরূপ তার মানসপটে অংকিত হতে পারে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্পর্কেও এই কথা।

আল্লাহ্ ও বংশজগত

এই পর্যায়ের আলোচনার ভিত্তি হচ্ছে নিম্নোদ্ধৃত তিনটি আয়াতঃ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ * وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * (الاعراف: ١٧٢-١٧٤)

এবং হে নবী! লোকদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের রব্ব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং স্বয়ং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ আমি কি তোমাদের রব্ব নই? তারা সকলেই বলে উঠলঃ নিশ্চয়, আপনিই আমাদের রব্ব। আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। এ কাজ আমরা করলাম এ জন্য যে, তোমরা কিয়ামতের দিন যেন না বল যে, 'আমরা তো এই বিষয়ে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম'। কিংবা যেন বলতে শুরু না করে যে, শির্ক তো আমাদের বাপ-দাদারাই আমাদের পূর্বে শুরু করেছিল, আমরা তো পরে তাদের বংশধর হয়েছি মাত্র। এক্ষণে কি আপনি ভ্রান্ত ও বাতিল পন্থী লোকদের করা অপরাধের দরুন আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? .... লক্ষ্য কর, এভাবেই আমরা নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট করে পেশ করে থাকি। করি এই উদ্দেশ্যে, যেন এরা ফিরে আসে।

বিবেচনাযোগ্য কয়েকটি তত্ত্ব

১. আয়াতে যে ذُرِّيَّتَهُمْ শব্দটি রয়েছে, তা এছাড়া একবচন বহুবচন মিলিয়ে পঁচিশটিরও বেশী আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রায় সর্বত্রই এর অর্থ হচ্ছে 'মানব-বংশ'। তবে শব্দটির উৎপত্তি পর্যায়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেনঃ الذُّرِّيَّة শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে الذَّرّ থেকে, তার অর্থ 'সৃষ্টি' বা সৃষ্টিকূল—মাখ্‌লুক। কারো কারো মতে তার মূল الذَّر তার অর্থ

ক্ষুদ্রকায় বিশ্বলোক। তা ধূলিকণা বা ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকার ন্যায় সূক্ষ্ম।

অপর কিছু লোকের মত হচ্ছে, শব্দটি الذّرو বা الذّرى থেকে গৃহীত। তার অর্থ বিক্ষিপ্ত ও বিস্তীর্ণ হওয়া। আদমের বংশধরদের ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে দুনিয়ায় তাদের বিস্তীর্ণ, বিক্ষিপ্ত ও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কথা বোঝাবার জন্য।[১]

২. الذّرّيّة শব্দটি কুরআনে প্রায়ই ছোট বয়সের কাচ্চা-বাচ্চাদের (Springs) বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ

وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ (البقرة: ٢٦٦)

এবং তার রয়েছে ছোট ছোট বা দুর্বল কাচ্চা-বাচ্চা।

শুধু সন্তান বোঝাবার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ (الانعام: ٨٣)

এবং তার সন্তানের মধ্যে রয়েছে দায়ূদ ও সুলায়মান।

এক ব্যক্তি সম্পর্কেও এই শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। যেমনঃ

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، (ال عمران: ٣٨)

হে রব্ব, আমাকে তোমার নিকট থেকে একটি সৎ সন্তান দাও।

এটা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর দোয়া।

বহু সংখ্যক সন্তান বোঝাবার জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ

وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ (الاعراف: ٧٣)

এবং তাদের পরে আমরা বংশধর হয়েছিলাম।

ذرّيّة শব্দের এই তাৎপর্য ব্যাখ্যার পর মূল আয়াতটি সম্পর্কে গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে হবে। এ পর্যায়ে আমাদের বিশ্লেষণ হচ্ছেঃ

১. আয়াতটি জানাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক আদম-সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধর ও সন্তানাদিকে বের করেছিলেন, কেবল এক আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ

১. مفردات امام راغب اصفهانی، تفسیر مجمع البیان ج ۱، ص: ۱۹۹

স্মরণ কর, তোমার রব্ব যখন বনী আদমের—আদমের সন্তানদের থেকে গ্রহণ করলেন।

'আদমের থেকে তাঁর সন্তানদের গ্রহণ করেছেন' একথা বলা হয়নি। ফলে আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সন্তানদের বের করার প্রচলিত কথার কোন ভিত্তি নেই। বরং সমস্ত আদম সন্তান থেকে তাদের বংশধরদের বের করেছিলেন... ...

২. আয়াতটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ আমাদেরকে আমাদের নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়েছেন। আমরা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছি যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের রব্ব। যদিও এই স্বীকৃতির কথা এখন আমাদের স্মরণ নেই।

৩. আয়াতটি স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, এই সাক্ষী বানানো ও চুক্তি গ্রহণের ফলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট একথা বলার কোন অধিকার আমাদের থাকবে না যে, আমরা এই সাক্ষ্য দেই নি বা আমরা আল্লাহ্র সাথে এই চুক্তি করিনি। বাতিল পন্থী ও মুশরিক লোকেরা যদি তা বলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ....

অথবা তোমরা বলবে যে, আমাদের পূর্বপুরুষের লোকেরা পূর্বেই শির্ক করেছে (এই কথা গ্রহণ যোগ্য হবে না)।

অপর দিকে এ চুক্তি সম্পর্কে আমরা কিছু জানতাম না বলে দাবি করারও কোন সুযোগ থাকবে নাঃ

أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔

অথবা তোমরা কিয়ামতের দিন বলবে যে, আমরা এ বিষয়ে বে-খবর ছিলাম। (না, তা-ও সত্য নয়।)

এই বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে **একটি** প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হচ্ছেঃ

আমরা জানি না একথা বলার পথ বন্ধ হয়ে যাবে কি করে? যে চুক্তি সম্পর্কে আমাদের কিছুই স্মরণ নেই কিংবা যে বিষয়ে আমাদের কিছুই জানা নেই সেই বিষয়ের বাধ্যবাধকতা আমাদের উপর কি করে আরোপিত হতে পারে?

অর্থাৎ এ চুক্তি সম্পর্কে যখন কোন জ্ঞান আমরা পাইনি তখন আয়াতটি কি করে স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারছে যে, এ চুক্তি সম্পর্কে গাফিল থাকার দাবি করার

কারোরই কোন অধিকার থাকবে না? ... কেননা এই দুনিয়ায় তো এ সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞানই অর্জিত হয়নি?

৪. এ আয়াতের সম্বোধন হয় নবী করীম (স)-এর প্রতি, যাঁর উপর আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। অথবা তা সাধারণভাবে সমগ্র মানব বংশকে সম্বোধন করেছে। আয়াতের প্রথম দিকে নবী করীম (স)-এর প্রতি সম্বোধন থাকলেও শেষের দিকের সম্বোধন যে সমগ্র মানব বংশের দিকে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

৫. কুরআন এ আয়াতটির মাধ্যমে এ কথা বলার পূর্বে সংঘটিত একটি ঘটনার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে। শুরুর শব্দ اذ যখন—স্মরণ কর যখন—' এ নিঃসন্দেহে অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

সন্তান বা বংশধর জগত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত

আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে জানতে পারা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমের নিকট থেকে একটি চুক্তি ও তাঁর রব্ব হওয়ার ব্যাপারে একটি স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই চুক্তি গ্রহণ অনুষ্ঠানের স্বরূপ আয়াতটিতে বিবৃত হয়নি। সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। এই কারণে উক্ত চুক্তি গ্রহণের ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে তাফসীরকারগণের বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম মত

এ পর্যায়ে একটি মত হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকালে আদমের সন্তানদেরকে তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে ক্ষুদ্রকার বাচ্চা-কাচ্চারূপে উপস্থিত করে তাদের নিকট থেকে এই বলে চুক্তি গ্রহণ করেছেন أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ 'আমি কি তোমাদের রব্ব নই?' তারা বলেছে, হ্যাঁ, অবশ্যই। পরে তাদেরকে আবার আদম পৃষ্ঠে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এসব সূক্ষ্ম ক্ষুদ্রাকায় সত্তাসমূহ ছিল যথেষ্ট মাত্রায় চেতনাসম্পন্ন, বিবেকবান। আল্লাহ্ তাদেরকে যা বলেছিলেন তা তারা শুনতে পেয়েছিল এবং তার জবাবও তাঁরা দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ বনী-আদমের নিকট থেকে এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছিলেন কিয়ামতের দিন ওযর-আপত্তি প্রকাশের পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে।

এ মতটি গৃহীত হয়েছে একথার ভিত্তিতে যে, ذرية শব্দটি ذر মূল থেকে গৃহীত। বহুসংখ্যক তাফসীর লেখক এই মত প্রকাশ করেছেন।

এ মতটির সমালোচনা

১. এ মতটির ত্রুটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে এভাবে যে, আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্যের সাথে এ মতটির সঙ্গতি নেই। কেননা উপরে যেমন বলেছি, বাহ্যত

আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের ভাবী সন্তানদের বের করেছিলেন, কেবল আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকেই নয়। আয়াতে ظُهُوْرِهِمْ 'তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে' কথাটি যেমন বহুবচনের, তেমনি ذُرِّيَّتَهُمْ 'তাদের সন্তানদের' কথাটিও বহুবচনের। এ কারণে উক্ত মতটির সাথে আয়াতের বক্তব্যের কোন মিল নেই। কেবল আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে কেবল তাঁর সন্তানদের বের করা হলে তো দুটি স্থানেই একবচন ব্যবহৃত হতে হতো—কিন্তু তা হয়নি।

২. আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী বনী-আদমের নিকট থেকে উক্ত চুক্তি ও স্বীকারোক্তি যখন গ্রহণ করা হয়েছিল, তখন তারা সম্পূর্ণ মাত্রায় সচেতন ছিল। তাহলে দুনিয়ায় এসে আমাদের একজন লোকও তা স্মরণ করতে পারছে না কেন?

এ প্রশ্নদ্বয়ের জবাবে বলা যায়, আসলে মানুষ ভুলে গেছে উক্ত চুক্তি ও স্বীকারোক্তি গ্রহণের সময়টিকে। মূল চুক্তি ও স্বীকারোক্তিকে ভুলে যায়নি কেননা প্রত্যেকটি মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁর 'রবুবিয়াত' লালন-পালনের অনুভূতি নিজের মধ্যে পায়। এই অনুভূতিই যে বংশজগতে কথিত স্বীকারোক্তির স্বভাবগত সম্প্রসারণ, তা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

এ জবাবটি খুব যথার্থ—তা বলা যায় না। কেননা আমরা আমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি যে স্বাভাবিক ঝোঁক অনুভব করি, তা সেই চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এমন দাবি করার কোন ভিত্তি নেই। তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ও তাঁর রবুবিয়াতের স্বাভাবিকতারও ফল হতে পারে। সে চুক্তি অনেক পূর্বে গৃহীত হয়েছিল বলেই মানুষ তার কথা বিস্মৃত হয়ে গেছে, এরূপ কথার যুক্তিও খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। বিলম্ব হলেই যে লোকেরা তা ভুলে যাবে, কুরআনের অপর আয়াত দ্বারা তা খণ্ডিত হয়ে যায়। যেমন কিয়ামতের পর জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদের জিজ্ঞেস করবে বলে কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

إِنَّ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ قَالُوا نَعَمْ (الاعراف: ٤٤)

আমাদের রব্ব আমাদের নিকট যে ওয়াদা করেছিলেন, আমরা তো তা সত্যরূপেই পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের রব্ব-এর ওয়াদাকে সত্য রূপে পেয়েছ? তারা বলবে—হ্যাঁ।

এ আয়াতে যে দু'শ্রেণীর লোকদের নিকট করা ওয়াদার কথা বলা হয়েছে তা তো বহু পুরাতন কালেরই ওয়াদা। সে ওয়াদাটা ভুলে যাওয়া হয়নি বলেই তো এ কথা বলা সঙ্গত হয়েছে

৩. চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, চুক্তিবদ্ধ পক্ষ সেই অনুযায়ী কাজ করবে। কিন্তু সে যদি তা ভুলে-ই গেল, তাহলে এই চুক্তির ফায়দাটা কি? আর মানুষ যখন তার কথা ভুলেই গেছে, তখন সেটিকে একটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করে তার উল্লেখ করেই বা কি লাভ, আর সে অনুযায়ী কাজই বা হবে কিভাবে? এ সবের প্রেক্ষিতে বলা যায়, উপরোক্ত মতটি যথার্থ নয়।

দ্বিতীয় মত

কতিপয় তাফসীরকার মত প্রকাশ করেছেন যে, এ আয়াতটি আসলে স্বভাবগত তওহীদেরই প্রমাণ করছে। তাঁরা বলেছেন, মানুষ যখন এই দুনিয়ায় ভূমিষ্ট হয়, তখন সে কতগুলি স্বজ্ঞা ও যোগ্যতা এবং কতগুলি স্বাভাবিক প্রয়োজন ও বুদ্ধিগত অনুভূতির ধারাবাহিকতার সমন্বয়ে হয়ে আসে। পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে মা'র জরায়ূর মধ্যে প্রবেশকালে এবং শুক্রকীট অবস্থায় বিন্দু বা সূক্ষ্ম "অণু'র চেয়ে বড় কিছু থাকে না। কিন্তু তাতেই অনবচেতন (sub-conscious mind) ও স্বজ্ঞা (Instinct) পুরোপুরি বর্তমান থাকে। এসব যোগ্যতার মধ্যে আল্লাহ্র পরিচিতি ও সে সম্পর্কিত চেতনা অন্যতম। পরে তা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হয় সেই বিন্দু বা 'অণু'র পূর্ণত্ব প্রাপ্তির সাথে সাথে। পাশাপাশি অপরাপর যোগ্যতাও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত শক্তি হিসেবে বর্তমান থাকা যোগ্যতা কার্যকর প্রকাশমান হয়ে দাঁড়ায়। যা কিছু অন্তর্লোকে প্রকাশ সম্ভব হয়ে বর্তমান ছিল, তা-ই কার্যত প্রকাশিত হয়।

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে তার জন্ম মুহূর্তেই আল্লাহ্র পরিচিতির চেতনা অনুভূতি ও স্বজ্ঞা এবং মানব প্রকৃতিতে বপিত আল্লাহ্র তত্ত্বরূপে প্রকৃতি ঊর্ধ্ব জগতের দিকে ঝোঁক ও প্রবণতা বর্তমান থাকে। বাইরের প্রভাব চাপ বা হস্তক্ষেপ না হলে আল্লাহ্-পরিচিতির এই প্রবণতা মানব মনে ঘুমন্ত অবস্থায় পড়ে থাকত এবং মানুষ কখনই—কোন অবস্থায়ই নিরংকুশ তওহীদের উচ্চ পথ থেকে বিচ্যুত হতো না। মনস্তত্ত্ববিদরা এটাকেই ধর্মীয় চেতনা নামে অভিহিত করেছেন। শুধু তাই নয়, তাদের কেউ কেউ আবার মানুষকে Metaphysical Animal বা 'প্রকৃতি ঊর্ধ্ব জীব' নামে অভিহিতও করেছেন।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের মা'দের গর্ভে যখন নিয়ে এসেছেন তখনই তার গোটা প্রকৃতি সংস্থাকে এমন বিশেষভাবে তৈরী করেছেন যে, তারা তাদের রব্বকে সব

সময়ই চিনতে পারে, প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের মুখাপেক্ষিতা তীব্রভাবে অনুভব করে। আর যে মুহূর্তে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি নিজেদের মুখাপেক্ষীতা অনুভব করে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঝোঁক তীব্র হয়ে উঠে, ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রশ্ন রাখেনঃ 'আমি কি তোমাদের রব্ব নই?... 'আর জবাবে সঙ্গে সঙ্গেই তারা বলেঃ 'নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ্, তুমিই আমাদের রব্ব।'

তাহলে পূর্বোদ্ধৃত আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আয়াতে বলা চুক্তিটি আইনগতভাবে হয়নি। শাব্দিক সম্বোধন ও তার জবাব রূপেও তা সম্পাদিত নয়। বরং তা সৃষ্টিগত ও স্বাভাবিক স্বজ্ঞাগত চুক্তি এবং তার স্বীকৃতি মাত্র। এ ধরনের চুক্তির কথা কুরআনে বহুস্থানে বলা হয়েছে। আমরাও নিত্য কথাবার্তার মাধ্যমে এরূপ বলে থাকি।

ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্ আমাদেরকে চক্ষু বা দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। তার অর্থ, আমাদের নিকট থেকে তিনি ওয়াদা নিয়েছেন যে, আমরা যেন খানা-খন্দকে না পড়ি বা সে চক্ষু যেন নিষিদ্ধ স্থানে ব্যবহার না করি। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ আমাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন এবং আমাদের নিকট থেকে ওয়াদা গ্রহণ করেছেন যে, আমরা যেন তদ্দারা হক্ক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করি। কুরআন মজীদে আসমান যমীন সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ، قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ *
(حم السجدة: ١١)

আল্লাহ্ তাকে (আসমানকে) ও যমীনকে বলেনঃ তোমরা দুটিই অস্তিত্ব ধারণ কর ইচ্ছায় হোক, কি অনিচ্ছায়। উভয়ই বললঃ আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম ঠিক অনুগতদের মতই।

যদিও আসমান ও যমীন কোনরূপ চেতনা অনুভূতি ও বিবেকবুদ্ধির ধারক নয়, তবুও সে দুটির এরূপ কথোপকথন নিশ্চয়ই শাব্দিকভাবে সম্পন্ন হয়নি, বরং সৃষ্টিগতভাবেই রূপায়ণের মাধ্যমে—তা সম্পন্ন হয়েছিল। তার অর্থ, আসমান যমীন সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সংকল্পের (স্বভাবগত নিয়মের) অধীন। আল্লাহ্‌র চাপিয়ে দেয়া নিয়ম অনুযায়ী-ই সে দুটি নিয়ন্ত্রিত ও আবর্তিত হচ্ছে।

কিন্তু এ মতটিও আপত্তি ও প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকতে পারেনি। উক্ত ব্যাখ্যা আয়াতের বাহ্যিক বক্তব্যের বিপরীত মনে হয়। কেননা যদি সে কথাই বলতে হতো, তাহলে আরও স্পষ্ট ভাষায় কথাটি বলা যেত।

তৃতীয় মত

সময় ও কাল ক্রমাগতভাবে প্রকাশমান। সময়ের অংশসমূহ তার প্রতিমুহূর্ত নতুন হওয়ার কারণে একই স্থানে একত্রিত হয় না। সময়ের এই ক্রমবিবর্তনতা ও বিকাশমানতা কেবল সময় বা কালেরই বিশেষত্ব নয়। প্রত্যেক ঘটনাই সময়ের অঙ্গণে বিস্তীর্ণ হয়ে থাকে।

তাছাড়া বিশ্বের ঘটনাবলী সময়ের দিক দিয়ে তিন পর্যায়ে বিভক্তঃ অতীতের ঘটনাবলী, বর্তমানের ঘটনাবলী ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী।

প্রত্যেকটি ঘটনারই সময় ও স্থান এই দুইটি বিশেষত্ব রয়েছে। ফলে সময়ের বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডলে বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে কোন একটি সময়ের যাবতীয় ঘটনা একবারে ও এক নজরে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। আর সেই সবগুলিকে নিজের নিকট একত্রিত করে ধরে রাখাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু মানুষ যদি সময় ও স্থানের ঊর্ধ্বে থেকে ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে, আর কালের প্রতিটি অংশের প্রতি একই প্রপঞ্চ হিসেবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহলে তখন সময়ের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত এই বিভক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।

যেমন এক ব্যক্তি একটি কক্ষে বসে ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এই সময় গবাক্ষপথের বাইরে থেকে গরুর বা মানুষের একটি মিছিল চলে যাচ্ছে। এ সময় সে ব্যক্তি প্রতিমুহূর্তেই শুধু গরু বা মানুষই দেখতে পাবে।

কিন্তু সে যদি সে কক্ষের ছাদের উপর উঠে উক্ত মিছিলের উপর দৃষ্টিপাত করে, তাহলে সে গোটা মিছিলটি এক নজরেই দেখে ফেলবে। তা গবাক্ষ পথে প্রতি মুহূর্ত গরু বা মানুষ দেখার মত অবস্থা হবে না।

কালের বেষ্টনীর মধ্যে বন্দী ব্যক্তির ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিদান কক্ষের মধ্যে বসে থেকে গবাক্ষ পথের মিছিলটি দেখার মতই। এরূপ অবস্থায় সে মিছিলটিকে ক্রমাগতভাবেই দেখতে পায়। কিন্তু মানুষ যদি এই বেষ্টনীর ঊর্ধ্বে উঠে ঘটনাবলীর প্রতি নজর নিবদ্ধ করে, তাহলে ঘটনার প্রত্যেকটি অংশ একই স্থানে সন্নিবিষ্ট দেখবে ও একটিমাত্র দৃষ্টিতেই সব দেখে ফেলবে। কেননা এখানে প্রেক্ষিত অত্যন্ত প্রশস্ত।

বিভিন্ন রঙ ও বর্ণের একটি কার্পেটের উপর চলমান একটি পিপীলিকা প্রতিটি মুহূর্ত এক-একটি বর্ণ দেখতে পায় তার দৃষ্টির সসীমতার কারণে, দৃষ্টি প্রেক্ষিত সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে। কিন্তু কোন মানুষ যখন ব্যাপক দৃষ্টিতে গোটা কার্পেটকে দেখবে, তখন সে প্রত্যেকটি বর্ণ একবারে ও একই নজরে দেখতে পাবে।

এসব কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ঘটনাবলীর নিকটত্ব ও দূরত্ব সাব্যস্ত হয় কালের বেষ্টনীর মধ্যে বসবাসকারীর অবস্থান প্রেক্ষিত। কালই তার নিকট ঘটনাবলীর কোনটিকে নিকটবর্তী করে আর কোনটিকে করে দূরবর্তী। কিন্তু কাল ও স্থানের উর্ধ্বে অবস্থানকারীর জন্য এই কাল বা স্থানগত দূরত্ব বলতে কিছুই থাকে না।

মানুষ ও অন্যান্যের জন্য এই জগতের অশংসমূহ—যা কালের বেষ্টনের মধ্যে বসবাস করে, তার দুটি দিকঃ

একটি আল্লাহ্র দিকে সম্পর্কিত দিক,

অপরটি কালের দিকে সম্পর্কিত দিক

সেটির আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত হওয়ার দিক দিয়ে এবং আল্লাহ্র তদ্দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার দিক দিয়ে অংশগুলির কোনটি অপর কোনটি থেকে 'গায়ের' হয় না, যেমন আল্লাহ্ কখনই তা থেকে 'গায়েব' হন না। সে অংশটিও আল্লাহ থেকে গায়েব হয় না। বরং সমগ্র সৃষ্টিলোক—অতীত-ভবিষ্যৎ হওয়া ছাড়া-ই আল্লাহ্র নিকট সব কিছু শুধু 'বর্তমান'।

কিন্তু এই জিনিসসমূহ কালের গর্ভে অবস্থিত ও তার সাথে ওতপ্রোত মিশ্রিত হয়ে থাকে বলে বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবস্থায় এবং কালগত দূরত্বে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন দেখা যায়। নির্দিষ্ট কতগুলি কার্যকারণ (Factors) আল্লাহ্কে তার নিকটবর্তী হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। যদিও আল্লাহ্র নিকট তার উপস্থিতি কখনই বাধাগ্রস্ত হয় না। এই সময় আল্লাহ্ এবং সেই জিনিসের দিল্গত দর্শনের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বকে দুটি দিকে বিভক্ত করা যায়।

বাতিন—

যাহির—

জগতের সামষ্টিক সত্তা বাতিন। আর অংশে-অংশে বিচ্ছিন্ন সত্তা যাহির। আল্লাহ্র কথা كُنْ হও - فَيَكُوْنُ 'তখন হয়'—এই দিক দুটির প্রতিই ইঙ্গিত করে।

একটি সামষ্টিক—একটি ক্রমিক।

كُنْ 'হও' শব্দটি জগতের একত্র-সমষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন সূরা আল-ক্বামার-এর ৫০ আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ

আর আমাদের সিদ্ধান্ত একটি একক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই হয় এবং নিমেষের মধ্যেই তা কার্যকর হয়।

এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী বলা যায়, আলোচ্য আয়াতটি আল্লাহ্র দরবারে একবারে সমষ্টিগতভাবে সংঘটিত অস্তিত্ব ও উপস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করে। সেখানে 'অনুপস্থিতি' অকল্পনীয়। যেন সমস্ত মানব বংশ একই মুহূর্তে একই সময়ে আদম বংশের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়ে আল্লাহ্র দরবারে হাযির হয়ে গেছে। এরূপ অবস্থায় স্বভাবিকভাবেই প্রত্যেকটি মানুষ তার রব্বকে উপস্থিত পাচ্ছে। আর এই আল্লাহ্ প্রাপ্তি-ই আল্লাহ্র অস্তিত্বের এবং তার রবুবিয়তের অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল।

কিন্তু মানুষকে কালের বেষ্টনের মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়, জীবনের বিবর্তন ঘটে। এই কারণে সে নিজেকে ভুলে যায় এবং আল্লাহ্র নিকট উপস্থিতি সম্পর্কিত জ্ঞান বিলীন হয়ে যায়।

কিন্তু এ মতের উপরও নানা আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আয়াতের মূল শব্দসমূহ যে তাৎপর্য দেয়, তার সাথে এ মতের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। একে তাফসীর না বলে বরং تاويل (তাৎপর্য) বলাই ভালো।

চতুর্থ মত

চতুর্থ মত হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম বংশধরদের মধ্য থেকে একটি জনসমষ্টিকে নির্দিষ্ট করে তাদের সৃষ্টি করলেন, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি পরিপক্ক ও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত করে দিলেন এবং তাঁর রাসূলগণের জবানী, তাঁর পরিচিতি লাভ ও তাঁর আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। ফলে তারা সেই বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হলো, তাদেরকে তাদের নিজেদের উপরই সাক্ষী বানালেন, যেন কিয়ামতের দিন কেউ বলতে না পারে যে, আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না কিংবা তাদের পিতৃপুরুষের শিরক্কে তাদের নিজেদের শির্কের বৈধতার জন্য ওযর বানাতে না পারে।

এ-ই হচ্ছে আলোচ্য আয়াতটির মূল বক্তব্য।

তার অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশেষ জনসমষ্টির নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, সাধারণভাবে সব মানুষের নিকট থেকে নয়। আর এই

জনগোষ্ঠী হচ্ছে মানব সমাজের মধ্য থেকে পূর্ণ মাত্রার বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী লোকগণ। এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছিল নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়ার মানুষের নিকট পাঠিয়েছিলেন।

এ মতটির ভিত্তি হচ্ছে একথা ধরে নেয়া যে, مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ বাক্যাংশের مِنْ 'কতক' বোঝাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই ব্যাখ্যার সমর্থনে বলা যায়, নবী করীম (স) নিজে কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের নিকট থেকে আল্লাহ্ তা'আলাকেই একমাত্র রব্বরূপে মেনে নেয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন বলে কুরআন মজীদেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ* سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ* (المؤمنون: ٨٧-٨٨)

তাদের জিজ্ঞাস কর হে নবী! সপ্ত আকাশ ও মহান আরশের রব্ব কে? ওরা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বল, তাহলে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর না কেন?

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এই ব্যাখ্যার আলোকে মানতে হয় যে, যারাই সে অঙ্গীকার করেছিল, শুধু তারাই মু'মিন, কেবল তারাই আল্লাহ্র তওহীদের প্রতি বিশ্বাসী, অন্যরা নয়। আর একথা কোনক্রমেই সহীহ্ হতে পারে না। উক্ত কথাই যদি আল্লাহ্র বলার ইচ্ছা ছিল, তাহলে কথাটি ওভাবে না বলে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বলতে পারতেন।

এ পর্যন্ত আমরা কথিত চুক্তি গ্রহণ সম্পর্কে বিজ্ঞ তাফসীরকারদের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করেছি মাত্র। ব্যাপারটি যে একটু জটিল এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন, তাতে সন্দেহ নেই।

তবে একালের প্রখ্যাত কুরআন বিশারদ মওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন'-এ এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে ব্যাপারটি অনেকটা সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। তাঁর দীর্ঘ ব্যাখ্যার সার সংক্ষেপ হচ্ছে, অনাদিকালে—মানব সৃষ্টিরও পূর্বে সমগ্র আদম সন্তানের নিকট থেকে আল্লাহ্ তা'আলা যে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন, আলোচ্য আয়াতে সেই কথাই বলা হয়েছে। অনাদিকালের এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিকে আল্লাহ্ তা'আলা একথার একটি দলিল রূপে গণ্য করেছেন

যে, প্রতিটি মানুষই আল্লাহ্‌র একমাত্র ইলাহ ও একমাত্র রব্ব হওয়ার সাক্ষ্য এবং স্বীকৃতি নিজের মধ্যে পোষণ করছে। এই কারণে কেউ অজ্ঞতা-অজ্ঞানতার দরুন কিংবা ভ্রান্ত পরিবেশে লালিত হয়েছে বলে নিজের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাবে না।

এর উপর যে প্রশ্ন উঠে তার জবাব দিয়ে বলেছেনঃ এ দুনিয়ায় আসার পর মানুষ তা ভুলে গেছে এজন্য যে, তা যদি মানুষের চেতন ও স্মৃতিপটে প্রকট রাখা হতো, তাহলে দুনিয়ার এই পরীক্ষাগারে মানুষকে পাঠানোই অর্থহীন হয়ে যেত। এই কারণে এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিকে চেতন স্মৃতিতে প্রকট না রেখে তা মানুষের অনবচেতনে ও স্বজ্ঞায় পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখা হয়েছে, যা বর্তমানে প্রত্যেকটি মানুষই নিজের মধ্যে অনুভব করে।

আল্লাহ্ এবং কুরআনে তাঁর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের বিপুলতা

'আল্লাহ্‌কে পাওয়ার পথ সৃষ্ট প্রাণীকুলের সংখ্যার সমান'—এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের মুখে মুখে এই কথাটি প্রচলিত। এক কথায় তার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের দলীল একটি—দুটি নয়, দশ বিশ একশ' নয়, তা তত যত সংখ্যার প্রাণী এ দুনিয়ায় আছে। কথাটি যথেষ্ট বিস্ময়োদ্দীপক। বিশেষ করে যারা আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞানের গভীরতা অর্জন করতে পারেনি, যারা তওহীদের নিগূঢ় তত্ত্ব আয়ত্ত করতে অক্ষম রয়েছে, তাদের ব্যাপারে উক্ত কথাটি কি করে সত্য হতে পারে?

দুনিয়ায় প্রাণীকুলের সংখ্যা কি কেউ গুণে শেষ করতে পেরেছে? তাহলে কি করে বলা যায় যে, দুনিয়ায় যত প্রাণী আছে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ তত?

কিন্তু তা সত্ত্বেও আকায়েদ ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থাদিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের যে প্রমাণাদির উল্লেখ হয়েছে, তা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে উক্ত কথাটি মোটেই বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে না। কেননা এই জগতের প্রতিটি 'অণু'র মধ্যে যে ব্যবস্থা সদা কার্যকর, তার প্রত্যেকটিই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ। সেই ব্যবস্থা আল্লাহ্'র অস্তিত্বের যে প্রমাণ পেশ করে তা অনস্বীকার্য। অথচ এই জগতে কত সংখ্যক 'অণু' রয়েছে, তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই জানে না, জানতে পারে না। এ পর্যায়ের মূল দলীলসমূহের প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা যাচ্ছেঃ

প্রকৃতির দলীল

প্রকৃতির দলীল বলতে নিশ্চয়ই দিল ও অন্তরের দলীল বোঝায়, বিবেকবুদ্ধি ও যুক্তি প্রমাণের দলীল নয়।

প্রত্যেকটি মানুষের দিল ও অন্তঃকরণ আল্লাহ্ প্রবণ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ অন্তর দিয়ে আল্লাহ্‌কে অনুভব করে, ভাবে। তা প্রতি মুহূর্তেই হোক কিংবা দীর্ঘ জীবনের কোন না কোন সময়ে। প্রতিটি মানুষের দিলের এই আল্লাহ্ মুখিতা ও আল্লাহ্-প্রবণতা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের এক একটি দলীল বিশেষ। আর একেই আমরা প্রকৃতির দলীল বলছি।

নতুনত্বের দলীল

এ বিশ্বলোক এবং এখানে যা কিছুই আছে তা সবই নবতর সৃষ্টি। পূর্বে তা ছিল না, পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে। ফলে প্রত্যেকটিরই একটা সূচনা আছে।

আর যা পূর্বে ছিল না পারে অস্তিত্ব লাভ করেছে, তার এক জন অস্তিত্বদানকারী থাকা একান্তই অপরিহার্য। কেননা কোন জিনিসকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বশীল বানাবার কাজটি একজন অস্তিত্বদানকারী ব্যতীত কল্পনাও করা যায় না।

মুসলিম কালাম শাস্ত্রবিদ (দার্শনিক)-গণ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিশ্বলোকের নতুন করে অস্তিত্ব লাভকে যুক্তি বা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। আর এ যুক্তি কিছুমাত্র দুর্বোধ্য নয়।

সম্ভাব্যতার দলীল

মুসলিম দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বেশীর ভাগ গুরুত্ব আরোপ করেছেন বিশ্ব-বস্তুসমূহকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করার উপরঃ

ওয়াজিবঃ অনিবার্য, অপরিহার্য;

মুম্‌কিনঃ সম্ভব, হতে পারে;

মুমতানিঃ مُمْتَنِع অসম্ভব, হতে পারে না।

তা এজন্য যে, মানস জগতে আমরা যে জিনিসেরই ধারণা পোষণ করি—যে প্রাপঞ্চ-ই দেখি, তাকে বহিঃ সত্তার দিক দিয়ে দুটি অবস্থার যে-কোন একটিতে দেখতে পাই।

হয় সে সত্তা স্বতঃই অস্তিত্বপ্রাপ্ত, তার সত্তাটা তার নিজের থেকেই উদ্ভূত, তা 'ওয়াজিব'।

অথবা তা এমন যে, তার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধভাবে অসম্ভব, বিবেক-বুদ্ধি তার অস্তিত্বকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তা মুম্‌তানি— مُمْتَنِع নিষিদ্ধ।

আর তার অস্তিত্ব হতে-ও পারে, না—ও হতে পারে-হওয়া বা না হওয়া উভয়-ই সম্ভব, তা নিজ থেকে অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোনটিরই দাবিদার নয়, তা 'মুমকিন'। এরূপ অবস্থায় হয় তা অস্তিত্ব সম্পন্ন হবে, না হয় হবে অস্তিত্বহীন এবং তা বাহ্যিক কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল হবে মধ্যম বা সমান অবস্থা থেকে তাকে বের করার জন্য। এইরূপ সত্তাকে مُمْكِنُ الْوُجُوْد 'সত্তা-সম্ভব' বলা হয়েছে।

বিশ্বলোকের বস্তু ও প্রপঞ্চসমূহ সম্পর্কে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন দেখতে পাই অনস্তিত্ব কিংবা অস্তিত্ব কোনটিই তার সারবস্তু (Quiddity) সত্তা—তার মৌল সত্তা থেকে টেনে আনা নয়, মূলত-ও তা তার মধ্যে বপিত

নয়। এই বস্তুকে যখন অস্তিত্বের পোশাকে ভূষিত দেখতে পাই, তখন বুঝতেই হবে যে, তার মৌল সত্তার বাইরে কোন Factor অবশ্যই থাকবে যা তাকে এই পোশাক পরিয়ে দিয়েছে। আর তা-ই হচ্ছে সেই জিনিস, যা অস্তিত্বহীনের জগত থেকে অস্তিত্ব সম্পন্ন জগতে বের করে নিয়ে এসেছে, অথবা তার বিপরীতটি হয়েছে।

সেই বাহ্যিক Factor- ও যদি উক্ত পর্যায়ের জিনিস হয়, তাহলে তা-ও অনুরূপভাবে অপর এক বাহ্যিক Factor-এর মুখাপেক্ষী হবে, যা তাকে অনস্তিত্বের স্তর থেকে অস্তিত্বের স্তরে নিয়ে এসেছে। আবার তা-ও যদি সম্ভাব্যতার বিশেষত্বে অনুরূপ অবস্থার হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্যও অপর এক বাহ্যিক Factor-এর প্রয়োজন দেখা দেবে। এভাবে একটা অশেষ ধারাবাহিকতার (تَسَلْسُل) সম্মুখীন হতে হবে।

পক্ষান্তরে প্রথম বাহ্যিক Factor যদি অস্তিত্বদানকারী ও বস্তুসমূহে عِلَّة বা কারণ হওয়া অবস্থায় সেই বস্তুসমূহেরই 'কার্য' (مَعْلُول) হয়, তাহলে دور বা আবর্তন অনিবার্য হবে। আর এই تَسَلْسُل ও دور দুটিই বিবেক-বুদ্ধির বাইরের ব্যাপার, দুরধিগম্য।

আর এ দুটিই যখন বাতিল প্রমাণিত হলো, তখন আমরা এই দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণে বাধ্য হই যে, সম্ভব জগতের সমস্ত ঘটনা এমন এক সংঘটক পর্যন্ত এসে থামবে—তা থেকে উদ্ভুত হবে, যা স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্য নিরপেক্ষ। তার অস্তিত্ব অপর কারোর মুখাপেক্ষী নয়। এমন এক সত্তাকেই যুক্তি বিজ্ঞানের (Logic) ভাষায় বলা হয় اَلْوَاجِبُ الْوُجُوْد এবং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ্, সর্বশক্তিমান, চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, সবকিছু স্থিতকারী। অন্যান্য সব কিছুই কেবল তাঁরই কারণে সত্তা সম্পন্ন।

এ-ই হচ্ছে সম্ভাব্যতা পর্যায়ের দলীল।

গতিশীলতার দলীল

এ্যারিস্টটল ও তাঁর অনুসারী প্রাচীন পদার্থ-প্রকৃতি বিজ্ঞানবিদগণ বস্তু ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিশীলতার জন্য একজন গতিদানকারীর অপরিহার্যতার দলীলের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করতেন।

তাঁদের বক্তব্যের সারনির্যাস হচ্ছে, এই গতিশীল-চলমান বিশ্বলোক ও আকাশ মার্গীয় সত্তা (Beings) সমূহের জন্য এমন একজন গতিদানকারী অবশ্য প্রয়োজন, যিনি নিজে গতিশীলতা মুক্ত। ফর্মূলা হচ্ছেঃ

لَا بُدَّ لِكُلِّ مُتَحَرِّكٍ مِنْ مُتَحَرِّكٍ غَيْرِ مُتَحَرِّكٍ

প্রত্যেকটি গতিশীল বস্তুর জন্য একজন এমন গতিদানকারী প্রয়োজন, যে নিজে গতিশীল নয়।

নিয়ম-শৃঙ্খলাভিত্তিক দলীল

এ বিশাল সীমাহীন বিশ্বলোক এবং তার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এক চরম মাত্রার বিস্ময়কর বিষয়। এ শৃঙ্খলা নিয়ম বিশ্বলোকের প্রতিটি বস্তু ও অণুকে পর্যন্ত গ্রাস করে রয়েছে, কোন কিছুই তার বাইরে নয়, তা থেকে মুক্ত নয়। সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপক নিয়ম-শৃঙ্খলা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, যা বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ্‌র সাথে পরিচিত করে দিচ্ছে। কেননা এ ধরনের সর্বব্যাপী ও চিরস্থায়ী নিয়ম-শৃঙ্খলা এক মহাপরিচালক সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রক শক্তি সম্পন্ন সত্তা ব্যতীত চিন্তাও করা যায় না।

সৃষ্টি লোকে আল্লাহ্‌র নির্দশনাদি বর্ণনা পর্যায়ে কুরআন মজীদে যেসব আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে, তা মূলত এই স্থায়ী ও সদা কার্যকর নিয়ম-শৃঙ্খলাকে ভিত্তি করেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করছে।

গাছের প্রতিটি পত্র পল্লব কিংবা বিশ্বলোকের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহ্‌র মহা কর্মকুশলতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে, প্রমাণ করে তাঁর প্রতি মুহূর্ত কার্যকর থাকার কথা। তা আরও অধিক কার্যকরভাবে প্রমাণ করে আল্লাহ্‌র মূল সত্তার অস্তিত্ব। কেননা প্রথমে মূল সত্তার অস্তিত্ব হলেই তার বিশেষত্ব প্রকাশিত হতে পারে। তাই কোন বিশেষত্বের প্রমাণিত হওয়া অনিবার্যভাবে প্রমাণ করে সেই বিশেষত্বের অধিকারী সত্তার অস্তিত্ব।

সম্ভাবনাসমূহের পর্যালোচনার দলীল.

এ পর্যায়ের দলীল পাশ্চাত্য দার্শনিকদের উদ্ভাবিত। ক্যারিসি মরিসন তাঁর 'জ্ঞান ঈমানের আহবান জানায়' শীর্ষক গ্রন্থে এই দলীলটিকে অধিক পরিপক্কতা ও স্পষ্টতা দিয়েছেন। মনে হয়, তাঁর এ গ্রন্থটির লক্ষ্যই হচ্ছে এই দলীলটিকে অধিক পরিপক্ক ও স্পষ্ট করে তোলা।

তাঁর বক্তব্যের সার কথা হলোঃ সন্দেহ নেই পৃথিবীর বুকে জীবনের বর্তমান রূপে আত্মপ্রকাশ বহু 'কারণ' ও ফ্যাক্টর-এর বিপুলতারই ফসল। এমনভাবে যে, তার একটি কারণ বা 'ফ্যাক্টর' সংগৃহীত না হলে পৃথিবীতে জীবনের আত্মপ্রকাশ অসম্ভব থেকে যেত। জীবন্তদের জীবন লাভ কখনই সম্ভবপর হতো না।

জীবনের প্রকাশ যদি প্রথম অবস্থার 'বস্তুর' দুর্ঘটনা স্বরূপ সংঘটিত বিস্ফোরণ বা বিস্ফোরণসমূহের ফলে হয়ে থাকে, তাহলে বহু শত কোটি আকার-আকৃতি ও অবস্থা-পরিস্থিতি সংগঠিত হওয়া সম্ভবপর ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিস্ফোরণের ফলে অন্য কোন ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়ে বর্তমানের এ রূপ কেন সংঘটিত হলো? অন্য লক্ষ্য-কোটি রূপের পরিবর্তে এই রূপটিকেই বা বাছাই করে নেয়া হলো কেন? অথচ কেবল দুর্ঘটনার কারণে প্রকাশিত সেই সহস্র-লক্ষ-কোটি রূপ সংঘটিত হওয়া তো সম্ভব ছিল?

এ প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত ও বিবেকসম্মত কোন জবাব পাওয়া যায় না। তাই হঠাৎ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা (By chance)-কে দুর্ঘটনা ছড়া অন্য কিছু মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অন্য কথায়, পৃথিবী গোলকে জীবনের প্রকাশ ঘটার জন্য অপরিহার্য শর্তসমূহের বিপুলতা শত কোটি বারের মধ্যে মাত্র একবার, শুধু একবারের দুর্ঘটনায় এই রূপ হয়েছে, এমন কথা মেনে নেয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক।

'ঘটনাক্রমে সংঘটিত হওয়া' পর্যায়ে তিনি লিখেছেন, পৃথিবী গোলকের পুরুত্ব 'বৃহৎ' (جسم Bulky), সূর্য থেকে তার অবস্থান দূরত্ব, জীবন দায়িনী সূর্যতাপ ও আলোবিচ্ছুরণের মাত্রা, ভূ-পৃষ্ঠের ঘনত্ব (Thickness), জলীয় পরিমিতি, কার্বনডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ, নাইট্রোজেনের ঘনত্ব ও মানুষের আত্মপ্রকাশ এবং জীবনে তার স্থিতিলাভ—এ সবই অনিয়মতা থেকে নিয়মানুবর্তিতায় বের হয়ে আসার কথা প্রমাণ করে। প্রমাণ করে এসবের মূলে নিহিত থাকা এক মহা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবাদের কথা, লুকিয়ে থাকা এক দৃঢ় সংকল্পের কথা। আর মহাশূন্যে আবর্তনশীল অসংখ্য তারকা-নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে কেবল এই পৃথিবী গ্রন্থেই লক্ষ্য কোটি বারের মধ্যে একবারের বিস্ফোরণে জীবনের উন্মেষ হওয়ার কথা মেনে নেয়া সম্ভব হয় না। ফলে এই সব কেবল মাত্র দুর্ঘটনার ফসল, একথা কোন বিবেকবান ব্যক্তিই স্বীকার করতে প্রস্তুত হতে পারে না।

ভারসাম্য ও সুসংবদ্ধতার দলীল

এ পর্যায়ের দলীলটি সর্বাত্মক নিয়ম-শৃঙ্খলা পর্যায়ের দলীলের একটি অংশ বিশেষ। তার অর্থ, সমগ্র প্রাণী ও জীব-জগতে—জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদ লোকে—প্রাধান্য বিস্তারকারী ভারসাম্যতা ও সুসংবদ্ধতা।

প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অধ্যয়ন প্রমাণ করে যে, তার প্রত্যেকটি অপরটির পরিপূরক। প্রাকৃতিক জগতে যদি কেবল প্রাণী-জন্তু-জানোয়ারই থাকত, তাহলে

তা সবই নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যেত। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। অনুরূপভাবে এখানে যদি কেবলমাত্র উদ্ভিদ-ই হতো, তাহলে তা-ও নিঃশেষ হয়ে যেত। কেননা উদ্ভিদ—গাছপালা ও বৃক্ষলতা—সাধারণত কার্বন-ডাই-অক্সাইড (Carbon-di-oxide) অঙ্গারাম্লজান নিষ্কাশন করে ও তদ্দরুন শূন্যলোকে অক্সিজেন ছড়িয়ে পড়ে। গাছের পত্র-পল্লব মানুষের ফুসফুসের (Lung) স্থলাভিষিক্ত। তার প্রধান কাজই হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া ও টানা। পক্ষান্তরে প্রাণীকূল অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বনডাই-অক্সাইড ছাড়ে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই দুই জীব প্রজাতির প্রত্যেকেরই কার্যক্রম অপর প্রজাতির জন্য পরিপূরক। তার অস্তিত্বকে পূর্ণত্বদায়ক এবং এ দুয়ের এক প্রজাতির জীবন অপর প্রজাতির উপর নির্ভরশীল।

অতএব দুনিয়ায় যদি শুধু উদ্ভিদ-ই থাকত, তাহলে কার্বন নিঃশেষ হয়ে যেত, তা ব্যবহার করার কেউ থাকত না। পক্ষান্তরে পৃথিবীতে যদি কেবলমাত্র জীব-জন্তু-ই থাকত, তাহলে অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে যেত, তা গ্রহণ করার কেউ কোথাও থাকত না।

আর তার অর্থ, উভয় প্রজাতিরই চূড়ান্ত ধ্বংস ও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াই হতো অবধারিত। কিন্তু তা বাস্তবে হচ্ছে না, হয়নি। হয়নি বা হচ্ছে না এজন্য যে, সর্বত্র এক ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্য বিরাজমান। এ ভারসাম্য কখনই স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বয়ং উদ্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি—পারে না। তাকে কেউ প্রতিষ্ঠিত করেছে। যিনিই প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনিই আল্লাহ্‌।

প্রাণী জগতে আল্লাহ্‌র হিদায়ত

প্রাণীকুল—জীব-জন্তু-মানুষ ও ইতর প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার পন্থা জানা ও তার স্থায়ী হয়ে বেঁচে থাকা একজন মহা পথপ্রদর্শকের বর্তমানতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে, যার অবস্থান নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক জগতের বাইরে। জীবলোকে তাঁর পথ প্রদর্শন তাদের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। জীবকুলের কল্যাণ ও অকল্যাণের কথা তিনিই জানিয়ে দেন, তার প্রদর্শিত নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমেই তাদের বেঁচে থাকা সম্ভব। কুরআনী পরিভাষায় এই জ্ঞান দান পন্থার নাম হচ্ছে وَحِى ওহী। এই পর্যায়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মানুষের পক্ষে যেসব দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব—যার উপর ভিত্তি করে অতীতের বিভিন্ন যুগে ও সমাজে প্রমাণ করা হয়েছে। উপরে আমরা তারই মৌলিক দিকগুলি তুলে ধরেছি। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا (البقرة: ١٤٨)

প্রত্যেকেরই জন্য এক-একটি দিক রয়েছে, যে দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়।

অর্থাৎ যার পক্ষে যেভাবে সম্ভব, সে সেইভাবেই মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকে।

সত্য স্বীকারকারী (صِدِّيقِين) দের দলীল

এ দলীলের সারকথা হচ্ছে, দুনিয়ায় এমন লোকও রয়েছেন, যাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব ও সত্তার অধ্যয়ন—চিন্তা-গবেষণা করেও স্বতঃই আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ করতে পারে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য নিজেদের সত্তা ছাড়া অন্য কিছুর অধ্যয়ন-বিশ্লেষণের প্রয়োজন-ই মনে করেন না।

এইরূপ অধ্যয়নের ভিত্তি কুরআন মজীদে রয়েছে। অনেকের মতেঃ

أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (حم السجدة: ٥٣)

এই কথা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব্ব সব জিনিসেরই সাক্ষী?

আল্লাহ্‌র এই কথাটি উক্ত রূপ অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণার দিকেই ইঙ্গিত করছে।

কুরআনে যুক্তিভিত্তিক তওহীদ

পূর্বে বলে এসেছি যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের দু'টি পন্থা বা পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে দলীল-প্রমাণ বিশ্লেষণ, আর অপরটি প্রকৃতির পন্থা। এ পর্যায়ে আমরা সে সব বিবেকসম্মত ও বৈজ্ঞানিক দলীলাদির পর্যালোচনা করব, যা কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে।

সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) একটি পৌত্তলিকতা প্রধান সমাজে প্রেরিত হয়েছিলেন। জনগণ মূর্তিপূজা করত, মূর্তির সম্মুখে অবস্থান গ্রহণ করত, যদিও মহান আল্লাহ্‌র প্রতি তারা সাধারণত অবিশ্বাসী ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, এই মূর্তিগুলির পূজা-উপাসনা এজন্য করা উচিত যে, এগুলি তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেবে। এগুলো হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহ্‌র মাঝখানে মাধ্যম ও শাফাআতকারী।

এ কারণে কুরআন মজীদ সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিয়েছে মহান আল্লাহ্‌কে ইবাদাত ও অন্যান্য দিক থেকে সকল প্রকারের 'শরীক' থেকে মুক্ত ও পবিত্র প্রমাণের উপর। ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ্ মোটামুটি অস্বীকৃত ছিলেন না বলে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত ছিল না।

তখনকার সময়ের লোকদের আকীদা কি ছিল, আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস কি রকম ছিল, তা নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ (لقمان: ٢٥)

তুমি যদি ওদের জিজ্ঞাসা কর আসমান যমীন কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে ওরা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ্।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ (الزمر: ٣٨)

তুমি যদি ওদের জিজ্ঞাসা কর আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে ওরা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ্।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ *

(الزخرف: ٩)

তুমি যদি ওদের জিজ্ঞাসা কর আসমান যমীন কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে ওরা নিশ্চয়ই বলবে, ওসব সৃষ্টি করেছেন মহাশক্তিমান সর্বজ্ঞ সত্তা।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ﴿ (الزخرف: ٨٧)

যদি ওদের জিজ্ঞাসা কর ওদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। তাহলে তারা কোন্ দিক দিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে?

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ﴿ (العنكبوت: ٦١)

তুমি যদি ওদের জিজ্ঞাসা কর আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করেছে এবং সূর্য ও চাঁদকে কে নিয়ন্ত্রণাধীন বানিয়ে রেখেছে? তাহলে ওরা অবশ্যই বলবে: আল্লাহ্! তাহলে ওরা কোন দিক থেকে বিভ্রান্ত হচ্ছে?

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ (العنكبوت: ٦٣)

তুমি যদি ওদের জিজ্ঞাসা কর ঊর্ধ্ব লোক থেকে কে পানি বর্ষণ করায়। অতঃপর তার দ্বারা যমীনকে তার মৃত থেকে জীবন্ত করে দেন? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ্।

এ সব আয়াত অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে যে, রাসূলে করীম (স)-এর সময়ের জাহিলী সমাজ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ছিল শুধু তা-ই নয়, উপরন্তু তারা বিশ্বাস করত যে, তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এই বিশ্বলোকের এবং তার মধ্যকার সব কিছুর, তিনিই এর যাবতীয় ব্যাপারের প্রকৃত ব্যবস্থাপক। অর্থাৎ আল্লাহ্র সৃষ্টিকর্তা ও রব্ব হওয়ার ব্যাপারে তারা ছিল তওহীদবাদী। কিন্তু ইবাদতের দিক দিয়ে তারা ছিল মুশরিক। ঠিক এ কারণে রাসূলে করীম (স) ও কুরআন তদানীন্তন জনগণের প্রতি দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে ইবাদতে তওহীদ গ্রহণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রতি ততটা জোর দেয়া হয়নি, তার প্রয়োজন ছিল না বলেই। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, তদানীন্তন মুশরিকরা এক-আল্লাহ্র ইবাদত না করার কারণেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রতি তারা কিছুমাত্র অবিশ্বাসী ছিল না। তারা মূর্তিপূজা করলেও তারা কখনই এই বিশ্বাস করত না যে, এই মূর্তিগুলিই আসমান-যমীনের স্রষ্টা, এ ভূ-মণ্ডলের ও সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। (এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল না, তা বলা হচ্ছে না) বরং তারা মনে করত, এই মূর্তিগুলির পূজা-উপাসনা করলে প্রকারান্তরে আল্লাহ্রই

পূজা-উপাসনার কাজ করা হবে, তাঁর নিকটবর্তী হওয়া যাবে এবং এগুলিই তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট উত্তীর্ণ করবে। এ পর্যায়ের আয়াতসমূহ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ (يونس: ١٨)

ওরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ইবাদত করে এমন সব জিনিসের, যা ওদের ক্ষতি করে না যেমন, তেমন ওদের ফায়দাও দেয় না কিছু। ওরা বলে, এইগুলি হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট ওদের শাফা'আতকারী।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى۔ (الزمر: ٣)

আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যারা অন্যান্য অভিভাবক-পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে, ওদের সম্পর্কে ওদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা ওদের ইবাদত করি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, ওরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র অতি নৈকট্যে পৌঁছিয়ে দেবে।

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ؟ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ* (الزمر: ٤٣)

ওরা কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে বহু সংখ্যক শাফ'আতকারী বানিয়ে নিয়েছে? বল, ওরা যদি কোন কিছুর মালিক না-ও হয় এবং বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী না-ও হয়, তবুও...? অর্থাৎ তবু ওরা শাফা'আত করতে পারবে বলে কি ওরা মনে করে?

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاؤُا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ* (الانعام: ٩٤)

(এবং আল্লাহ্ বলবেনঃ) নাও, এখন তোমরা ঠিক তেমনিভাবে একাকীই আমাদের সম্মুখে হাযির হয়েছ যেমন আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার

একাকীই সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে আমরা দুনিয়ায় যা কিছু দিয়েছিলাম, তা সবই তোমরা পিছনে রেখে এসেছ। এখন আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের সেই শাফা'আতকারীদেরকেও তো দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করছিলে যে, তোমাদের কার্যোদ্ধারের ব্যাপারে তাদেরও অংশ রয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে বিলীন হয়ে গেছে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলে করীম (স)-এর যুগে নাস্তিক লোক ছিল না কিংবা কুরআন মূলত আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের পর্যায়ে কোন কথা বলেনি—এমন কথা কেউই বলতে পারবে না। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, রাসূলের যুগেও যে নাস্তিক—আল্লাহ্তে অবিশ্বাসী—লোক ছিল, তা কুরআনের কোন কোন আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। এই কারণে কুরআনে আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণের উল্লেখ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

আমরা এখানে এই উভয় পর্যায়ের আয়াতসমূহের উল্লেখ করছিঃ

وَقَالُوْا مَاهِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَايُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ-(الجاثية: ٢٤)

এই লোকেরা বলেঃ জীবন তো শুধু আমাদের এই দুনিয়ারই জীবন। এখানেই আমরা মরি, এখানেই আমরা বাঁচি। আর কালের আবর্তন ছাড়া আমাদেরকে আর কেউ-ই ধ্বংস করে না। আসল কথা এই যে, এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান-ই নেই। নিছক ধারণা-অনুমানের উপর ভিত্তি করেই ওরা এই সব কথা বলে।

মানুষের ধ্বংসের একমাত্র কারণ কালের আবর্তন, ওদের এই বিশ্বাস ছিল শুধু এই কারণে যে, ওরা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী ছিল না, যিনি তাদের জীবন দিয়েছেন ও মৃত্যু দিবেন। ওদের বিশ্বাস ছিল, জীবন ও মৃত্যু—এ দুটি বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র। 'বস্তু'র রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে জীবন এবং তার বিশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে মৃত্যু সংঘটিত হয়।

কুরআনে আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের পক্ষেও যে কথা বলা হয়েছে, উক্ত আয়াতটি-ই তার প্রমাণ। কেননা এরূপ ধারণা-বিশ্বাসের লোক নবী করীম (স)-এর যুগে আরব দেশে ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় যে, কুরআনে নিশ্চয়ই তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলা হয়েছে। আমরা পর্যায়ক্রমে সেসব আয়াত উদ্ধৃত করব।

যুক্তিভিত্তিক তওহীদ

প্রথম দলীল

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ* اِنْ يَّشَا يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ* وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ*

(فاطر: ١٥-١٧)

হে লোকেরা! তোমরাই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ্ তো সর্বাধিকারী (মুখাপেক্ষীহীন) ও সর্বপ্রশংসিত। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করে নতুন কোন সৃষ্টি তোমাদের স্থানে নিয়ে আসবেন। আর এরূপ করা আল্লাহ্‌র জন্য কিছুমাত্র কঠিন নয়।

কোন জিনিস যদি অপর এমন কোন জিনিসের প্রতি মুখাপেক্ষী হয় যা সর্বশক্তিমান, সর্বাধিকারী ও অন্য নিরপেক্ষ, যা সেই প্রথম জিনিসের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে, দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা মুছে ফেলে। এই প্রথম জিনিসের অভাব ও দারিদ্র্য দূর-ই হয় না যতক্ষণ না এই দ্বিতীয় জিনিস তার অভাব পূরণ করে। তাহলে বুঝতেই হবে, সেই প্রথম জিনিস ক্ষণস্থায়ী, আর দ্বিতীয় জিনিস স্থায়ী। উক্ত আয়াতে মানুষকে প্রথম জিনিসের স্থানে এবং আল্লাহ্‌কে দ্বিতীয় জিনিসের স্থানে মনে করলেই আয়াতটির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। অর্থাৎ মানুষ মুখাপেক্ষী এমন এক সত্তার, যিনি আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নয়। তাই ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের অস্তিত্বই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ। কেননা আল্লাহ্ না থাকলে এখানে মানুষ এলো কেমন করে?

শুধু তাই নয়। এই বিশ্বলোক সামষ্টিকভাবে এবং আলাদা-আলাদাভাবে এর প্রতিটি 'অণু-পরমাণু' স্বতঃই মুখাপেক্ষী, পরনির্ভরশীল। এর কোন একটিরও অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না, পরে হয়েছে। এই অস্তিত্ব লাভ তার নিজের সাধ্যে কুলায়নি, কেউ অবশ্যই আছেন যিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং যাকে অন্য কেউ অস্তিত্ব দেয়নি, যিনি স্বীয় অস্তিত্বের জন্য অন্য কারোর প্রতি মুখাপেক্ষী বা কারোর অনুগ্রহের উপর আদৌ নির্ভরশীল নন। কেননা যা নিজ অস্তিত্বের জন্য অপরের মুখাপেক্ষী, তার পক্ষে অন্য কাউকে অস্তিত্বদান করা সম্ভব নয়, তা কল্পনাও করা যায় না। যা স্বতঃই মুখাপেক্ষী—স্বতঃই

মুখাপেক্ষীহীন কোন সত্তার প্রতি, তা নিজে স্বতঃই মুখাপেক্ষী বলে অনুরূপ কোন মুখাপেক্ষী সত্তার মৌলিক অস্তিত্বদান করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হবে, এটা তো বৈজ্ঞানিক সত্য। অনুরূপভাবে এই মুখাপেক্ষী জিনিসের মুখাপেক্ষীহীন জিনিসের প্রতি মুখাপেক্ষীতা চিরন্তন ও শাশ্বত হওয়াই স্বাভাবিক। এই মুখাপেক্ষীতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে সেই মুখাপেক্ষী জিনিসের অস্তিত্বই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এই পর্যায়ে দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

১. আমরা কল্পনা করছি বিপুল সংখ্যক ও বহুবিধ প্রকারের আলোক মালায় শুভ্র-সমুজ্জ্বল একটি প্রাসাদ। স্থূল দর্শী তা দেখে মনে করবে, এই আলো প্রাসাদটির অভ্যন্তর থেকে স্বতঃই উৎসারিত। কিন্তু সে যখন একটু গভীরভাবে খোঁজ-খবর নেবে, তখন জানতে পারবে যে, এই প্রাসাদের সমস্ত আলো বিদ্যুৎ উৎপাদ কেন্দ্র থেকেই পরিবেশিত। সেই কেন্দ্রের সাথে প্রাসাদটির বৈদ্যুতিক তারযোগে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে এমনভাবে যে, সে সম্পর্ক ছিন্ন হলে মুহূর্তের তরেই প্রাসাদটি নিঃসীম অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। কাজেই প্রসাদটিকে আলোকোদ্ভাসিত রাখার জন্য এই সম্পর্কটি সর্বক্ষণ দৃঢ় ও মজবুত করে রাখা একান্তই অপরিহার্য।

২. একটি শুষ্ক বালুকাময় ভূমিখণ্ড সূর্যের খর তাপে খাঁ খাঁ করছে। আমরা চাচ্ছি, ভূমি খণ্ডটি সর্বক্ষণ সিক্ত থাক, যেন তার উর্বরতা জেগে উঠে। এরূপ অবস্থায় তাতে পানির স্রোত এমনভাবে আসা প্রয়োজন যে, তা যেন কখনই শুকিয়ে না যায়। তবেই তার শুষ্কতা প্রতিরুদ্ধ ও সিক্ততা অব্যাহত থাকতে পারবে। অন্যথায় সূর্যতাপে তা শুকিয়ে খাঁ খাঁ করতে শুরু করবে।

এ দুটি দৃষ্টান্ত স্পষ্ট করে তুলে ধরে যে, যা স্বতঃই অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী, সেই অন্যই তার অস্তিত্বের মৌল কারণ। অতএব তার সাথে সে জিনিসের সম্পর্ক চিরন্তন অক্ষুণ্ন ও অব্যাহতভাবে থাকা একান্তই অপরিহার্য। এই মুখাপেক্ষীতা যতক্ষণ স্বতঃস্ফূর্ত থাকবে, ততক্ষণ সেই মৌল কারণের অবস্থিতিও অব্যাহত থাকা আবশ্যক।

এই দৃষ্টান্তদ্বয়ের আলোকে বলা যায়, উক্ত আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, সমস্ত মানুষই বিশ্ব প্রকৃতি ও তার সব কিছু স্বভাবতই মুখাপেক্ষী, অন্য-নির্ভর। তা অস্তিত্বহীন থাকবে যতক্ষণ তার অস্তিত্বের কারণ প্রবল ও প্রচুরভাবে বর্তমান না হবে।

এ যুক্তিতেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় এক সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব। এ জগত—এ জগতের সব কিছুই আছে। কিন্তু আছে নিজ শক্তি বলে নয়।

কেননা এর কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বতঃস্ফূর্ত সত্তার অধিকারী নয়। তবু তা যখন আছে, তখন বুঝতেই হবে যে, তা আছে এ জন্য যে, সৃষ্টিকর্তা সে সবকে অস্তিত্বমান করে রেখেছেন। প্রথমোক্ত আয়াতটিতে এই কথাই বলা হয়েছে। আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছে, মানুষ স্বতঃই পরমুখাপেক্ষী, অন্য নির্ভর। তাকে অস্তিত্বদানকারী সর্বাধিকারী আল্লাহ্ আছেন এবং তাকে অস্তিত্ব দিয়েছেন বলেই মানুষের পক্ষে অস্তিত্বমান হয়ে থাকা সম্ভবপর হচ্ছে। আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মানুষের এই মুখাপেক্ষীতা ও পর-নির্ভরতা কেবলমাত্র আল্লাহ্র প্রতি। অতএব আল্লাহ্র অস্তিত্ব তার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ্র সদা অস্তিত্বমান থাকা ছাড়া মানুষের মত পরনির্ভর—অন্য মুখাপেক্ষী একটি সত্তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে কল্পনাতীত। মানুষ তার সৃষ্টি হওয়া বা অস্তিত্ব লাভের পূর্বে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী, আয়াতে শুধু এতটুকুই বলা হয়নি। সৃষ্ট হওয়া ও অস্তিত্ব লাভের পরও প্রতিটি মুহূর্তই মানুষ আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী, আল্লাহ্ নির্ভর, তাই আল্লাহ্র অস্তিত্ব চিরন্তন ও শাশ্বত। এইজন্য কুরআনে الغنى মুখাপেক্ষীহীনতা আল্লাহ্র এক শাশ্বত গুণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى (النجم: ٤٨)

এবং তিনি-ই (আল্লাহ্ মানুষকে) ধনী আত্মনির্ভর বানিয়েছেন ও বিষয় সম্পত্তি দিয়েছেন।

হযরত মূসা (আ) নিজেকে সব সময়ই মুখাপেক্ষী মনে করেছেন সেই জিনিসের, যা তাঁর রব্ব তাঁকে দান করেছেন, যা নাজিল করেছেন ও করবেন। তাঁর অস্তিত্বও এই পর্যায়ের। বলেছেনঃ

رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ (القصص: ٢٤)

বললে, হে পরওয়ারদিগার! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণই নাযিল করেছ, আমি সতত তারই মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ্ নিজেই নিজেকে কুরআনের উনিশটি আয়াতে غنى বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি আয়াতঃ

وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ (محمد: ٣٨)

আল্লাহ্-ই পরমুখাপেক্ষীহীন। আর—হে মানুষ তোমরা সকলেই মুখাপেক্ষী। মানুষের মুখাপেক্ষীতাই প্রমাণ করছে যে, মুখাপেক্ষীহীন আল্লাহ্ রয়েছেন।

দ্বিতীয় দলীল

অবনমন (Declination) ও অস্তগমন প্রমাণ করে একজন অবনমনকারী ও অস্তদানকারী সত্তার অস্তিত্ব। এ পর্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত আয়াত অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকাট্যঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِىٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ* فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ* فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ* فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَآ اَكْبَرُ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ*

(الانعام: ৭৫-৭৮)

ইবরাহীমকে আমরা এমনিভাবেই যমীন-আসমানের সাম্রাজ্য ব্যবস্থা দেখাচ্ছিলাম এবং দেখাচ্ছিলাম এ জন্যই যে, সে যেন নিঃসন্দেহে দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের একজন হতে পারে। পরে যখন তার উপর রাত আচ্ছন্ন হয়ে এল তখন একটি তারকা দেখতে পেল। বললঃ এটি খোদা? কিন্তু পরে যখন তা অবনমিত-অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বললঃ অবনমিত-অদৃশ্য হয়ে যাওয়া জিনিসের প্রতি আমি কিছুমাত্র অনুরাগী নই।

পরে যখন জ্বল জ্বল করা চাঁদ দেখতে পেল, বললঃ এটি রব্ব? কিন্তু সেটিও যখন অদৃশ্য-অবনমিত হয়ে গেল, তখন সে বললঃ আমার রব্ব-ই যদি আমাকে পথ না দেখান তাহলে আমি ভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব।

অতঃপর সে যখন সূর্যকে দেদীপ্যমান দেখতে পেল, তখন বললঃ এটি রব্ব? এটা তো বেশ বড়! কিন্তু সেটিও যখন অস্তমিত হলো তখন সে চীৎকার করে বলে উঠলঃ হে জনগণ! তোমরা যেসবকে এক আল্লাহ্‌র শরীক বানাচ্ছ, সেসব থেকে আমি সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক (অর্থাৎ সে সবকে আমি রব্ব মানতে রাযী নই। কেননা সেই সবই অবনমনশীল।)

উদ্ধৃত আয়াতসমূহের প্রথমটি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, বিশ্বলোক পরিচালনায় আল্লাহ্‌র নিজস্ব নিগূঢ় ব্যবস্থাপনার রহস্য ইবরাহীম (আ)-এর সম্মুখে উদঘাটনের লক্ষ্যে আকাশমার্গীয় তিনটি অবয়বের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

করিয়েছিলেন। তাঁর সম্মুখে তারকা, চাঁদ ও সূর্য্যের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বা অস্তগমনের দৃশ্য দেখিয়ে তদানীন্তন সমাজের লোকদের ধারণা ও বিশ্বাসের অন্তসারশূন্যতা স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। দেখিয়েছিলেন যে, লোকেরা যে তারকা, চাঁদ ও সূর্য—এই তিনটি আকাশমার্গীয় উজ্জ্বল অবয়বের পূজা করে মনে করে যে, বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় এ তিনটির কর্তৃত্ব রয়েছে, তা সম্পুর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা এগুলি তো কিছুমাত্র স্থিতিশীল নয়। এগুলির অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আর এ সব অবয়বের অবস্থানে পরিবর্তন সৃষ্টির নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্ন-অপ্রকাশ্য 'কারণ' রয়েছে। এগুলি সেই প্রচ্ছন্ন কারণ-এর অধীন, যাঁর আরোপিত নিয়মতন্ত্র অবচেতনভাবে হলেও মেনে চলতে এগুলি একান্তভাবে বাধ্য। অতএব এগুলি বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতই চিত্তাকর্ষক ও মোহাবেশ সৃষ্টিকারী হোক, আসল কর্তৃত্ব এর কোনটিরই নেই। তাই আসল বিশ্ব কর্তৃত্ব যাঁর নিকট নিবদ্ধ, যিনি দৃশ্যমান নন, তিনিই বিশ্বলোক পরিচালক, তিনিই মা'বুদ এবং তিনিই একমাত্র রব্ব। মানবকুলের কর্তব্য, এই দৃশমান অবয়বসমূহের প্রতি অনুরাগী না হয়ে সেই আসল কর্তৃত্বের অধিকারীর প্রতি অনুরাগী হওয়া, তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পিত হওয়া এবং কেবল তাঁরই ইবাদত করা।

উপরোক্ত আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে মনে হয়, ইবরাহীম (আ) তারকাটির অবনমনের পর-ই চন্দ্রোদয় দেখতে পেয়েছিলেন। আর চন্দ্রের প্রচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার পর-ই লক্ষ্য করছিলেন দিগন্ত উজ্জ্বলকারী সূর্যোদয়ের ঘটনা। এতে করে মনে হচ্ছে, সে তারকাটি ছিল 'শুকতারা' (Venus الزهرة)। কেননা এ তারকাটির কক্ষপথ সংকীর্ণ বিধায় তা সূর্য থেকে ৪৭ ডিগ্রীর বেশী দূরে যেতে পারে না। ফলে সেটি সূর্যের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থাকে সব সময়। সেটি সূর্যোদয়ের পূর্বে আকাশে ভেসে উঠে; কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, সূর্যোদয়ের পর-পরই সেটি অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশে প্রকাশিত হয়; খুব দ্রুত দিগন্ত থেকে সরে পড়ে। ফলে শুকতারাটির অস্তগমন চন্দ্রোদয়ের সাথে সাথে ঘটে মাসের ১৭, ১৮ ও ১৯ তারিখের রাত্রে। ঐতিহাসিকভাবে একথা প্রমাণিত যে, তদানীন্তন ইরাকের 'সাবেয়ী' সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল এবং তারা সপ্ত নক্ষত্রকে পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনার ও প্রপঞ্চের ব্যবস্থাপক বলে বিশ্বাস করত। শুকতারা এই সাতটির মধ্যেই গণ্য। এগুলিকে তারা খুব সম্মান শ্রদ্ধা করত। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রদর্শিত প্রপঞ্চ প্রমাণ করল যে, মূলত এগুলির কেথাও কোন কর্তৃত্ব নেই, এগুলিই বরং অপর মহা শক্তিমান বিশ্ব ব্যবস্থাপকের নিয়ন্ত্রণের অধীন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়েরও লোকগুলি বিশ্ব-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শিরকী আকীদায় নিমজ্জিত ছিল। ইবরাহীম (আ) তাদের এই শিরকী আকীদাকে নির্মূল করে

তওহীদে বিশ্বাসী বানাতে চেয়েছিলেন, দাওয়াত দিয়েছিলেন বিশ্ব-ব্যবস্থাপকের এককত্বের বিশ্বাসী হওয়ার জন্য। এই কারণেই উক্ত আয়াতসমূহের শেষ পর্যায়ে হযরত ইবরাহীম (আ) ঘোষণা করলেনঃ

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ* (الانعام: ٧٩)

আমি তো নিশ্চিতভাবে একমুখী হয়ে নিজের গোটা সত্তার লক্ষ্য নিবদ্ধ করছি সেই মহান সত্তার উদ্দেশ্যে, যিনি সমগ্র আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করে, নিয়মাধীন চালু করেছেন। আর আমি শির্ককারীদের মধ্যে শামিল নই।

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর এই উদাত্ত ঘোষণা দ্বারা তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত সমস্ত শির্কী কাজ-কর্ম থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক করে নিয়ে স্বীয় তওহীদী ঈমানকে অত্যন্ত প্রবলভাবে ও দৃপ্ত কণ্ঠে উপস্থাপিত করলেন।

তৃতীয় দলীল

আসমান-যমীনের সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ।

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ*

(ابراهيم: ١٠)

নবী-রাসূলগণ বলল, আল্লাহ্ সম্পর্কে সন্দেহ আছে কি? যিনি আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহবান করছেন তোমাদের গুনাহ মাফ করার ও তোমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার উদ্দেশ্যে। তারা জবাব দিল, তোমরা তো আমাদের মত লোক ছাড়া আর কিছু নও। তোমরা আমাদের সেই সব মা'বুদের ইবাদত করা থেকে বিরত রাখতে চাও, যাদের ইবাদত করত আমাদের বাপ-দাদারা। যদি তা-ই হয়, তাহলে সেজন্য তোমরা কোন অকাট্য দলীল পেশ কর।

এ আয়াতটির বক্তব্যের ধরণ হচ্ছে প্রশ্নবোধক। আর তা হলো, আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ?... তা কোন যুক্তিসঙ্গত ও বিবেকসম্মত কথা নয়। কেননা আসমান-যমীন—যা এখন মওজুদ রয়েছে, একটা সময় ছিল, যখন এর কিছুই ছিল না। তাহলে যা এই 'ছিল না' জিনিস তা কি করে 'বর্তমান আছে' হয়ে গেল?... অনস্তিত্ব থেকে কি করে অস্তিত্বের মধ্যে এসে গেল?... নিশ্চয়ই অস্তিত্বদানকারী কোন মহা শক্তিশালী সত্তা রয়েছে। এইগুলিকে অস্তিত্বমান বানাবার যাঁর নিজস্ব ক্ষমতা ও কুদরত রয়েছে। অন্য কথায় আসমান-যমীনের বর্তমান অস্তিত্ব অস্তিত্বদানকারী—সৃষ্টিকারীর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ। এ ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ের একবিন্দু অবকাশ থাকতে পারে না। থাকলে তা কখনই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। এ হচ্ছে সৃষ্টি থেকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের পদ্ধতিতে পেশ করা দলীল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একেই বলে INFERENCE.

উদ্ধৃত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতটিকে বলা হয়েছেঃ "তোমাদের পূর্বেকার নূহ-এর জনগণ ও আ'দ ও সামূদ লোকদের খবর কি তোমাদের নিকট পৌছায় নাই'? এ থেকে বোঝা যায়, উপরোদ্ধৃত আয়াতে যেসব নবী-রাসূলের কথা বলা হয়েছে, তাঁরা যেসব জনসমষ্টির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা সকলেই আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা রূপেই বিশ্বাস করত; কিন্তু মূর্তি পূজা করত এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, ওগুলি শাফা'আতকারী, আল্লাহ্র বা অন্যান্য সিল্সিলার নৈকট্য দানকারী। উক্ত আয়াতে এই শির্কেরই প্রতিবাদ করা হয়েছে, শির্কের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়েছে। উক্ত নবী-রাসূলগণ ইবাদাতে তওহীদেরই আহবান দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু সেই লোকদের জবাব ছিলঃ

إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ وَإِنَّا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ*

(ابراهيم: ٩)

তোমরা যে দাওয়াত সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা অমান্য করছি। তোমরা আমাদেরকে যেদিকে দাওয়াত দিচ্ছ, সে বিষয়ে আমরা কঠিন সংশয়ে নিমজ্জিত।

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের দুটি অংশঃ

১. এক আল্লাহ্র ইবাদত।

২. মূর্তি ইত্যাদির ইবাদত পরিহার।

উক্ত জনগোষ্ঠীগুলি হয় এই দাওয়াতের দুটি অংশই—অন্তত তার একটি অংশ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। এ কারণে আল্লাহ্‌র আসমান যমীন স্রষ্টা হওয়ার ব্যাপারটি পেশ করে উভয় অংশের সত্যতার অকাট্য দলীল পেশ করেছেন। বলেছেনঃ 'আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সন্দেহ?' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট, অকাট্য। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে আসমান-যমীনের সৃষ্টি। সেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতি সংশয় কেমন করে সম্ভব হতে পারে? আল্লাহ্-ই যদি না থাকতেন, তাহলে এই আসমান-যমীন থাকত না। আর আসমান-যমীন যখন বিরাজমান, তখন অনিবার্য ভাবে আল্লাহ্‌ও আছেন বলে নিঃসন্দেহে মেনে নিতে হবে।

এভাবে দাওয়াতের দুটি অংশের সত্যতা প্রমাণ করা সহজতর হয়েছে এই রূপেঃ

১. বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক মা'বুদ আছেন বলে যখন তোমরা বিশ্বাস কর,—যখন তোমরা মান যে, তোমাদের দেহ ও প্রাণের স্রষ্টা আছেন; তখন তাঁর ইবাদত করা—কেবল তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পিত হওয়া অতি উত্তমভাবে তোমাদের কর্তব্য।

এ কারণেই কথার শেষভাগে বলা হয়েছেঃ

يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ

তোমাদেরকে তিনি আহবান করেছেন তোমাদের কোন কোন গুনাহ মাফ করে দিবেন বলে।

২. তোমরা নিজেরাই যখন এক ইলাহ্‌র অস্তিত্ব থাকার কথা বিশ্বাস কর, তখন তোমরা এই মূর্তিগুলির পূজা কর কেন, ওগুলি তো এই সৃষ্টি লোকেরই অংশ? এগুলি তো দুনিয়ার অন্যান্য অক্ষরহীন জিনিসগুলির মতই, তা থেকে ভিন্নতর কিছুই নয়। ফলে এগুলির ইবাদত করার কোনই অর্থ হয় না, তার ফলও কিছুই নেই। বরং তোমাদের উচিত সেই মা'বুদের ইবাদত করা, যিনি যাবতীয় নিয়ামতের মূল দাতা, দয়া ও অনুগ্রহদানকারী, যিনি নিজে সৃষ্ট নন, নন কারোর-ই মালিকানাধীন।[১]

অন্যথায় আল্লাহ্‌র আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা হওয়াই প্রমাণ করে যে, ইবাদত কেবলমাত্র তাঁরই হতে হবে। তাঁকে ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত হতেই পারে না।

১. تفسير الامام الرازى ج ٥ ص ٢٢٩ : طبعة عام ٢٠٨

সে সব জনগোষ্ঠীর মন-মানসিকতা এই ছিল যে যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই ব্যবস্থাপক। ফলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্তা প্রমাণিত হওয়ার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে, তাঁর ব্যবস্থাপক পরিচালক-নিয়ন্ত্রক হওয়াও। আর তিনি ছাড়া ব্যবস্থাপক-পরিচালক নিয়ন্ত্রক অন্য কেউ নয়, তখন সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি কেবলমাত্র তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। আর এই কারণে ইবাদত কেবল তাঁরই হতে হবে। তিনি ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। কেননা সেই অন্যরা তো কোন কল্যাণেরই মালিক নয়, কোন কর্তৃত্বই তাদের হাতে নেই।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দলীল

১. কারণ ছাড়া কার্য অসম্ভব, ২. কোন জিনিসের পক্ষে নিজেকে সৃষ্টি করা অসম্ভব, ৩. আসমান-যমীনের অস্তিত্ব স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ—

এই পর্যায়ে কয়েকটি আয়াতঃ

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَٰلِقُونَ* (الطور: ٣٥)

ওরা কি কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে? কিংবা ওরা নিজেরাই স্রষ্টা?

أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَّا يُوقِنُونَ * (الطور: ٣٦)

অথবা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ওরা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে? ... আসল কথা হলো, ওরা কোন কথায়ই প্রত্যয়শীল নয়।

أَمْ لَهُمْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * (الطور: ٤٣)

কিংবা আল্লাহ্‌ ছাড়া ওদের অন্য ইলাহ্‌ রয়েছে? ... ... মহান আল্লাহ্‌ তাদের কৃত সমস্ত শির্‌ক থেকে অতীব পবিত্র ও মুক্ত।

রাসূলে করীম (স)-এর দাওয়াত তিনটি মৌল নীতিতে সমন্বিত। তা হচ্ছেঃ

১. পরকাল বিশ্বাস।
২. তাঁর নবুয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস।
৩. ব্যাপক অর্থে তওহীদ বিশ্বাস—সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সহ এর প্রতি দাওয়াত।

সূরা 'আত-তুর'-এ অভিনব ভঙ্গীতে এ তিনটি পর্যায়ের দাওয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ সূরার ১—২৮ পর্যন্তকার আয়াতসমূহে পরকাল ও কিয়ামতের দিনের পুনরুত্থানের বিষয় ও তার প্রাসঙ্গিক কথা আলোচিত হয়েছে। ২৯-৩৪ পর্যন্তকার আয়াতসমূহে রাসূলে করীম (স)-এর নবুয়্যাতের প্রতি দাওয়াত। এখানে আলোচিত আয়াতসমূহে এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বিষয়টিও শামিল রয়েছে।[১] কুরআন মজীদ মানুষকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস গ্রহণের আহ্‌বান জানিয়েছে। এ সব আয়াতে প্রশ্ন তোলা হয়েছেঃ

১. মানব সমাজ কি কোন 'কারণ' علـة ছাড়া-ই অস্তিত্ব লাভ করেছে? (এ কারণ বস্তুগত হোক—যেমনঃ পিতা, মাতা, বংশ উৎপন্নকারী কোষ; কিংবা বস্তু অতীত কোন কারণ হোক—যেমন মহান আল্লাহ্) ... অর্থাৎ তা কি হঠাৎ করে ঘটনাবশতই হয়ে গেছে, অথবা নিজে-নিজেই হয়ে গেছে? এ প্রশ্নটি নিহিত রয়েছে এ আয়াতটিতেঃ 'কোন জিনিস (সৃষ্টিকর্তা) ছাড়া-ই কি ওরা সৃষ্ট হয়েছে?

২. ওরা 'নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? ... নিজের অস্তিত্বদানকারী নিজে? এই কথাটি নিহিত রয়েছে এ আয়াতেঃ 'কিংবা ওরা নিজেরাই স্রষ্টা'?

৩. যদি ধরে নেয়া হয় যে, ওরা নিজেরাই সৃষ্টা, তবুও এই প্রশ্ন থেকে যায়ঃ তাহলে 'এই আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করল?' ওরা এই আসমান-যমীনও সৃষ্টি করেছে, এমন কথা বলা কি সম্ভব? এই প্রশ্নটি রয়েছে এ আয়াতেঃ

অথবা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী তারা সৃষ্টি করেছে?

আল্লাহ্‌কে বাদ দিলে এ কয়টিরই সম্ভাবনা থাকে। এর অতিরিক্ত বা অন্য কিছু চিন্তা করা যায় না। এ কয়টি দিক দেখানো হয়েছে মানুষের চিন্তা-বিবেচনার জন্য, যেন মানুষ এক আল্লাহ্‌র দিকের সন্ধান পেতে পারে।

এক্ষণে এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের দৃঢ় প্রত্যয় আবশ্যক, আবশ্যক তাঁর সম্মুখে বন্দেগীর বাধ্যবাধকতা গ্রহণ। কেননা সম্ভাবনার তিনটি দিকই সম্পূর্ণরূপে বাতিল। বাতিল এইজন্য যে, কারণ ছাড়া কার্য হতে পারে না, এটা তো অতি সাধারণ বোধ্য কথা। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি প্রপঞ্চই যদি নিজের উদ্ভাবক নিজে হয়, তাহলে সেই প্রথম সম্ভাবনা দেখা দেয়, যা পূর্বেই বাতিল বলে ঘোষিত। আর তৃতীয়ত কোন জিনিস যদি স্বতঃই উৎসারিত হয়, তাহলে তা নব-উদ্ভূত (حادث) নয়, তা চিরন্তন ও শাশ্বত। অথচ নাস্তিকরাও স্বীকার করেছে যে, মানুষ ও অন্যান্য বস্তুর সবগুলিই নব-উদ্ভাবিত, পূর্বে ছিল না, পরে হয়েছে। কাজেই এর কোনটির শাশ্বত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ কথা কে অস্বীকার

১. تفسير الامام الرازى ٢٨ ص ٢٥٩

করবে যে, আসমান-যমীন মানুষের জন্য ও মানুষের অস্তিত্বেরও পূর্বে সৃষ্ট। ফলে মানুষ তার কোনটিরই স্রষ্টা হতে পারে না। তাহলে স্রষ্টা হবেন তিনিই, যিনি মানুষেরও স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ্। আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকারকারীরা কি দাবি করে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করেছেন; কিংবা তারা হঠাৎ করে ঘটনাক্রমে সৃষ্ট হয়েছে কোন 'কারণ' ছাড়াই? এর কোন একটি কথাও স্বীকৃতব্য নয়। অতএব এক আল্লাহ্র অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে প্রমাণিত ও স্বীকৃতব্য।

সপ্তম ও অষ্টম দলীল

মানবীয় কোষের বিস্ময়কর সংযোজন—উদ্ভিদ উদ্‌গম হওয়া ও বৃষ্টিপাত—বৃক্ষাদির সৃষ্টি স্রষ্টার অকাট্য প্রমাণ—

এই পর্যায়ের আয়াতসমূহঃ

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ* نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُوْنَ* اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ* ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ* (الواقعة: ٥٦-٥٩)

এটাই হবে (সেই বাম বাহুর লোকদের) আতিথ্যের জন্য নির্দিষ্ট সামগ্রী প্রতিফল দানের দিনে। আমরাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তোমরা এর সত্যতা স্বীকার কর না কেন? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করেছ, তোমরা যে শুক্রকীট নিক্ষেপ কর, তা থেকে তোমরা সন্তান সৃষ্টি কর না তার সৃষ্টিকর্তা আমরা?

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ * ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ* لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ* (الواقعة: ٦٣-٦٥)

তোমরা কি কখনও চিন্তা-বিবেচনা করে দেখেছ, তোমরা এই যে বীজ বপন কর, তা থেকে তোমরাই কি ফসল উৎপাদন কর কিংবা তার উৎপাদনকারী আমরা? আমরা চাইলে ফসলকে ভূষি বানিয়ে ফেলতে পারি। আর তোমরা শুধু গাল-গল্প করেই বসে থাকবে।

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ* ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ* لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ* اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ

تُورُونَ * ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ*

(الواقعة:٦٨-٧٢)

তোমরা কি কখনও চক্ষু মেলে দেখেছ, এই যে পানি, যা তোমরা পান কর, তা মেঘমালা থেকে তোমরা বর্ষণ করিয়েছ কিংবা তার বর্ষণকারী আমরা? আমরা চাইলে তাকে তীব্র লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারি। তাহলে তোমরা শোকর করবে না কেন?

তোমর কি কখনও চিন্তা-বিবেচনা করে দেখেছ, এই যে আগুন, যা তোমরা জ্বালাও, তার জ্বালানি কাষ্ঠ তোমরা বানিয়েছ, না তার সৃষ্টিকর্তা আমরা?

এই সব কয়টি প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার না করে কোন উপায়ই থাকতে পারে না, তাই শেষে প্রশ্ন তোলা হয়েছেঃ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ* (الواقعة: ٧٤)

অতএব হে নবী! তোমার বিরাট মহান রব্ব-এর নামে তসবীহ করতে থাক।

১. উদ্ধৃত আয়াতসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে পরকালে বিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত, এই বিশ্বাস সৃষ্টি যে, কিয়ামতের দিন যেহেতু মানুষকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে আল্লাহ্‌র সমীপে হাযির হতে হবে, তাই এ দুনিয়ার জীবনে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করাই কর্তব্য।

তবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতিও প্রসঙ্গত ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যেসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তার মূল লক্ষ্য পরকাল অবশ্যই হবে তা প্রমাণ করা। এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের কথা আনুসঙ্গিকভাবে বলা যেমন উপরোক্ত শেষ আয়াতটিতে বলছে।

সূরা 'ওয়াকিয়া' ও সূরা 'তুর'-এ এ কথাসমূহের ধরন রাখা হয়েছে প্রশ্নবোধক। প্রশ্নগুলি মানুষের প্রতি এবং মানুষের মধ্যে গভীর চিন্তা-বিবেচনা জাগ্রত করাই এর উদ্দেশ্য। যেন মানুষ স্বতঃই হক্ ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে—হক্‌কে গ্রহণ ও বাতিলকে বর্জন করতে সক্ষম হয়। প্রকৃত 'হক' এড়িয়ে চলা বা অস্বীকার করা যেন তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠে।

২. উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহে চারটি পর্যায় উপস্থাপিত করা হয়েছেঃ

ক. মানবীয় কোষ সংযোজন ও সংগঠন এবং তার বিস্ময়কর সৃষ্টি।

খ. উদ্ভিদকুলের ক্রম বৃদ্ধি (Growth) এবং বিপদ-আপদ থেকে তাকে রক্ষা করা।

গ. বৃষ্টি বর্ষণ এবং তাকে নোংরা-ময়লা যুক্ত হওয়া, দুর্গন্ধময় হওয়া ও লবণাক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা।

ঘ. বৃক্ষ থেকে আগুন বের করা, আগুন জ্বালানো।

আর আসলে উক্ত আয়াতসমূহের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহ্‌র এ তিনটি বড় বড় নিয়ামতঃ খাদ্যবস্তু, পানি ও অগ্নি। এ তিনটি জিনিসই মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য। এর কোন একটি না হলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

৩. এ আয়াতসমূহে যুক্তি প্রয়োগের কৌশল হচ্ছে আরোহী পদ্ধতি—সৃষ্টি—মানবীয় শুক্রকীট সৃষ্টি, উদ্ভিদের সংরক্ষণ ও লালন, বৃষ্টির বর্ষণ ও বৃক্ষ সৃষ্টি—অস্তিত্ব প্রমাণের ভিত্তিতে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ।

এ সব প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ রূপায়ণে মানুষের অংশ গ্রহণ অপরিহার্য। যেমন মানব-সন্তান উৎপাদনে পুরুষ-নারীর যৌন সঙ্গম ও বীজ বপন পর্যায়ের কাজ মানুষই করে। কিন্তু এই অংশ গ্রহণ আংশিক ও বাহ্যিক। শুধু এই আংশিক অংশ গ্রহণ দ্বারাই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে মহা শক্তিমান সত্তার নিরংকুশ সৃষ্টি ক্ষমতার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনা ও কর্মসাধন কার্যকর না হলে না মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব, না বৃক্ষাদি ও পানির অস্তিত্ব।

অধিকতর বিশ্লেষণ পর্যায়ে বলা যায় أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ 'তোমরা কি লক্ষ্য করেছ, তোমরা যে শুক্রকীট নিক্ষেপ কর, তা থেকে তোমরা সন্তান সৃষ্টি কর, না আমরাই তার স্রষ্টা'? এ আয়াতে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, এর সূচনা হয় শুক্রকীট থেকে। এই শুক্রকীট মানুষ নিজে তৈরী করে না, মানব দেহে আল্লাহ্‌র বিশেষ ব্যবস্থাপনায় স্বতঃই তৈরী হয়। অতঃপর মানুষের কাজ হচ্ছে তাকে শুধু যথাস্থানে নিক্ষেপণ। এটা তো শুধু স্থানান্তরকরণ পর্যায়ের কাজ। অতঃপর সন্তান উৎপাদনের ব্যাপারে মানুষের কিছুই করার থাকে না। পরবর্তী সব কাজই একমাত্র আল্লাহ্‌র। এ সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সন্তান উৎপাদন—তথা মানুষ সৃষ্টি অকল্পনীয়। সৃষ্টিকর্তাই মানব দেহে শুক্রকীট সৃষ্টি করেন। তাকে মার গর্ভাধারে নিক্ষেপণের ব্যবস্থা করেন ও তথায় স্থিত করেন, সংরক্ষণ ও লালন করেন। এভাবেই নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সন্তান লাভ সম্ভব হয়ে থাকে।

আর ... ... أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ 'তোমরা কি বিবেচনা করে দেখেছ, তোমরা যা বপন কর.....' আয়াতে মানুষকে শুধু জমিতে

ফসল উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত করা ও তাতে বীজ বপন করার কর্মী বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেই বীজ থেকে অংকুরোদ্গম হওয়া, তার রক্ষা পাওয়া, লালন-পালনের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষে পরিণত হওয়া—এ সব কাজে মানুষের কোন অংশ নেই। ... তা হলে তা কে করে? নিশ্চয়ই কোন মহাশক্তিমান সত্তা রয়েছেন যিনি এই কাজগুলি স্থায়ীভাবে করাচ্ছে, অন্যথায় ভূ-পৃষ্ঠে গাছের অস্তিত্ব সম্ভব হতো না। (স্বতঃউদ্ভুত উদ্ভিদরাজির কথা তো বলারই প্রয়োজন পড়েনা)। বীজ সৃষ্টিতেও মানুষের কোন হাত নেই। কেবল বপন দ্বারাই কি একটি গাছ সৃষ্টি সম্ভব?

তাহলে এই সকল কাজ সূচারুরূপে সম্পন্ন হতে দেখে কি দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে না এক মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতি? প্রশ্ন হয়েছে, এই বীজ সৃষ্টি করল কে? সে বীজ সংরক্ষিত হয়ে অংকুরিত ও একটি পূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হচ্ছে কার শক্তির প্রত্যক্ষ কার্যকরতায়? তাতে ফুল হয়, ফল ধরে, একটি দানা শতশত দানা দিচ্ছে কার দৌলতে? এ সব কাজে মানুষের কোন হাত আছে কি? এ ব্যাপারে কি অসংখ্য ধরনের কার্যকারণ প্রতি মুহূর্তে কার্যকর হয়ে থাকে না? তার কোন একটি কার্যকারণের উপর মানুষের কোন কর্তৃত্ব চলে কি? ... চিন্তা করে দেখ, এইগুলি কি আল্লাহ্‌র তথা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কার্যকারণের প্রত্যক্ষ ফল নয়? এইদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছেঃ

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ* إِنَّا لَمُغْرَمُونَ* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ*

আমরা চাইলে এই ফসলকে ভূষি বানিয়ে ফেলতাম। আর তোমরা শুধু গাল-গল্প করায় মশগুল থাকতে। বলতে যে, আমাদের উপর তো উল্টা চাটি পড়েছে। আসলে আমাদের ভাগ্যই চিটা হয়ে গেছে' (আমরা ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি)।

এখানেও আরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সৃষ্টির অস্তিত্বকে ভিত্তি করেই স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাওয়া এবং এ প্রমাণ পদ্ধতি যেমন সর্বকালীন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, তেমনি অকাট্য।

তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়েও এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। মেঘমালা থেকে বৃষ্টিপাত এমন একটি ঘটনা, যা বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থাকারী ছাড়া কিছুতেই ঘটতে পারে না।

কতগুলি নির্দিষ্ট কার্যকারণ কর্মতৎপর হলেই বৃষ্টিপাত সম্ভব। যেমন সূর্যের খুব তাপে পানির বাষ্পে পরিণত হওয়া নিঃসন্দেহে এক মহাশক্তিমান সত্তার সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনার কার্যকরতার পরিণতি। তিনিই এসব কার্যকারণের স্রষ্টা। এজন্যই বলা হয়েছেঃ

> তোমরা যে পানি পান কর, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যে, তা মেঘমালা থেকে তোমরা বর্ষাও, না আমরাই.... ... আমরা ইচ্ছা করলে তাকে লবণাক্তও বানাতে পারতাম।

অর্থাৎ শূন্যলোক মেঘমালার পুঞ্জীভূত হওয়া, তার লবণাক্ততা, দূষণ, নোংরাযুক্ত হওয়া ও ফোঁটায় ফোঁটায় বর্ষণ—এই প্রপঞ্চের অস্তিত্বকে ভিত্তি করে মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অন্যথায় এ বৃষ্টিপাত কোনক্রমেই সম্ভব হতো না।

আগুনের ব্যাপারটিও অনুরূপ। অতীব বিস্ময়কর উপায়ে আগুন প্রাপ্তির সম্ভব হয়। মানুষ শুধু গন্ধকের (Sulpher) শিখা কাষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, এর বেশী কিছু করে না। কিন্তু মানুষের এতটুকু কাজ দ্বারা আগুনের পক্ষে জ্বলে উঠা সম্ভব হতো না। তাই কুরআনে শুধু জ্বালানোর—অন্য কথায় চকমতির সাথে শুধু ঘর্ষণ সৃষ্টির কাজটাই মানুষের (تُورُونَ) বলা হয়েছে। এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু শুধু এ জ্বালানো বা ঘর্ষণ দ্বারাই শুষ্ক বা সিক্ত কাষ্ঠের মধ্যে জ্বলে উঠার শক্তি উদ্ভাবন সম্ভব নয়। এ কাজ করেন যিনি, তিনিই মহাশক্তিমান সত্তা আল্লাহ্‌।

আলোচ্য চারটি পর্যায়েই সৃষ্টির অস্তিত্বের দলীল দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। যদিও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হচ্ছে পরকাল ও মানুষের পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ার কথা প্রমাণ করা। কিন্তু সে জন্য যেসব যুক্তি ও দলীল পেশ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই অকাট্যভাবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করছে। কেননা আমরা যখনই জানতে পারছি যে, বিশ্বলোক কেন্দ্রিক এসব প্রপঞ্চের আসল কর্তা ও ব্যবস্থাপক হচ্ছেন মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা, তখন মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান সম্ভাবনাকে কি করে অস্বীকার করা যাবে? কেননা এসব প্রপঞ্চ ছিল না, ছিল অস্তিত্বহীন অবস্থায়। পরে এগুলি অস্তিত্ব সম্পন্ন হয়েছে। এ যখন সম্ভব হচ্ছে, তখন মানুষ যদি মৃত্যুর পর নিঃশেষও হয়ে যায়, মাহশূন্যে বা মাটিতে বিলীনও হয়ে যায়, তাহলেও তাকে পুনরুজ্জীবিত, পুনঃ অস্তিত্ব সম্পন্ন বানানো সেই মহাশক্তিমান শাশ্বত সত্তার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়। অসম্ভব-ও নয়, এ পর্যায়ের চূড়ান্ত জিজ্ঞাসা পেশ করা হয়েছে এ ভাষায়ঃ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُولٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ* (الواقعة: ٦٢)

তোমাদের প্রথম সৃষ্টি লাভের কথা তো তোমরা জানো-ই। তাহলে পরবর্তী (পুনঃ) সৃষ্টিকে তোমরা সত্য বলে স্বীকৃতি দেবে না কেন (তা অস্বীকার করবে কোন যুক্তিতে)?

নবম দলীল

বর্তমানের বিন্যাসে জীবনের পূর্বশর্তসমূহের সমাবেশ ঘটনাবশত (By chance) সৃষ্টি হওয়ার মতটিকে বাতিল করে দিয়েছে।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ*

(البقرة: ١٦٤)

(মহান আল্লাহ্র অস্তিত্বের নিদর্শনের প্রয়োজন হলে) আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্র-দিনের আবর্তনে, মানুষের জন্য উপকারী দ্রব্যাদি নিয়ে নদী-সমুদ্রে ভাসমান-চলমান যানসমূহে, উপর থেকে বৃষ্টি পতনে ও তার সাহায্যে মৃত জমিকে পুনরুজ্জীবিত করণে, সকল প্রকারের প্রাণশীলের বিস্তার সাধনে, বায়ুর প্রবাহ ও দিক পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে নিয়ন্ত্রিত থাকা মেঘমালায় সুস্থ বিবেক ও চিন্তাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান।

এ আয়াতসমূহে জীবনের প্রপঞ্চের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। সে প্রপঞ্চ এক দুইটি নয়, অসংখ্য—শত কোটি। সে প্রপঞ্চসমূহ প্রচ্ছন্ন, অতিশয় সূক্ষ্ম যেমন, তেমনি স্পষ্ট প্রতিভাত-ও। সেগুলিই এ মাটির পৃথিবীতে জীবনের উদ্গম হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। আয়াতসমূহের জিজ্ঞাসা হচ্ছে, জীবনের এ সব কার্যকারণ ও পূর্বশর্তসমূহ একত্রিত হওয়া কি নিছক দুর্ঘটনা মাত্র। হঠাৎ করে (By chance) হওয়া সম্ভবপর হয়েছে? কোন একজন মহাশক্তিমান স্রষ্টার অস্তিত্ব ছাড়া এই রূপ হওয়া কি কোন ক্রমেই সম্ভব বলে মনে করতে পারে কোন সুস্থ

বিবেক-বুদ্ধির মানুষ? ... কে এই শর্ত ও কার্যকারণসমূহের এক সাথে সমাবেশ ঘটিয়েছেন? কে সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করলেন? সুশৃঙ্খলভাবে সাজালেন, যার পরিণতিতে অনিবার্যভাবে বর্তমানের জীবন সম্ভবপর হলো?

ফলে এ যুক্তিবিন্যাসও একজন মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করছে আরোহ পদ্ধতিতে—সুশৃঙ্খল সুসংবদ্ধ বর্তমান জীবনের শৃঙ্খলা ও সুসংবদ্ধতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে একজন শৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর ও সুসংবদ্ধতার উদ্ভাবকের। আর তার ফলে বিশ্বলোকের হঠাৎ করে (By chance) ঘটনাবশত বা দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট হওয়া মতটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে গেছে।

যদিও সম্ভাবনার হিসেব-নিকেশ পর্যালোচনা ও হঠাৎ করে কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার বাতুলতা সমকালীন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত একটি আধুনিক যুক্তি পদ্ধতি। এ পর্যায়ে 'বিজ্ঞান ঈমানের আহবান জানায়' গ্রন্থের রচয়িতা ক্রেসী মরীসন আকস্মিক বা দুর্ঘটনাবশত সৃষ্টির মতবাদকে বাতিল করে দিয়েছেন। কেননা উক্ত যুক্তির ভিত্তিতে নাস্তিকতাবাদীরা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার দুঃসাহস করেছিল।

দুর্ঘটনা কিংবা By chance সৃষ্টির মতাদর্শের মর্ম এই নয় যে, কোন নির্দিষ্ট ঘটনা বা প্রপঞ্চ কোন বাহ্যিক কারণ (cause) ছাড়াই সংঘটিত হয়েছে। কেননা সে মত তো সর্বজনজ্ঞাত কার্যকারণ ধারার স্পষ্ট অস্বীকৃতি (negation)। বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের কেউই সে মতটিকে অস্বীকার করেনি। তবে ইংরেজ দার্শনিক হিউমের কথা স্বতন্ত্র। তিনি সে মতটি অস্বীকার করে সেটিকে অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Experiment) পদ্ধতিতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আর অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সে আইনটির মৌলিকতা প্রমাণ করতে অক্ষম বলে তিনি মনে করেছেন। অবশ্য তিনি উক্ত ফর্মূলার দার্শনিক নিয়মাদি ও পূর্বনির্ধারিত মতসমূহ সম্পর্কে যদি অবহিত হতেন, তাহলে তিনি এ বিষয়ে কোন সংশয়ে পড়তেন না।

জড়বাদী দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের মতে By chance সৃষ্টির ও তার সমর্থক যুক্তির তাৎপর্য হচ্ছে, কোন প্রপঞ্চের কিংবা সুসংবদ্ধ প্রপঞ্চসমূহের আত্মপ্রকাশে সুদীর্ঘ কার্যকারণ তৎপরতা ও নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতার ধারাবাহিকতা অপরিহার্য। অবশ্য সেজন্য বিশেষ কোন পূর্বগৃহীত পরিকল্পনা বা রূপরেখা এবং তার পাশ্চাতে কোন উদ্ভাবক—পরিকল্পক ও শৃঙ্খলাকারীর প্রয়োজন পড়ে না। যেমন একটি বালক কোন লেখনযন্ত্র (Type writer) নিয়ে খেলা করে দীর্ঘ সময় ধরে, যার ফলে একটি সংবদ্ধ কবিতা রচিত হয়ে গেল। অথবা পর্বতচূড়া থেকে কোন প্রস্তর খণ্ড গড়িয়ে পড়ল—গড়িয়ে যেতে থাকল। এভাবে বহু প্রস্তর খণ্ডের

সাথে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত একটি মানব প্রতিকৃতি গড়ে উঠল।...... এমনিভাবেই হয়েছে এই বিশ্বলোক ও মানুষ। কিন্তু এভাবে এই বিশ্বলোকের অস্তিত্ব হয়নি, হতে পারে না, মানুষ-ও নয়, কুরআন তা-ই প্রমাণ করতে চেয়েছে। আর কুরআনের এই প্রমাণ যে অকাট্য তা কে অস্বীকার করতে পারে?

জীবনের প্রপঞ্চ

জীবনকে বস্তুগত প্রপঞ্চ বা 'বস্তু'র ক্রমাগত কার্যক্রমের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল মনে করা হোক; কিংবা নিছক একটা প্রপঞ্চই ধরা হোক. একথা বিশ্বাস না করে উপায় নেই যে, এই পৃথিবী গোলকে বা অন্য কোন গ্রহে জীবনের উৎপত্তির জন্য নিশ্চিতভাবে বিপুল সংখ্যক কার্যকারণ (Factor) ও পূর্বশর্তের সমাবেশ একান্তই আবশ্যক। যার কারণে শেষ পর্যন্ত জীবনের উন্মেষ সম্ভবপর হয়েছে। আর একথা তো জানা-ই আছে যে, এসব পূর্বশর্ত ও বিপুল Factor-এর একত্র সমাবেশ হঠাৎ করে বা স্বতঃই সংঘটিত হতে পারে না। আর তা যখন সম্ভব নয়, তখন প্রত্যেকটি Factor-ই মূল 'কারণে'র অংশ হবে। তার দৌলতে প্রপঞ্চের অস্তিত্ব সম্ভব হবে এবং তা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়লে প্রপঞ্চও অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে সুনিশ্চিত ভাবে।

কিন্তু জীবন প্রপঞ্চের Factor এবং পৃথিবীর বুকে তার উন্মেষ হওয়ার অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতি যে কি, তা আয়ত্ত করা মানুষের সাধ্যাতীত। জীববিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী আল কিন্দী তাই বলেছেনঃ

> জীবনের জন্য পৃথিবীর অনুকূল হওয়ার বহুসংখ্যক রুপ ধারণ করে। আকস্মিকতার মত দ্বারা তার ব্যাখ্যা দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।[১]

ক্রেসী মরীসন-ও তাঁর উক্ত গ্রন্থে বলেছেনঃ

> প্রকৃত জীবনের মৌল উপকরণসমূহের একত্রিত হওয়া ও একই সময় একটি মাত্র গ্রহে সম্পন্ন হওয়া কেবলমাত্র হঠাৎ করে (By chance) ঘটে যাওয়া ব্যাপার হতে পারে না।[২]

উক্ত গ্রন্থের অন্যাত্র লিখেছেনঃ

> আমাদের পৃথিবীতে জীবন-উন্মোষের জন্য কতগুলি মৌলিক পূর্বশর্ত রয়েছে। কোন্ সময় কোন্ স্থানে নিছক দুর্ঘটনার ফলে (By chance) সেই শর্তসমূহের বাধ্যতামূলক সংযোজন অকল্পনীয়।[৩]

---

১. الله يتجلى في عصر العلم ص: ٥ - مقال هل العالم مصادفة

২. العلم يدعو الايمان ص: ١٩٥

৩. ঐ, পৃঃ ২৪।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেনঃ

> অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড—তা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা কিংবা তার বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে অবস্থিত থাকাই হচ্ছে প্রধান জৈব উপাদান। আর সেগুলিই হচ্ছে সেই ভিত্তি যার ফলে জীবন গড়ে উঠে। কিন্তু তা মিলিয়ন সংখ্যার মধ্য থেকে হঠাৎ করে পাওয়া যেতে পারে না। সেই সবগুলিকে একই সময় একই আবর্তনশীল নক্ষত্রে (গ্রহে) অবস্থিত হতে হবে জীবনের জন্য অপরিহার্য নির্ভুল অনুপাত অনুযায়ী। কিন্তু বিজ্ঞান এসব তত্ত্ব স্পষ্ট করে তুলতে পারে নি। তবে তা কোন হঠাৎ করে ঘটে যাওয় ব্যাপার বলা কেবলমাত্র গণিত বিজ্ঞানের একটা বাড়াবাড়ি মাত্র।[১]

বিষয়টিকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে জীবনের উন্মেষ ঘটানো ও তাকে অব্যাহতির জন্য যেসব পূর্বশর্ত ও ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এমনভাবে যে,তার কোন একটির বিলুপ্তি জীবনের বিলুপ্তি ঘটানোর অনিবার্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়—এই পর্যায়ের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

১. ভূ-মণ্ডলকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে গ্যাসে ভারাক্রান্ত একটি স্তর। বৈজ্ঞানিকগণ তার গুরুত্ব পরিমাপ করেছেন ৮০০ কিলোমিটার। এ স্তরটি পৃথিবীর অধিবাসীদের হত্যাকারী বিশ মিলিয়ন উল্কা এবং মহাশূন্যে প্রতিদিন বিক্ষিপ্ত হওয়া প্রস্তরখণ্ড—যার প্রত্যেকটির গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে—থেকে রক্ষা করে। উক্ত স্তরটি সর্বদা আবর্তনশীল থাকে বলে তা পৃথিবীর উপর নিপতিত হতে পারে না। এই রক্ষাকারী স্তরটি যদি বর্তমানে যেমন পুরু রয়েছে তার চাইতে পাতলা ও সূক্ষ্ম হতো, তাহলে পৃথিবীর শুন্যলোকস্থ আবরণটি জ্বলে-পুড়ে যেত এবং পৃথিবীর সর্বত্র তা পড়ত ও সবকিছু জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিত। এসব উল্কা ও প্রস্তরখণ্ড শূন্যলোকে সব সময় উড়ন্ত থাকে। সে সবের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৬—৪০ মাইল। আর এই তীব্র গতিশীলতার কারণে তা সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত, জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিত এবং সর্বপ্রকম্পক বিস্ফোরণ ঘটাতো।

এগুলির গতিতে যদি কম হতো, আর তার প্রত্যেকটি পৃথিবীতে নিপতিত হতো তাহলে পৃথিবীতে ধ্বংসের লীলা চলত। বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হতো। পৃথিবী বেষ্টনকারী বায়ু স্তরের পূর্বোক্ত বিশষত্ব ছাড়াও আর একটি কাজ হচ্ছে তাপকে জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন মাত্রার মধ্যে সীমিত রাখা।

---

১. العلم يدعو الايمان ص: ٧٣

২. পৃথিবীতে অবস্থিত পানিও জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ 'ফ্যাক্টর'। খাল-নদ-নদী ও সমুদ্র-মহাসমুদ্রে সুদীর্ঘ শীত মৌসুমে জীবনে স্থিতি ও সুরক্ষার লক্ষ্যে এই জৈব উপাদান সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জৈব উপাদানের তাপমাত্রা শূন্যের কোঠায় পৌঁছলে তা জমে যায়। ফলে পানির অভ্যন্তরস্থ তাপ বাইরে বের হতে পারে না। ফলে নদী-সমুদ্রে পানি দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। অন্যথায় সমুদ্র-মহাসাগরীয় পানি জমে যেত। আর তার ফলে জীবন ও জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

একথা স্পষ্ট যে, বরফের বিশেষ ওজন এ ব্যাপারে বিশেষ আনুকূল্য করে। কেননা বরফের ওজন প্রবহমান পানির তুলনায় কম। এই কারণে বরফ পানির উপরি স্তরে ভাসে, গভীরে ডুবে যেতে পারে না।

৩. পৃথিবীও পুরাপুরিভাবে জীবনের উপাদান, যেমন পানি। তাতে বিশেষ খনিজ পদার্থ সমন্বিত রয়েছে। উদ্ভিদ তা শুঁষে নেয় এবং তা থেকে খাদ্য উপকরণ তৈয়ার করে, যা জীবের জন্য একান্তই প্রয়োজনীয়।

মাটির অভ্যন্তরে খনিজ ও লৌহ ইত্যাদি পদার্থের অস্তিত্ব এবং মানুষের হাতের আওতার মধ্যে সে সবের প্রাপ্তব্য হওয়ার ফলেই মানুষের বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে উঠা সম্ভবপর হয়েছে। বিশেষ করে সমসাময়িক কালের প্রকৌশল সভ্যতার বিকাশ।

৪. পৃথিবীর একটা বিশেষ আকর্ষণ শক্তি রয়েছে এবং তা বিশেষ ব্যাস পর্যন্ত কার্যকর থাকে। ফলে তা ভু-কেন্দ্রের দিকে পানি ও বাতাস সর্বক্ষণ আকর্ষণ করতে থাকে এবং এভাবে তার সংরক্ষণ কার্যও সম্পাদন করে। পৃথিবীর ব্যাস যদি বর্তমানের ব্যাসের অর্ধেক হতো, তাহলে তার আকর্ষণ শক্তি পানি ও বাতাস তার উপরি ভাগে টেনে রেখে তার সংরক্ষণ করতে অক্ষম হয়ে যেত এবং তাপমাত্রা এত তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যেত যে, সেখানে জীবন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ত।

পৃথিবী বর্তমানে সূর্য থেকে যতটা দূরত্বে অবস্থান করছে, যদি তার দ্বিগুণ দূরত্বে চলে যেত, তাহলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বর্তমানের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত নেমে যেত এবং শৈত্যের মেয়াদ কয়েকগুণ দীর্ঘ হয়ে যেত। সব জীব-জন্তু জমে গিয়ে মরে পড়ে থাকত।

অনুরূপভাবে সূর্য ও পৃথিবীর বর্তমান দূরত্ব যদি হ্রাস পেত—ধরা যাক অর্ধেক হয়ে যেত, তাহলে পৃথিবী সূর্য থেকে বর্তমানে যে পরিমাণ তাপ পাচ্ছে, তার

চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যেত, তাহলে সূর্যের খরতাপে ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেত এবং জীবন হতো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তাহলে পৃথিবীর বুকে জীবনের উন্মেষ ও স্থিতির এসব অপরিহার্য পূর্ব শর্ত ও 'ফ্যাক্টর' সমূহ কি ভারসাম্যপূর্ণ অনুপাতে একত্রিত হয়েছে ও জীবন সম্ভবপর হয়েছে একান্তই হঠাৎ করে, দুর্ঘটনাবশত—By chance? অথচ হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর মত এখানেও নানা বিচিত্র ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারত এবং শেষ পর্যন্ত জীবন এখানে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ত।

অন্যান্য দলীল

পৃথিবী নিজ কেন্দ্রে থেকে প্রতি ২৪ ঘন্টায় একবার আবর্তিত হয়। এই আবর্তনে তার গতি হচ্ছে ঘন্টায় এক হাজার মাইল। এ গতিমাত্রা যদি কমে গিয়ে ঘন্টায় এক মাইল হয়ে যেত বা যায়, তাহলে রাত ও দিনের দৈর্ঘ্য বর্তমান অপেক্ষা দশগুণ বৃদ্ধি পেত। আর তাহলে গ্রীষ্মকালীন সূর্যতাপ দিনে দৈর্ঘ্যকালে সমস্ত উদ্ভিদ জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিত। আর রাত্রির দৈর্ঘ্যকালীন শৈত্য ছোট ছোট গাছপালা ও গুল্ম-লতাকে বরফাচ্ছাদিত করে মেরে ফেলত।

পৃথিবীতে বর্তমানে যে সূর্যতাপ পৌঁছায় তা যদি বর্তমানের অপেক্ষা অর্ধেক কমে যেত, তাহলে শৈত্যের তীব্রতায় পৃথিবীর সব জীব-জন্তু ধ্বংস হয়ে যেত। পক্ষান্তরে তার পরিমাণ যদি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেত, তাহলে সমস্ত উদ্ভিদ মরে যেত, জীবনের শুক্রকীট ধ্বংস হয়ে যেত। ফলে কোন জীবের উন্মেশ বা জন্ম লাভ সম্ভব হতো না।

পৃথিবী ও চাঁদের বর্তমান দূরত্ব যদি পঞ্চাশ হাজার মাইল কম হয়ে যেত, তাহলে দুনিয়ার নদী-সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা এত প্রবলভাবে ছুটত, তাহলে পানির নিকটবর্তী পৃথিবীর এলাকাসমূহ প্রতি দিনে দুবার করে প্রবল জলস্রোতে ডুবে যেত। তার স্রোত ও গতিবেগ এত সাংঘাতিক হতো যে, পাহাড়গুলিকেও উপড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেত।

মহাজাগতিক আলোকোচ্ছটার গতায়াতের জন্য জরুরী পরিমাণের বায়ুস্তর পৃথিবীকে গ্রাস করে রয়েছে। তাতে এমন সব রাসায়নিক উপাদান-উপকরণ রয়েছে যা কৃষি কার্যের জন্য একান্তই জরুরী। তা জীবাণু ধ্বংস করে এবং ভিটামিন উৎপাদন করে; কিন্তু তাতে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না। পৃথিবী থেকে যুগ যুগ ধরে যে গ্যাস উদগীরণ ঘটে তার বিরাট অংশই বিষাক্ত। কিন্তু বায়ূ তার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে দোষযুক্ত হয় না। মানুষের অস্তিত্বের জন্য যে ভারসাম্যপূর্ণ অনুপাত প্রয়োজন তাতেও কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না।

আমরা যে বাতাস শ্বাসের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে টেনে নেই, তা বিভিন্ন গ্যাসে ভরপুর থাকে। তাতে জবক্ষর-জান (Nitrogen) থাকে ৭৮ ভাগ, আর অক্সিজেন থাকে প্রায় ১২%। আর অন্যান্য গ্যাসের পরিমাণ ১%।

এক্ষণে অক্সিজেন যদি ৫% হয়ে যায় তাহলে জগতে জ্বলনযোগ্য সমস্ত উপকরণ এমন মাত্রায় জ্বলে উঠবে যে, বিদ্যুতের প্রথম স্ফুলিঙ্গ একটি গাছে লাগলে গোটা বন জ্বলে উঠবে।

এসব সূক্ষ্ম হিসেবাদি জানার পর কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে একথা বলা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, এই সব কিছুই অন্ধ By chance এরই উৎপাদন এবং প্রথম জড়-এর বিস্ফোরণ নিছক দুর্ঘটনাবশতই সংঘটিত হয়েছিল?

এসব ফ্যাক্টর, কার্যকারণ ও পরিবেশের ফলেই জীবনের উদ্‌গম ও তার সংরক্ষণ সম্ভব করেছে। কিন্তু তা হঠাৎ করে দুর্ঘটনার ফলে কোন এক সময় ঘটেছিল এবং তাতে কোন মহাশক্তিমান সত্তার শক্তি বা ইচ্ছার যোগ ছিল না এবং এই 'ফ্যাক্টর'সমূহ আনুপাতিক পরিমিতির মধ্যে একত্রিত হয়ে এক সুসংবদ্ধ জীবনধারা রচনা করে, এমনটি একান্ত নির্বোধের বা কোন অন্ধ ও অজ্ঞ মুর্খের পক্ষে বলা-ই হয়ত সম্ভব হতে পারে।

তাই অধ্যাপক ইডুইন কোপিকলীন বলেছেনঃ

জীবন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে উদ্ভূত হয়েছে, এইরূপ কথা বলার অর্থ প্রায় এই রকম বলা যে, এই বিরাট 'বিশ্বকোষ'টি মুদ্রণালয়ের সংঘটিত আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে তৈরি হয়েছে।

By chance জীবনের উদ্‌গম হওয়ার মতটি গাণিতিক দলীলের দ্বারাও বাতিল প্রমাণিত। এ পর্যায়ে প্রখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী ক্রেসী মরীসন একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

তুমি যদি দশটি পাথর খণ্ড গ্রহণ কর এবং প্রত্যেকটির উপর সংখ্যা লেখো এক থেকে দশ পর্যন্ত, পরে তা তোমার পকেটে ফেলে মিলিয়ে মিশিয়ে ফেল এবং তার পরে তা থেকে ১০ পর্যন্ত ক্রমিকভাবে বের করতে চেষ্টা কর এভাবে যে, প্রত্যেকটি খণ্ডকে তোলার পর আবার পকেটে ফেলে দেবে, তাহলে দেখবে, ১ সংখ্যা লেখা খণ্ডটি প্রথমবারে হাতে পাওয়া দশবারের মধ্যে একবার সম্ভব। আর ১ ও ২ সংখ্যা লেখা খণ্ডদ্বয় পরপর পাওয়া একশ'বারের মধ্যে একবার সম্ভব। আর ১, ২ ও ৩ সংখ্যা লেখা খণ্ডগুলি পরপর তুলতে পারা হাজার বারের মধ্যে একবার সম্ভব হবে। আর ১, ২, ৩

ও ৪ লেখা খণ্ডগুলি পরপর পাওয়া দশ হাজার বারের মধ্যে একবার সম্ভব হতে পারে। অনুরূপভাবে একটি থলিতে একশটি এমন মার্বেল খণ্ড রাখ যে, তার মধ্যে ৯৯টি কালো ও একটি মাত্র শ্বেত। অতঃপর থলিটিকে খুব করে নাড়াও। পরে তা থেকে একটি তুলে নাও। তখন শ্বেতখণ্ডটি তোলা একশ' বারের মধ্যে একবার সম্ভব হবে। অতঃপর মার্কেলগুলকে আবার থলের মধ্যে রেখে নতুন করে তুলতে শুরু কর। দেখবে, শ্বেত খণ্ডটি তোলা সম্ভব হবে সেই একশ'র মধ্যে একবার মাত্র। আর শ্বেত খণ্ডটি পরপর দু'বার তোলা সম্ভব হবে দশ হাজার বারের মধ্যে একবার মাত্র।

এর আলোকে মূল বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। জীবন প্রপঞ্চের প্রকাশ সম্ভব অগণিত ফ্যাক্টর-এর বিপুলতার ফলে। তা এমনভাবে যে, তার কোন একটিও না হলে জীবনই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তাহলে প্রথম জড়-এর বিস্ফোরণে জীবনের জন্য আবশ্যক ফ্যাক্টর ও পূর্বশর্তসমূহ সমন্বিত হওয়ার কথা বলাটা মিলিয়ন-বিলিয়ন সম্ভাবনার মধ্যে একমাত্র একটি, কেননা উক্ত বিস্ফোরণের ফলে প্রথম জড়-এর পক্ষে পরিমাণ ও পরিস্থিতির দিক দিয়ে মিলিয়ন-বিলিয়ন প্রকারের অবস্থার মধ্যে জীবনে পরিণত হওয়া মাত্র একবারই সম্ভব হতে পারে, যখন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অনুকূল শর্তসমূহ এবং সুসংবদ্ধতা ও বিন্যাস পুরাপুরি সম্মিলিত হতে পারে। কিন্তু অপরাপর অবস্থা জীবন উদ্ভূত হওয়া ও তার স্থিতিলাভের অনুকূল হবে না। হঠাৎ করে আপনি-ঘটে যাওয়া। বিস্ফোরণের পরে-পরে জীবনের উন্মেষ হওয়া সেই অসংখ্য-অগণিত সম্ভবনার মধ্যে মাত্র একবার হয়েছিল বলে দাবি করা অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটি সম্ভাবনাকে অহেতু অগ্রাধিকার দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে কোন সম্ভাবনাকে জীবনের উৎস বলে মেনে নেয়া কোন সুস্থবুদ্ধির মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

এ আলোচনার সূচনায় কুরআন মজীদের যে-আয়াতটি উদ্ধৃত করেছি, তা সম্ভবত উক্ত রূপ যুক্তি প্রদর্শনের বাতুলতারই ঘোষণা দিয়েছে। বলেছে, জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় 'ফ্যাক্টর' ও শর্তসমূহের আপনা-আপনি একত্রিত হয়ে যাওয়া কোনক্রমেই কল্পনা করা যায় না।

উক্ত আয়াতে সৃষ্টিলোকে অবস্থিত সুসংবদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করার সাথে সাথে দুনিয়ার জীবনের স্থিতি লাভ ফ্যাক্টরসমূহের প্রতিও ইশারা করা হয়েছে। বলেছে যে, এ ফ্যাক্টরসমূহের আপনা-আপনি একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং তাতে কোন মহাশক্তিমান সত্তার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিও এ কথাই বলেছেঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ* (الرعد : ٢)

তিনি আল্লাহ্-ই যিনি আকাশমণ্ডলকে দৃশ্যমান নির্ভর ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরে তিনি স্বীয় শক্তি-কেন্দ্রের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছেন। তিনি সূর্য ও চাঁদকে একটি স্থায়ী নিয়মের অনুসারী বানিয়ে দিয়েছেন। এই গোটা ব্যবস্থার প্রত্যেকটি জিনিসই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তকার জন্য চলমান হয়ে আছে। আল্লাহ্-ই এই সব ব্যাপারের ব্যবস্থাপনা করেছেন। তিনি নিদর্শনসমূহ আলাদা-আলাদাভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা তোমার রব্ব-এর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে পার।

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِ الَّيْلَ النَّهَارَ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ* (الرعد: ٣)

আর তিনিই এ যমীনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন, তাতে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে দিয়েছেন ও নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। তিনিই সমস্ত ফল-ফলাদির জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনের উপর রাতকে প্রবর্তিত করেছেন। এই সমস্ত ঘটনাতেই বড় বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত।

জীবন প্রপঞ্চের উন্মেষের জন্য অপরিহার্য বহু সংখ্যক কার্যকারণ ও 'ফ্যাক্টর' এর উল্লেখ হয়েছে এ আয়াতসমূহে। এই সব 'ফ্যাক্টর' কার্যকারণ বা পূর্বশর্ত কোন স্রষ্টা ছাড়াই হঠাৎ করে একত্রিত ও সমন্বিত হয়ে গেছে এবং তা থেকে ঘটনাক্রমে জীবনের উন্মেষ ঘটেছে, এর মত মিথ্যা কথা আর কিছু হতে পারে না।

দশম দলীল

দিকচক্রবাল ও মানুষের নিজের মধ্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের দলীল

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ* سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ* (حم السجدة: ٥٢-٥٣)

হে নবী! এই লোকদের বল, কখনও কি তোমরা একথা চিন্তা করে দেখেছ যে, এই কুরআন যদি সত্যিই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিল হয়ে থাকে, আর তা সত্ত্বেও তোমরা তাকে অগ্রাহ্যই করলে, তাহলে সে ব্যক্তির অপেক্ষ অধিক ভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে এর বিরুদ্ধতায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে?

শিগগীরই আমরা আমাদের নিদর্শনসমূহ দিকচক্রবালে দেখাব এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, যেন তাদের সামনে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে যায় যে, কুরআন বাস্তবিকই সত্য। একথা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব্ব সব ব্যাপারেই প্রত্যক্ষ সাক্ষী?

ইসলামী দার্শনিক ও কালাম শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে উক্ত দ্বিতীয় আয়াতটিকে তওহীদি আকীদা প্রমাণে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তাতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের সাথে সাথে আল্লাহ্‌র যাত ও গুণাবলীর (ذات وصفات) তওহীদও প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। ওয়ায়েয ও বক্তাগণ সাধারণত তা-ই করেছেন ও করে থাকেন।

কিন্তু বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে বিবেচ্য। দ্বিতীয় আয়াতটি যদি পূর্ববর্তী আয়াতটির তাৎপর্যের সাথে ওতপ্রোত সম্পর্কিত হয়ে থাকে, আর যদি ধারাবাহিকতা গণ্য করা হয়, তাহলে আয়াতটি থেকে ভিন্ন তাৎপর্য প্রকাশ পায়। সে তাৎপর্যের সাথে তওহীদের সম্পর্ক বড় একটা থাকে না। থাকলেও তা অনেক দূরবর্তী।

অর্থাৎ প্রথম আয়াতের বক্তব্য ও লক্ষ্য হচ্ছে কুরআন, কুরআনেরই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ দৃষ্টিতে দ্বিতীয় আয়াতে সেই কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তার সত্যতা দিক-চক্রবালে ও মানুষের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান হবে। এভাবে আয়াতকে পরস্পর সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত মেনে

নিলে অর্থ হবে, প্রাকৃতিক জগত ও মানুষের মনের জগতের নিদর্শনসমূহ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দেখিয়ে দিবেন যে, কুরআনে যা কিছুই রয়েছে তা সবই পরম সত্য। তাতে আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে বা তাঁর তওহীদ সম্পর্কে এ আয়াতের তেমন কোন বিশেষত্ব থাকে না।

আরব উপদ্বীপে দ্বীন-ইসলামের ক্রমাগত প্রসারিত হওয়া ও তওহীদ বিশ্বাসী মুসলমানদের হাতে শির্‌ক ও পৌত্তলিকতার দুর্গসমূহের চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া এবং তথায় তওহীদী হুকুমত কায়েম হওয়া প্রভৃতিই হচ্ছে সেই দিকচক্রবাল কেন্দ্রিক দলীল, যে বিষয়ে কুরআন আগাম খবর দিয়েছিল এবং তাতে কুরআনেরই সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। বস্তুত কুরআনই সুসংবাদ দান ও ওয়াদা প্রতিশ্রুতির একটা ধারাবাহিকতা উপস্থাপিত করেছিল, দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিল, অদূর ভবিষ্যতে এসব অবশ্যই ঘটবে, মু'মিনদের হাতে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র হুকুমত হবে। যেমন সূরা আন-নূর-এর এই আয়াতঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

(النور: ৫৫)

আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন তোমাদের মধ্যকার সেসব লোককে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করছে যে, যমীনে তাদের খলীফা বানাবেন।

এক্ষণে আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, মু'মিন লোকদিগকে খলীফা বানাবার জন্য আল্লাহ্র এ ওয়াদা পূরণের কাজ তিনি কিভাবে করলেন।

নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় এবং তারপর ইসলামের বিস্তার ও ব্যাপকতা যা কিছুই হয়েছে, তা আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদাসমূহের একটি দিক। সেই সাথে তা এমন ভবিষ্যদ্বাণী যা বাস্তবায়িত হয়েছে। আর সেই কারণে তা গায়বী ভবিষ্যত সম্পর্কিত কুরআন প্রদত্ত সুসংবাদসমূহের অন্যতম বলে দিকচক্রবালে দেখানো আল্লাহ্র একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আয়াত।

এ ছাড়া বদর, ওহুদ ও আহযাব যুদ্ধে কুরাইশদের বড় বড় সর্দারের নিহত হওয়া এবং অপর দিকে রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্যবাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া—মানুষের মধ্যে প্রদর্শিতব্য নিদর্শন, যা কুরআন প্রদত্ত গায়বী খবরের সত্যতা ও যথার্থতাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

এই দুই ধরনের লক্ষণ ও নিদর্শনই স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়ার পর কুরআনের সত্যতা ও যথার্থতার ব্যাপারে কারোর মনেই এক বিন্দু সংশয় থাকতে পারে

না। কেননা কুরআন যা বলেছে, যে আগাম সুসংবাদ দিয়েছে, তা সবই সত্য ও বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে।

উপরোক্ত দ্বিতীয় আয়াতটির শেষ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনী দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তির উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেকটি জিনিসেরই প্রত্যক্ষ সাক্ষী।' অর্থাৎ তিনি সব সময় সকল স্থানেই উপস্থিত, কোন একটি স্থানেও তিনি অনুপস্থিত নন। তিনি সবকিছুই প্রত্যক্ষভাবে দেখেন, তাঁর অগোচরে কোথাও কিছু নেই, হতে পারে না, থাকতে পারে না।

এ পর্যন্ত আয়াতটির যে ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে, তাতে মনে হয়, দ্বিতীয় আয়াতটি দিকচক্রবাল ও মানুষের নিজেদের সম্পর্কিত নিদর্শনাদির মাধ্যমে আল্লাহ্র অস্তিত্বের দলীলরূপে উপস্থাপিত হয়নি; বরং তা রাসূলে করীম (স)-এর দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণের দলীলরূপেই প্রতিভাত। আর সে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হয় যদি আয়াত দুটি পরস্পর সংযুক্ত মনে করা হয় এবং উভয় আয়াতে একই কথা বলা হয়েছে বলে মেনে নেয়া হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতটির অধ্যয়ন যদি প্রথম আয়াতটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে করা হয়; কিংবা দ্বিতীয় আয়াতটি দুইবার নাযিল হয়েছে বলে মনে করা হয়—একবার প্রথম আয়াতটির সঙ্গে একত্রিত হয়ে এবং দ্বিতীয়বার স্বতন্ত্রভাবে—তাহলে দ্বিতীয়টিকে আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য দিকচক্রবাল ও মানবকেন্দ্রিক দলীলরূপে ধরে নিতে হয়। আর তখন তা তৃতীয় দলীলরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তখন اَنَّهُ الْحَقُّ তা সত্য বলে আল্লাহ্ নিজেকেই বুঝিয়েছেন বলে ধরে নিতে হবে। আর তখন আয়াতটি শেষ অংশ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ 'এ কথাকি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব্ব সর্বব্যাপারেই প্রত্যক্ষ সাক্ষী' এর সাথে অনেকটা সঙ্গতিসম্পন্নও হতে পারে।

বস্তুত বিশ্বলোকে সদা কার্যকর চরম বিস্ময়কর নিয়মাদি, স্থিতিশীল চলমান তারকা-নক্ষত্ররাজি এবং ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত বিভিন্ন সৃষ্টি জাতি ও প্রজাতি—সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের দিকচক্রবাল কেন্দ্রিক নিদর্শন ও অকাট্য প্রমাণ বিশেষ।

মানব সত্তার উপর কর্তৃত্বকারী জটিল ও বিস্ময়কর নিয়মাদি, মানুষের সৃষ্টি, তার দেহ সংস্থা গড়া—মায়ের জরায়ুতে প্রথম উন্মেষ থেকে শুরু করে তার মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত সকল অবস্থা আল্লাহ্র অস্তিত্বের মানুষ কেন্দ্রিক অকাট্য দলীল।

এসব সূক্ষ্ম ও রহস্যময় নিয়ম ও ব্যবস্থাদি—চক্রবাল ও মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা কেন্দ্রিক আয়াত নিদর্শন ও দলীলাদি সুস্থ চিন্তার মানুষকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণে বাধ্য করে। স্পষ্ট মনে হয়, দ্বিতীয় আয়াতটি ঠিক সেই কথাই বলতে চেয়েছে। আর এ কারণেই এ আয়াতটিকে 'সিদ্দীক'দের একটি দলীলরূপে অভিহিত করা যেতে পারে।

ইবনে সীনার কথা

দার্শনিক ইবনে সীনা তাঁর সর্বশেষ দার্শনিক গ্রন্থ **الاشارات**-এর উপরোদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়াতটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেনঃ

প্রথম পর্যায়

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ

শিগগীর-ই আমরা আমাদের নিদর্শনসমূহ দিকচক্রবালে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও দেখাব।

এর ভিত্তিতে ইবনে সীনা বলেছেন, বিশ্বলোক ও মানব-মনের নিহিত আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদির মাধ্যমে আমরা শীগগীরই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হব। তার অর্থ, তিনি 'কারণ' (Cause)-কে ভিত্তি করে 'কারণ'-এর অস্তিত্বের দলীল উপস্থাপনে এ আয়াতাংশের উপর নির্ভর করেছেন। ঠিক যেমন আমরা বৃষ্টিপাত, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমক দেখে কালো কালো মেঘমালার অস্তিত্ব সহজেই বুঝতে পারি।

আর আয়াতটির দ্বিতীয় ভাগঃ

اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ،

একথা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব্ব সব ব্যাপারেই প্রত্যক্ষ সাক্ষী?

আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র গুণাবলী জানতে ও চিনতে পারা এবং তাঁর গুণাবলী জেনে ও চিনে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকূলকে সেই গুণে বা অন্য কোন গুণে গুণান্বিত বলে জানতে পারি।

এই পদ্ধতির দলীল উপস্থাপন 'সিদ্দীকগণে'র পদ্ধতি বলে অভিহিত।

একাদশ দলীল

অস্তিত্বের পরিচিতি লাভের পন্থায় আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ

মুসলিম দার্শনিকগণ কুরআনের কিছু কিছু আয়াতকে 'সিদ্দীকগণে'র দলীলরূপে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেই পর্যায়ের কতিপয় আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা গেলঃ

اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ (النور: ٣٥)

আল্লাহ্‌ আসমান-যমীনের নূর। বিশ্বলোকে তাঁর নূর-এর দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন একটি তাকের উপর প্রদীপ রাখা হয়েছে, প্রদীপটি রয়েছে একটি ফানুসের মধ্যে। ফানুসের অবস্থা এমন যেমন মোতির মত ঝকঝক করা তারকা। আর তা সেই জয়তুনের এমন বরকত-ওয়ালা গাছের তেল দ্বারা উজ্জ্বল করা হয় যা না পূর্বের, না পশ্চিমের। যার তেল আপনা-আপনি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, তাতে আগুন স্পর্শ করুক আর না-ই করুক। (এভাবে) আলোর উপরে আলো (বৃদ্ধি পাওয়ার সব উপাদান একত্রিত)। আল্লাহ্‌ তাঁর নূরের দিকে যাকে ইচ্ছা পথ দেখান। তিনি লোকদেরকে দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা কথা বুঝিয়ে থাকেন। তিনি সর্ববিষয়ে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ* (ال عمران: ١٨)

আল্লাহ্‌ নিজেই এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ্‌ নেই। ফেরেশ্‌তা এবং সব জ্ঞানবান লোক সত্যতা ও ইনসাফ সহকারে এই

সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ-ই ইলাহ্ হতে পারে না।

ইবনে সীনা প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুযায়ী যা কিছু মওজুদ আছে তা তাৎপর্যের দিক দিয়ে দু'ভাগে বিভক্তঃ 'ওয়াজিব' ও 'মুম্‌কিন'। যা স্বতন্ত্রই 'মুম্‌কিন', তা নিজের অস্তিত্বকে অনস্তিত্বের (عدم) উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না। ফলে তাকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য বাইরে অবস্থিত একজন অগ্রাধিকার দাতা একান্ত আবশ্যক।

কথাটি এ ভাবেও বলা যায়ঃ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হয় এমন হবে যে, তার অস্তিত্ব একান্তই অপরিহার্য এবং তার অস্তিত্ব তার নিজ থেকেই উদ্ভূত হবে। অথবা সে রকম হবে না; বরং তার অস্তিত্ব হবে অন্য কারোর কাছ থেকে লব্ধ। এর তৃতীয় কোন অবস্থা হতে পারে না।

আর যে জিনিস নিজ থেকে বা স্বতঃ অস্তিত্বশীল নয়, তা তার অস্তিত্ব লাভে ও আত্মপ্রকাশে এমন একটি 'কারণ' علة এর মুখাপেক্ষী যা তাকে অস্তিত্বদান করবে। এ কথাটি এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে, এ ব্যাপারে সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধির লোকেরও কোন সংশয় থাকতে পারে না।

এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, এই আসমান-যমীন ও মানুষ—এবং যা কিছু বর্তমান, হয় তার অস্তিত্ব স্বতঃউদ্ভূত বা 'স্বয়ম্ভু' হবে এমনভাবে যে, তার বাহ্যিক অস্তিত্ব লাভে তা অপর কারোর মুখাপেক্ষী হবে না, অর্থাৎ তা অপর কোন কিছুর معلوم —কার্য, (affect) হবেন; বরং তার সত্তা নিজস্বভাবেই উদ্ভূত হবে। ...অথবা হবে এর বিপরীত।

প্রথমোক্ত অবস্থা যদি হয়—যাতে আমরা 'ওয়াজিব'-এর স্বতঃই মওজুদ হওয়ার কথা মেনে নিয়েছি'—তার অস্তিত্ব স্বতোদ্ভূত হবে, অন্য কারোর দ্বারা প্রাপ্ত হবে না। স্বতঃসচ্ছন্দ হবে, মুখাপেক্ষী হবে না, তার অস্তিত্বের অন্য কিছু থেকে উৎপন্ন বা উপার্জিত কিংবা লব্ধ হবে না।

আর দ্বিতীয়োক্ত অবস্থা হলে জিনিসসমূহের অস্তিত্ব হবে অন্য কারোর দান। সেই 'অন্য কারোর' বলতে যাকে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, সে কি 'ওয়াজিবুল অজুদ' হবে? ... এটা একটা জরুরী প্রশ্ন। যদি হয়, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই 'তিনি' হবেন, যাঁর নাম দিয়েছি 'আল্লাহ্'।

এভাবে যুক্তি উপস্থাপনকে 'সিদ্দীকগণের' পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা এতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অপরিহার্য প্রমাণ করা হয়েছে তাঁর নিজের দ্বারাই; সেজন্য অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করা হয়নি। এ পদ্ধতিতে

বিশ্বব্যবস্থাকে কিংবা সৃষ্টিলোকের অস্তিত্বের ভিত্তিতে 'স্রষ্টা'কে প্রমাণ করতে চাওয়া হয়নি অর্থাৎ এ প্রমাণ পদ্ধতিটি inferance পদ্ধতি নয়।

এ আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দানের লক্ষ্যে দুটি নির্দিষ্ট বিবেচ্য বিষয়ের (point) উল্লেখ আবশ্যাক মনে করছিঃ

১. উপরোক্ত যুক্তি পদ্ধতিতে 'দাওর'—'আবর্তন' ও 'তাসল্সুল'— 'ধারা-বাহিকতা' এই দুইটি যুক্তি পদ্ধতি বাতিল বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অনেকেই এই দুইটি পরিভাষার তাৎপর্য বুঝে না বলে এখানে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

(ক) 'দাওর' বা 'আবর্তন' বলতে বোঝায়ঃ 'আমরা ধরে নিচ্ছি, ক ও খ নামের দুটি বস্তু আছে। সেই সাথে এ-ও ধরে নিচ্ছি যে, এ দুটির প্রত্যেকটি অপরটির অস্তিত্বের কারণ علة -

এক্ষণে যদি ধরে নেই যে, 'ক'-এর অস্তিত্ব 'খ'-এর উপর নির্ভরশীল এ অর্থে যে, 'খ' আগেই অস্তিত্বশীল হবে, যেন তা 'ক' কে অস্তিত্ব দিতে পারে।

অতঃপর যখন দেখবে যে, 'খ'-এর অস্তিত্ব 'ক'-এর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল এ অর্থে যে, 'ক' তার পূর্বে অস্তিত্বমান হবে, তবেই তো তা 'খ' কে অস্তিত্ব দিতে পারবে।

একথা স্পষ্ট যে, এইরূপ মনে করা মূলতই ভুল। কেননা তার অর্থ দাঁড়ায় এ দুটি জিনিসের প্রত্যেকটির অস্তিত্ব অপরটির অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। একটির অস্তিত্ব অপরটির পূর্বে না হলে সেটি অস্তিত্বশীল হতে পারে না। এই কথা উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। কেননা এ দুটির প্রত্যেকটির বাস্তবতা অপরটির বাস্তবতার পূর্ব শর্ত। এই ধরনের কথা কখনই সত্য হতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে।

মনে করা যেতে পারে, দুইজন ব্যক্তি একটি বোঝা একসাথে বহন করে নেয়ার সিদ্ধান্ত করল। কিন্তু উভয়ের প্রত্যেকেই শর্ত আরোপ করেছে যে, সেই জিনিসের একটি দিক সে ধরবে তখন, যদি তার পূর্বে অপর ব্যক্তি জিনিসটির অপর দিকটি ধরে।.... এরূপ শর্তারোপের ফলে শেষ পর্যন্ত জিনিসটি যে ধরা হবে না ও এক সাথে বহনও করা হবে না তা স্পষ্ট।

বস্তু জগতের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে যদি এই রূপ মনে করা হয় যে, দুইটি ঘটনার প্রত্যেকটি অপরটির পূর্বে-অস্তিত্বমান হওয়া অনিবার্য শর্ত, তাহলে শেষ পর্যন্ত এ দুটি ঘটনার কোন একটিও ঘটবে না।

ঠিক এ কারণে যুক্তি বিন্যাসের এই পদ্ধতিটি দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত।

(খ) 'তাসাল্‌সুল্' (تسلسل) হচ্ছে কারণ ও কার্যের অর্থহীন ধারাবাহিকতা, যা কোন একটি বিন্দুতে এসে শেষ হয় না। এই পদ্ধতিও বাতিল। কেননা যদি মনে করা হয় যে, সর্বশেষ ঘটনাটি তার পূর্ববর্তী ঘটনার কার্য; আর পূর্ববর্তী ঘটনাটিও কার্য তার পূর্ববর্তী ঘটনার, তাহলে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে তা শেষ হতে পারবে না। ফলে এক অসম্ভব অবস্থার উদ্ভব হবে। পূর্বে দেয়া দৃষ্টান্তটির আলোকেই বলা যায়, সেই দুই ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তি বললে, আমি এ জিনিসটি বহন করব, যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন, আমাকে সাহায্য করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, হ্যাঁ, আমিও বহন করব যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি আমার সাহায্য করে। তৃতীয় ব্যক্তি বললে, আমি সাহায্য করব যদি চতুর্থ কোন ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করে। এভাবে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যক্তিও বলল। তাহলে এরূপ শর্তের কোথাও শেষ হবার নয়। আর তার-ও পরিণামে সে জিনিসটি যে আদৌ বহন করা হবে না,তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই এই পদ্ধতিও বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের নিকট পরিত্যাক্ত।

২. পূর্বে এ পর্যায়ে যে আয়াত কয়টির উল্লেখ করা হয়েছে, তার তাৎপর্যের সাথে এই যুক্তি পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব। সম্ভব এভাবে যে, আমরা যদি মূল 'অস্তিত্ব' (وجود) সম্পর্কে বিবেচনা করি সূক্ষ্মভাবে, তাহলেই আমরা আল্লাহ্‌র সন্ধান পেতে পারি। আয়াতের শেষাংশ 'নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষ সাক্ষী' উক্ত তাৎপর্য তুলে ধরে। অর্থাৎ তিনি সব কিছুর উপর সাক্ষী। এমন কি তাঁর নিজের—নিজ সত্তার উপর-ও। অথবা তিনি সাধারণভাবে সব জিনিসের জন্য এবং বিশেষভাবে অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তাশীল প্রত্যেকটি মানুষের জন্যই مشهود পর্যবেক্ষিত বা সাক্ষ্য বিষয়।

যেমন বলা যায়, আল্লাহ্ তাঁর একত্বের উপর সাক্ষী। তাঁর সাক্ষ্য তাঁর অস্তিত্বের উপর। তাঁর অর্থ, এ মহাসত্য পর্যন্ত পৌঁছার জন্য আমরা মূল অস্তিত্বই বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণ করব। মূল অস্তিত্বই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিবে।

কিন্তু তাঁর একত্ব সম্পর্কিত সাক্ষ্য কিভাবে সম্ভব?... সে বিষয়ে আল্লাহ্‌র 'যাত'-এর তওহীদ সংক্রান্ত আলোচনায় বিশদভাবে আলোচিত হবে।

এ আলোচনার শুরুতে উদ্ধৃত সূরা 'আন্-নূর'-এর আয়াতটির সাথে এ আলোচনার সম্পর্ক পর্যায়ে বলতে হয়, 'আল্লাহ্ আসমান-যমীনের 'নূর'-এর তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ হচ্ছে এই জগতের বাস্তবতা। তিনিই হচ্ছেন এই বাস্তবতার উদ্‌গাতা। 'আসামন-যমীনের নূর' অর্থ আসমান-যমীনের অস্তিত্বে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

অবশ্য এরূপ অর্থ করা কুরআনের চার দিগন্তের একটি। তা তার বাহ্যিক তাফসীর নয়। তবে একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কুরআন পারদর্শী মওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী উক্ত আয়াতের তাফসীর পর্যায়ে যা লিখেছেন, তা থেকে বিষয়টি অধিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। আমরা তা এখানে উল্লেখ করছি। তিনি লিখেছেনঃ

'আসমানসমূহ ও যমীন' বলতে কুরআনে সাধারণত সমগ্র সৃষ্টিলোক **বিশ্বলোক বোঝায়।** তাহলে আয়াতাংশের অর্থ হবে, আল্লাহ্ সারে জাহানের **'নূর' বা 'আলো'।**

'নূর' হচ্ছে সেই জিনিস যার কারণে বস্তুসমূহের প্রকাশ ঘটে অর্থাৎ যা স্বতঃই প্রকাশমান ও অন্যান্য জিনিস প্রকাশকারী। সাধারণত মানুষ **'নূর'** বা 'আলো' বলতে তা-ই বুঝে থাকে। কিছুই বোধগম্য না হওয়ার অবস্থাকে মানুষ বলে অন্ধকার। পক্ষান্তরে সবকিছুই বোধগম্য ও সবকিছু প্রকাশমান হলে বলা হয়, আলো হয়েছে। আল্লাহ্কে 'নূর' বলা এই মৌলিক তাৎপর্যের দৃষ্টিতেই প্রযোজ্য। এ অর্থে নিশ্চয়ই নয় যে, তিনি বুঝি সেই আলো, যার গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল এবং যা আমাদের চোখের পর্দার উপর পড়ে দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রকে প্রভাবিত করে। **(তাফহীমুল কুরআন-সূরা আন্-নূর, টীকা ৬২)**

দ্বাদশ দলীল

বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহ্‌র নিদর্শন

বিশ্বপ্রকৃতি ও সৃষ্টিকর্মে আল্লাহ্‌র যে নিদর্শনসমূহ বিরাজমান, তার উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করা, সে বিষয়ে গভীর সূক্ষ্মভাবে চিন্তা গবেষণা করার জন্য কুরআন মজীদ আমাদের প্রতি বারবার আহবান জানিয়েছে। কুরআনের ভাষায় এই চিন্তা-গবেষণার কাজ বুদ্ধিমান বিবেকবান, সুস্থ জ্ঞান ও জাগ্রত মন-মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যই শোভনীয়।

এ পর্যায়ের কুরআনী আয়াতসমূহ অগণিত। এখানে আমরা তার সামান্যই উদ্ধৃত করার ও তার ভিত্তিতে আলোচনা পেশ করার অবকাশ পাব। নমুনাস্বরূপ মাত্র কয়েকটি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করছি।

একটি আয়াত যা পূর্বেও উদ্ধৃত হয়েছে—এ পর্যায়ে উল্লেখ্যঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ*

(البقرة:١٦٤)

(মহান আল্লাহ্ অস্তিত্বের নিদর্শনের প্রয়োজন) আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্র-দিনের আবর্তনে, মানুষের জন্য উপকারী দ্রব্যাদি লয়ে নদী-সমুদ্রে ভাসমান-চলমান যানসমূহে, উপর থেকে বৃষ্টি পতনে ও তার সাহায্যে মৃত জমিকে পুনরুজ্জীবিতকরণে, সকল প্রকারের প্রাণশীলের বিস্তার সাধনে, বায়ুর প্রবাহ ও দিক পরিবর্তন এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে নিয়ন্ত্রিত থাকা মেঘমালায় সুস্থ বিবেক ও চিন্তাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অসংখ্য নির্দশন বিদ্যমান।

এ আয়াত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করার আহবান জানাচ্ছেঃ

১. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সমন্বিত গোটা জগত সম্পর্কে এবং রাত ও দিনের আবর্তন পর্যায়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

২. নৌ-নির্মাণ শিল্প এবং তার অর্থনৈতিক কল্যাণ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

৩. মহাশূন্য জগত—বায়ু, মেঘমালা, বৃষ্টি ও গোটা সৌরলোক। এ সবের গড়ে উঠার কারণসমূহ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা।

৪. পৃথিবীর বুকে অবস্থানরত জীব-জন্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা, এই চিন্তা-ভাবনাই জীববিজ্ঞান বা প্রাণী বিজ্ঞানের ভিত্তি।

এই চারটি পর্যায়েই গভীর চিন্তা গবেষণা পরিচালনার ফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্বানুশীলনের একটা দীর্ঘ ধারা প্রবাহিত হতে পারে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিস্ময়কর বিশ্ব প্রাকৃতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার আহবান জানিয়ে আমাদেরকে কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়? এ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আমরা কি তার স্রষ্টা উদ্ভাবক এবং তাঁর কুদরত ও গুণাবলীর সন্ধান লাভ করতে পারব? অথবা তার লক্ষ্য তৃতীয় কোন জিনিস? আর তা কি এই যে, তার সন্ধান পেয়ে, নিঃসন্দেহে জানতে পেরে যে, এক আল্লাহ্ই হচ্ছে এই গোটা বিশ্বলোকের একক স্রষ্টা, আমরা তাঁর ইবাদতে তওহীদবাদী হব?... তা যদি হয়, তবেই আয়াতটি মূলত তওহীদী ইবাদত—কিংবা ইবাদতে তওহীদের আহবান হয়ে দাঁড়াবে?

এ সব সম্ভাবনা কেবলমাত্র উপরোদ্ধৃত আয়াতদ্বয়েই নেই। বরং যেসব আয়াত বিশ্বব্যবস্থা এবং বিশ্ব প্রকৃতিতে সদা কার্যকর আল্লাহ্র কুদরতের প্রতি ইশারা করে, সেই সব আয়াতেই তা নিহিত রয়েছে। এ পর্যায়ের আর একটি আয়াত হচ্ছেঃ

وَهُوَ الَّذِى مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ * (الرعد: ٣)

আর তিনিই এ যমীনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। তাতে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে দিয়েছেন ও নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। তিনিই সমস্ত ফল-ফলাদির জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনের উপর রাতকে প্রবর্তিত করেছেন। এই সমস্ত

ঘটনাতেই বড় বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত।

এ আয়াতটি কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তা-বিবেচনা করার আহবান জানায়। আর একথা স্পষ্ট যে, এসব চিন্তা-বিবেচনায় বিভিন্ন ও বিচিত্র ফল হতে পারে।

বিষয়গুলি হচ্ছেঃ

১. পৃথিবী কি করে বিস্তীর্ণ ও বিশাল হল?

২. পৃথিবীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ পাহাড়-পর্বত এবং খাল-নদী-সমুদ্র কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

৩. জোড়ায় জোড়ায় ফল কিভাবে সৃষ্টি হলো?

৪. রাত ও দিনের পার্থক্য কি করে হয়?

এই চারটি বিষয়েই চিন্তা-গবেষণা করা হলে যেমন আল্লাহ্র অস্তিত্ব জানতে পারা যাবে, তেমনি আল্লাহ্র ইল্‌ম ও কুদরতের সাথেও আমাদের পরিচয় ঘটবে। এই বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপক-পরিচালক যে এক আল্লাহ্, তা-ও নিঃসন্দেহে জানা যাবে।

কেননা বিশ্ব ব্যবস্থার ঐক্য ও অভিন্নতা এবং তার প্রতিটি অংশের সাথে অপর অংশের নিবিড়, দৃঢ় ও ওতপ্রোত সংযোগ-সম্পর্ক অকাট্যভাবে প্রমাণ করবে যে, এই গোটা বিশ্বলোকের উপর একই সার্বভৌম ইচ্ছা সদা কার্যকর হয়ে আছে। তা না হলে—এখানে একাধিক কর্তার কর্তৃত্ব চললে সর্বত্র চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা এবং মারাত্মক বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়ত।

মূল শক্তি কেন্দ্রের সাথে এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিচালকের সাথে পরিচিতি লাভ হলেই আমাদের ঘুমন্ত বিবেক জেগে উঠবে এবং পরে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং বিশ্বলোকের আসল পরিচালকের ইবাদতে উদ্বুদ্ধ হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ وَّنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ* (الرعد: ٤)

আর লক্ষ্য কর, যমীনে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল রয়েছে, যা মূলত পরস্পর মিলিত। আঙুরের বাগান রয়েছে, ক্ষেত-খামার রয়েছে, খেজুরের গাছ রয়েছে, তার

কিছু গাছ একহারা এবং কিছু দ্বৈত। অথচ এই সবই একই পানি দিয়ে সেচ হয়। কিন্তু স্বাদের দিক দিয়ে আমরা কিছুকে উত্তম বানিয়ে দেই, আর কিছু তুলনামূলকভাবে কম। এই সব জিনিসেই অসংখ্য নিদর্শন বিরাজমান তাদের জন্য, যারা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগায়।

এ আয়াতে নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলি গভীরভাবে বিবেচনার দাবি রাখেঃ

১. যমীন পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও কিছু যমীন চাষাবাদযোগ্য; কিছু চাষাবাদযোগ্য নয়। কিছু উর্বর, কিছু অনুর্বর। ...কিন্তু এর কারণ কি?

২. বহু ক্ষেতে ও বাগ-বাগিচায় বিভিন্ন ও রকম-বেরকমের ফল ধরে। কোন কোন গাছে আঙুরের গুচ্ছ, আবার কোন কোন গাছে খেজুরের ছড়া। ধান ও গমের ছাড়ও দেখা যায়। গাছ যেমন বিভিন্ন, ফল ও ফসলও তেমনি বিভিন্ন ও বিচিত্র।

কিন্তু এই বিভিন্নতা, বর্ণে বর্ণে এই পার্থক্য কেন? মাটি তো একই, যে পানি শুঁষে গাছগুলি জীবিত ও সতেজ থাকে, সেই পানিতেও তো কোন পার্থক্য নেই। একই সূর্যরশ্মি সূর্যতাপ সব কিছুর উপর পড়ে সমান মানে ও পরিমাণে। এলাকার দিক দিয়েও পার্থক্য নেই। পরিবেশ-প্রেক্ষিতেও কোন বিভিন্নতা লক্ষ্যভূত নয়। তাহলে ফল ও ফসলে বর্ণে ও স্বাদে এত পার্থক্য কেন?

৩. একই বাগানে নানা ধরনের ফল ফলে। তবে প্রকারে ও উত্তমতায় এত তারতম্য।... কেন?

এসব বিষয়ে যতই চিন্তা-ভাবনা করা ও গবেষণা চালানো হবে, ততই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব লাভ সম্ভব হবেঃ

(ক) সর্বোত্তম যমীনের কারণে স্বাভাবিক ক্ষেত্র হিসেবে তৈরী বাগানসমূহের সৌন্দর্যমণ্ডিত দৃশ্যাবলী এক মহা কর্মী স্রষ্টার সন্ধান দেয়, যিনি তাঁর প্রচ্ছন্ন ব্রাশ বা তুলি দিয়ে চাক্‌চিক্যময় সতেজ-সবুজ বাগান সমূহের পৃষ্ঠায় এই চিত্তহারী নক্‌শাসমূহ অংকিত করেছেন।

(খ) অতীব পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্যময় এই নক্‌শা ও মন ভোলানো এই অপূর্ব দৃশ্যাবলী নিঃসন্দেহে উদ্‌ঘাটিত করে এ সবের শিল্পীর জ্ঞানের সূক্ষ্মতা ও শক্তি-ক্ষমতার নিরংকুশ গভীরতা ব্যাপকতা ও অসীমতা।

(গ) বস্তুত এই চূড়ান্ত মাত্রার সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের শিল্প কর্ম, এই সব পটভূমি ও মনোহর দৃশ্যাবলীর প্রকৃত নির্মাতা হচ্ছেন মহান আল্লাহ্। তিনি নিজেই নিজ ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী এ সকল সৃষ্টি করেছেন। তাহলে এই

পরিবেশ বেষ্টিত মানুষ সেই এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে না কেন? ... তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর ইবাদত করবে কোন্ কারণে? ... তিনি ছাড়া সেই অন্য কেউ স্রষ্টাও নয়, ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রক-ও নয়।

বস্তুত বিস্ময়কর বিশ্বব্যবস্থা ও সমগ্র প্রাকৃতিক জগতে আল্লাহ্‌র চালু থাকা নিয়মাদি অপরিবর্তনীয়, পার্থক্য বা ব্যতিক্রমহীন। কুরআন মজীদে এই পর্যায়ে আয়াত অসংখ্য। সেই সব আয়াত একত্রিত করে এক-দুই-তিন পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করাও সম্ভব নয়। তাই নমুনাস্বরূপ আরও কতিপয় আয়াত আমরা এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ * وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ * وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ * وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ* وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ* وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ* (الروم: ٢٠-٢٥)

তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা সহসা মানুষ হয়ে উঠে (যমীনের) সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে। তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এ-ও (একটি) যে, তিনি তোমাদেরই স্বজাতীয়দের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহৃদয়তা প্রীতি প্রেম জাগিয়ে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে বিপুল নির্দশন নিহিত রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

আর তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশ মণ্ডল ও যমীনের সৃষ্টি, তোমাদের ভাষাসমূহ ও তোমাদের বর্ণের পার্থক্য। বস্তুত এতে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাত ও দিনের বেলায় নিদ্রা যাওয়া এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করা। বস্তুত এত বিপুল নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা মনোযোগ সহকারে (সব কথা) শুনে। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এও যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুতের চমক দেখিয়ে থাকেন ভয় ও আশা বাসনা স্বরূপ। আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। পরে তার সাহায্যে যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এতে অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান সেই লোকদের জন্য, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। তাঁর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে এ-ও রয়েছে যে, আসমান ও যমীন তাঁরই হুকুমে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পরে যখনই তিনি তোমাদেরকে যমীন থেকে আহবান করবেন—শুধুমাত্র একটি বারের আহবানেই সহসা তোমরা বের হয়ে আসবে।

কোন সন্দেহ নেই, এই আয়াতসমূহ এমন সূক্ষ্ম ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্বসমূহ উপস্থাপিত করেছে, যা মানুষের হৃদয়ানুভূতিকে জাগ্রত করে এবং আল্লাহ্‌র মহান গুনাবলীর দিকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করে। তীব্রভাবে তাকীদ করে যে, এক আল্লাহ্‌ই সারে জাহানের মালিক ও মুনিব, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যবস্থাপক ও মহান দয়াময়।

সূরা 'আন-নাহ্‌ল'-এও অনুরূপ আয়াতসমূহের একটি সমষ্টি রয়েছে, যা বিস্ময়কর বিশ্বব্যবস্থা-ও তা থেকে মানুষের ব্যাপক কল্যাণ লাভের কথা স্পষ্ট করে তোলে। সে আয়াত সমষ্টি এইঃ

هُوَ الَّذِيٓ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمۡ مِّنۡهُ شَرَابٌ وَّمِنۡهُ شَجَرٌ فِيۡهِ تُسِيۡمُوۡنَ* يُنۡۢبِتُ لَكُمۡ بِهِ الزَّرۡعَ وَالزَّيۡتُوۡنَ وَالنَّخِيۡلَ وَالۡاَعۡنَابَ وَمِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ* وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ وَالنُّجُوۡمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمۡرِهٖ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّعۡقِلُوۡنَ* وَمَا ذَرَاَ لَكُمۡ فِي الۡاَرۡضِ مُخۡتَلِفًا اَلۡوَانُهٗ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ

يَذَّكَّرُونَ * وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَّسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ * (النحل: ١٠-١٦)

তিনিই আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডল থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করিয়েছেন, যা থেকে তোমরা নিজেরাও সিক্ত-পরিতৃপ্ত হও, আর তোমাদের জন্তু-জানোয়ারগুলির জন্য খাদ্যও উৎপাদিত হয়। তিনি এ পানির সাহায্যে ক্ষেতে ফসল ফলান এবং যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য নানাবিধ ফল পয়দা করেন। এইসবে একটি বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত। তিনিই তোমাদের কল্যাণের জন্য রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন। আর সব তারকাও তাঁরই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। এতে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে। আর এই বহু সংখ্যক রঙ-বেরঙের দ্রব্যাদি তোমাদের জন্য যমীনে সৃষ্টি করে রেখেছেন। এতেও অবশ্যই নিদর্শন নিহিত রয়েছে তাদের জন্য, যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তিনিই যিনি তোমাদের জন্য নদী-সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, যেন তোমরা তা থেকে নতুন-তাজা গোশ্‌ত আহরণ করে খেতে পার এবং তা থেকেই সৌন্দর্য-শোভার এমন সব জিনিস তোমরা বের করে নিবে যা তোমরা পরিধান করবে। তোমরা দেখছ, নৌকা-জাহাজ নদী সমুদ্রের বুক দীর্ণ করে চলাচল করছে। এই সব কিছু এ জন্য যে, তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ সন্ধান করে নিবে এবং তাঁর কৃতজ্ঞ থাকবে। তিনিই যমীনের বুকে পর্বতের লঙ্গরসমূহ গভীরভাবে গেড়ে দিয়েছেন, যেন যমীন তোমাদেরকে লয়ে হেলতে-দুলতে না পারে। তিনি নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং স্বাভাবিক পথও বানিয়ে দিয়েছেন, যেন তোমরা পথের সন্ধান পেয়ে লক্ষ্য পথে চলতে পার। যিনি যমীনে পথ দেখাবার জন্য নিদর্শনসমূহ সংস্থাপন করে রেখেছেন। আর তারকার সাহায্যেও লোকেরা পথের সন্ধান পেয়ে থাকে।

এক সাথে এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের উল্লেখ করে এর ফলাফল হিসেবে কুরআন প্রশ্ন তুলেছেঃ

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (النحل: ١٧)

যিনি নিজ কুদরতে সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মত হতে পারেন, যার সৃষ্টিকর্ম বলতে কিছুই নেই?

এই শেষোক্ত আয়াতটি স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার দিকে আহবান জানোনো। কেননা তদানীন্তন আরবের মুশরিক লোকেরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা, ব্যবস্থাপক, নিয়ন্ত্রক জেনেও বহু কৃত্রিমভাবে গৃহীত দেবতার আরাধনা ও উপাসনা করত। এই কারণে তাদের অচেতন মন-মানসিকতাকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে বিশ্বপ্রকৃতিতে সদা কার্যকর আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রপঞ্চ (phenomenon) এই লোকদের সম্মুখে উদঘাটিত করেছেন। যেন তারা এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠে যে, ইবাদত বলতে যা কিছু তা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর জন্যই হতে পারে না। সেই এক আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আর যার ইবাদত করা হবে, তা হবে নিতান্তই অর্থহীন। কেননা ওরা তো অক্ষম-অপদার্থ, না পারে কারোর একবিন্দু কল্যাণ করতে, না ক্ষতি করতে।

জটিল বিশ্বব্যাবস্থার কথা উল্লেখ করার আর একটি উদ্দেশ্য হতে পারে পরকালের বিষয়টিকে সম্মুখে নিয়ে আসা ও সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। পরকাল হচ্ছে জীবনের বর্তমান পর্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী পর্যায়। কুরআন চায়, মানুষ যেন তাকে অসম্ভব মনে না করে, তাকে অবিশ্বাস, অস্বীকার না করে। কেননা বর্তমান বিশ্বলোকে সর্বাত্মকভাবে কার্যকর আল্লাহ্‌র কুদরত ও নিদর্শনাদি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে পরকালের বাস্তবতা। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা শেষ পর্যায়ে বলেছেনঃ

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ (الروم: ٢٥)

অতঃপর যখনই তোমাদেরকে যমীন থেকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সহসাই বের হয়ে আসবে।

এর ভিত্তিতে বললে বলতে হয়, এসব আয়াত আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের দলীল হতে পারে আনুসঙ্গিকভাবে—প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে নয়। তা-ই আয়াতসমূহের আসল বক্তব্য নয়। কেননা এই বিশ্বলোকের ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সূক্ষ্ম ও স্থুল সব জিনিসই যখন আল্লাহ্ তা'আলার ইলম ও কুদরতের সাক্ষ্য দেয়, আর তার মাধ্যমে যখন আমরা আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য ও পূর্ণত্বের অকাট্য প্রমাণ পেয়ে যাই,

তখন তা আমাদেরকে আল্লাহ্র মৌল সত্তার সন্ধান দান করে নিঃসন্দেহভাবে এবং আমাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, মা'বুদ কেবলমাত্র তিনিই, তিনি ছাড়া আর কেউ মা'বুদ নয়, হতে পারে না। আর তিনি একাই মানুষের নিকট ইবাদত পাওয়ার ন্যায্য অধিকারী।

আল্লাহ্র পরিচিতি লাভের যে পন্থা সকল শ্রেণীর মন-মানসিকতার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন, তা হচ্ছে বিস্ময়কর সূক্ষ্ম-জটিল বিশ্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা। তাই তার অবস্থিতির মুখ উদাত্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিচ্ছে আল্লাহ্র অস্তিত্বের, একত্বের, এককত্বের এবং তাঁর মহান উচ্চ অন্যান্য গুণাবলীর।

وَفِىْ كُلِّ شَىْءٍ اٰيَةٌ * تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهٗ وَاحِدٌ

প্রত্যেকটি জিনিসেই নিদর্শন রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ এক।

ত্রয়োদশ দলীল

জীবজগতে আল্লাহ্‌র হিদায়ত

رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰی (طه: ٥٠)

আমাদের রব্ব তিনিই যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, পরে তাকে হিদায়ত দান করেছেন।

কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌র পরিচিতির জন্য যেসব দলীল উপস্থাপিত করেছে, তার মধ্যে তাঁর হিদায়ত দান অন্যতম, যা সমগ্র সৃষ্টিলোকব্যাপী কার্যকর হয়ে আছে। জীবসমূহ সে হিদায়ত লাভ করে জীবন ধারণের পন্থা জানতে পারে, যার জন্য যা কল্যাণকর, তা তা-ই অবলম্বন করে সেই হিদায়তের পথ-নির্দেশের আলোকে।

ফিরাউন মূসা ইবনে ইমরান (আ)-এর নিকট তাঁর রব্ব সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। তার জবাবে তিনি উপরোক্ত আয়াতের কথা দিয়ে আল্লাহ্‌র পরিচিতি পেশ করেছিলেন। জীব-জন্তু যে জীবন-পন্থা জানতে পারে, সেই পন্থায়ই বেঁচে থাকা সে সবের পক্ষে সম্ভব। সেজন্য কোন শিক্ষকের প্রয়োজন পড়ে না। উত্তরাধিকারসূত্রে সে জ্ঞান লাভের-ও কোন অপেক্ষা নেই। আল্লাহ্‌র এই হিদায়ত অনুসরণ করেই তারা বেঁচে থাকে, স্থিতি পায়। লক্ষ্য পানে এমনভাবে চলতে থাকে যে, কোথাও একবিন্দু ভুল করে না।

প্রাণীকুলের প্রকৃতি ও সৃষ্টি মেজাজের সাথে সামঞ্জস্য সম্পন্ন হিদায়ত লাভ কখনই উত্তরাধিকারসূত্রে হতে পারে না। তা হতে পারে না স্বজ্ঞার (Instinct) দ্বারাও। উত্তরাধিকারসূত্র হতে পারে না এজন্য যে, জ্ঞান-তথ্যসমূহ এই পন্থায় একজন থেকে অন্যজন পর্যন্ত হস্তান্তরিত হওয়া অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা সম্ভব নয়। যদি তা সম্ভব হতো, তাহলে ডাক্তারের ছেলে উত্তাধিকারসূত্রেই ডাক্তার, আলেমের ছেলে উত্তরাধিকারসূত্রেই বড় আলেম হয়ে যেত-চিকিৎসাবিদ্যা বা ইল্‌ম অর্জন না করেই।

কিন্তু প্রাণীকুল যা করে তা নিশ্চয়ই নিছক সহজাত প্রবণতার বলে বা চিন্তা-ভাবনা না করে হঠাৎ কোন কাজ (Impulse) করতে পারে না। কেননা স্বজ্ঞা যাচাই-বাচাই করে অগ্রসর হয় না। এসব প্রাণী বিভিন্ন পথের সম্মুখীন হয়ে তার মধ্য থেকে একটি মাত্র পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়তের

সাহায্যে মাত্র। কুরআন মজীদে এই হিদায়তের নামকরণ করা হয়েছে ওহী (الوحى) কেউ কেউ আবার তার নাম দিয়েছেন 'ইলহাম' (الهـام)।[১]

এই পর্যায়ে সূরা 'আন-নাহল'-এর একটি আয়াত উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ* ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ* (النحل: ٦٨-٦٩)

আর লক্ষ্য কর, তোমার রব্ব মধু মক্ষিকার প্রতি এই কথা ওহী করেছেন যে, পাহাড়ে-পর্বতে (যে কোন উচ্চ স্থানে), গাছে ও উপরে ছড়ানো লতা-পাতায় নিজেদের চাক নির্মাণ কর। আর সব রকমের ফলের রস চুষে নাও এবং তোমার রব্ব-এর নির্ধারিত পথে চলতে থাক। এই মক্ষিকার পেট থেকে রঙ-বে-রঙের শরবত বের হয়, তাতে লোকদের জন্য রয়েছে পূর্ণ মাত্রায় নিরাময়তা। নিশ্চয়ই তাতেও একটি নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

বস্তুত মৌমাছি মধুর ন্যায় অতীব উত্তম সুমিষ্ট অতীব কল্যাণময় ও সুস্বাদু দ্রব্য—মধু—তৈরি করে; আল্লাহ্‌র নির্দেশেই তার শুধু তৈরীর কর্ম শুরু হয়, সেজন্য তাকে কোন কষ্ট বা শ্রম করতে হয় না। পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধতার মাধ্যমে অত্যন্ত সূক্ষ্ম মেধার ব্যবহারে এ কাজ সম্ভব হয়ে থাকে। তা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বাছাই করে উত্তম ফুলসমূহ নির্ধারণ করে, তার উপর বসে তার ভেতরের রসটুকু চুষে তুলে নেয়। এ এক পরম বিস্ময়কর ব্যাপার, সন্দেহ নেই। তার পরে মানুষের জন্য অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পবিত্র মধু প্রস্তুত করে।

মৌমাছি একটা চাকের মত মধু বানাবার কারখানা নির্মাণ করে। এর নির্মাণ কৌশল ও পদ্ধতিতে একবিন্দু ভুল হয় না। প্রতিটি খোপ আলাদা করা হয় এক সূক্ষ্ম প্রাচীরের সাহায্যে। তা বেশী হয় না, কমও হয় না। তাতে পরিচয় পাওয়া যায় এক সূক্ষ্ম প্রকৌশল বিদ্যার। মৌমাছিরা ফুলের রস আহরণের পূর্বে উপযুক্ত ফুলসমূহ তালাশ করে করে বাছাই করে। এ ব্যাপারে ওদের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর ও নির্ভুল। এ কাজ মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হতে পারছে কেবলমাত্র

১. العلم يدعو للايمان-كرسى موريسن ص ١١٦

এজন্য যে, একজন সূক্ষ্মদর্শী উচ্চতর মেধার অধিকারীর পথ প্রদর্শন পাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। তাদের প্রতি উচ্চতর জগত থেকে 'ওহী'র মাধ্যমে এই পথ প্রদর্শন কার্য সম্পাদিত হয়। তাদের কাজে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা উদ্যম বা বাছাই কোন কিছুই থাকে না, অন্য কেউ অদৃশ্য থেকে নির্দেশ দিয়ে দিয়ে ওদের দ্বারা কাজ করায়। এই কথাগুলো গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলেই কুরআনের আয়াতাংশঃ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ 'এবং তোমার রব্ব মৌমাছির প্রতি 'ওহী' করলেন—এর নিগূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

মৌমাছিদের এই বিস্ময়কর কার্য-তৎপরতা পর্যায়ে বিজ্ঞানী ক্রেসী মরিসন যা লিখেছেন, তার সার কথা হচ্ছেঃ

মধু তৈরী করার খামার এই কর্মচারীরা নানা আকারের গুহা তৈরি করে মধুচক্রের মধ্যে। বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই ওদের দ্বারা এ কাজটা করানো হয়। ক্ষুদ্রায়তন গুহাগুলি 'কর্মচারী'দের জন্য নির্মিত হয়। আর বড় বড় গুহা পুরুষ মৌমাছির জন্য নির্দিষ্ট থাকে। গর্ভবতী রানী মৌমাছিগুলির জন্য বিশেষ কক্ষ তৈরি হয়। আর রানী মক্ষিকা পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট গর্তগুলিতে অনুর্বরই ডিম্ব ছাড়ে। অপেক্ষমান রানী মৌমাছিও স্ত্রী কর্মচারীদের জন্য তৈরি গর্ত সমূহে ছাড়ে উর্বর ডিম্ব।

মধ্যম শ্রেণীর কর্মচারী মেয়ে-মৌমাছি নতুন উচ্চস্থানের সন্ধানে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর ছোট ছোট মৌমাছির জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে মধু চিবিয়ে দিয়ে এভাবে তা সেগুলির জন্য হজম করে দেয়। পরে এই চিবানোর কাজ থেকে সেগুলি আলাদা হয়ে যায়। পুরুষ ও মেয়ে মৌমাছির বিবর্তনে একটা নির্দিষ্ট স্তরে হজমের প্রাথমিক কাজও শেষ হয়ে যায়। তখন মধুই হয় তাদের একমাত্র খাদ্য। এই অবস্থায় যে সব নারী মাছি প্রবেশ করে, পরবর্তীতে ওরাই হয় কর্মচারী।

যেসব স্ত্রী মৌমাছি রানীর গুহাসমূহে থাকে, তাদের কাজ হিসেবে স্থায়ী থাকে চিবিয়ে খাদ্য খাওয়ানো ও হজমের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করা। যারা এই বিশেষ কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে, ওরা মৌ-রানীগণের সন্নিকটে চলে যায়। কেবল ওরাই উর্বর ডিম্ব ছাড়ে। আর এই উৎপাদনের বারবারের কার্যক্রম বিশেষ গুহাতে বিশেষ ডিম্ব ছাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, খাদ্য পরিবর্তনের জন্য বিস্ময়কর প্রক্রিয়া চলে। এজন্যে যথেষ্ট অপেক্ষা করতে হয়, পার্থক্য করে অগ্রসর হতে হয় এবং খাদ্যের প্রক্রিয়ার উন্মোচনে সামঞ্জস্য স্থাপন করারও প্রয়োজন হয়।[১]

---

১. العلم يدعو للإيمان كريسي موريسن ص: ١١٤-١١٨

তাঁর গ্রন্থের অপর একস্থানে মৌমাছি সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ

মৌমাছি তার বাসা বানায় যখন গাছপালার উপর বাতাস প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এ সবের একটা লক্ষণ রয়েছে, যা ওরা দেখতে পায়। আর এদিকে ফিরে আসার অনুভূতি তীব্র থাকে, যা মানুষের মধ্যে দুর্বল। কিন্তু মানুষ তা দিয়ে তার সামান্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে, তার লক্ষ্যে পৌঁছে যায় সৌন্দর্যের সাজ-সরঞ্জমের সাহায্যে।[১]

এ কথা জানা আছে যে, মৌমাছি যেসব কাজ করে তার সূক্ষ্ম লক্ষ্য কিছু মাত্র ভুল-ভ্রান্তি বা পথ হারানো ব্যতিরেকেই, তা যদি কেবলমাত্র 'স্বজ্ঞা'র তাড়নায়ই করত, করত জন্মগত প্রবৃত্তি বা প্রকৃতির তাকীদে, তাহলে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই বলতেন না যে, তোমাদের রব্ব মৌমাছির প্রতি ওহী পাঠিয়েছেন। কেননা ওহী হচ্ছে সরাসরি পথ দেখানো, কাজে নিয়োজিত করা ও কাজ করিয়ে নেয়া। জীবন্ত সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ্র এই ওহী। যার প্রতি তা পাঠানো হয়, আল্লাহ্ নিকট থেকে প্রচ্ছন্নভাবে কিছু বলে দেয়া পর্যায়েরই কাজ হচ্ছে এই ওহী। আল্লাহ্-ই যে মৌমাছির প্রতি 'ওহী' পাঠান তা আয়াতের এই তিনটি শব্দ অকাট্য করে দিয়েছেঃ اتخذى। গ্রহণ কর, বানাও; وكلى এবং খাও, ভক্ষণ কর এবং واسلكى চল, পথ অবলম্বন করে চলতে থাক। কাজ করতে থাক।

ফলে এই তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন পোকা এবং তার অনুরূপ অন্যান্য পোকা—যেমন পিপীলিকা ইত্যাদি—যা কিছুই করে, তা এসবের জন্য একজন 'পথ প্রদর্শক' থাকার কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। সেই 'পথ প্রদর্শক'ই ওদের প্রতি ওহী পাঠান, ওদের জীবনাচরণের পথ সরাসরি দেখিয়ে দেন, ওরা সেই পথেই চলে, চলতে বাধ্য হয় বা বাধ্য হয়েই চলে।

কুরআন মজীদে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসনের মুকাবিলায় পিপীলিকার নির্ভীক ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাহিনীতে পিপীলিকার বুদ্ধিমত্তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা যে উচ্চতর জগত থেকে প্রাপ্ত হিদায়তের বলেই সম্ভব হয়েছিল, তাতেও কোনই সন্দেহ থাকে না।

কুরআন বলছে, পিপীলিকা যখন সুলায়মানের বাহিনী দেখতে পেল এবং বিপদের আশংকা বোধ করল, তখনই স্বজাতীয়দের সতর্ক করে দিতে একবিন্দু বিলম্ব করল না। কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

১. العلم يدعو الايمان كريسى موريسن ص ١١٤-١١٨

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ

(النمل: ١٨)

একটি পিপীলিকা বললঃ হে পিপীলিকার দলঃ নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়, এমন যেন না হয় যে, সুলায়মান ও তার সৈন্যবাহিনী তোমাদেরকে পিষে মেরে ফেলবে।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পিপীলিকারাও আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রচ্ছন্ন উপায়ে তাদের বিপদ-আপদ সম্পর্কে আগে-ভাগে অবহিত হতে পারে, হয়ে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ওদের স্বজাতীয়দের সাবধান করতেও পারে।

ক্রেসী মরীসন তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে পিপীলিকা সম্পর্কে কি লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। লিখেছেনঃ

মৌমাছি ও পিপীলিকা উভয়ই জানতে পারে কিভাবে নিজেদের সংঘবদ্ধ ও পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। ওদেরও বাহিনী, কর্মচারী, হুকুম বরদার এবং গুণগুণ ধ্বনি রয়েছে।

এক প্রকারের পিপীলিকা রয়েছে, যেগুলির স্বজ্ঞা বা চিন্তাশক্তিই ওদের বাধ্য করে খাদ্যের জন্য বাসা নির্মাণ করতে ... ...

পিপড়ারা এক ধরনের কীট শিকার করে ও চুরি করে নিয়ে নেয়। আর এক প্রকারের পিপ্‌ড়া বাসা নির্মাণের সময় কাঙ্ক্ষিত পুরুত্ব অনুপাতে গাছের পাতা কেটে নেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এসব পোকা এই ধরনের জটিল কাজ কি করে সম্পন্ন করে? নিঃসন্দেহে একজন সৃষ্টা রয়েছেন যিনি ওদেরকে এসব কাজ শিখিয়ে থাকেন।[১]

পিপীলিকা কোন স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসব জ্ঞান অর্জন করে বলে মনে করা যায় কি? কার কাছ থেকে জানতে পেরে ওরা বিপদের কথা আগাম বুঝতে পারে এবং স্বজাতীয়দের পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিতে পারে?

ওদের মধ্যে এই যে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও বাছাই ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়, তার অপর কি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? ওদের স্রষ্টা—ওদের লালন-পালন রক্ষণাবেক্ষণকারীর নিকট থেকে প্রচ্ছন্ন জ্ঞান দান (الهام) ছাড়া এর অন্য কোন ব্যাখ্যা চলে কি?

---

১. العلم يدعو الايمان - كريسى موريسن ص ١٣٣

এ পর্যায়ে আরও জ্ঞান তথ্য ও তত্ত্ব জানবার জন্য অপরাপর প্রাণী সম্পর্কে মরীসন যা লিখেছেন, তা অবশ্যই স্মরণীয়।

সলেমন মাছ সম্পর্কে তিনি লিখেছেনঃ

> সলেমন মাছ যখন এক পানি থেকে অন্য পানিতে চলে যায়, তখন তা পানির উপরি স্তরে উঠে সাঁতার কাটে। তখন তা বুঝতে পারে যে, এটা ওদের খাল নয়। তখন তা খালের মধ্য দিয়ে পথ করে, পরে স্রোতের বিপরীত দিকে চলতে থাকে ওদের আসল স্থানে পৌঁছার জন্য। এভাবে মাছ ওদের জন্মস্থানে ফিরে যেতে পারে কোন্ নির্ধারণের কারণে?[১]

অনেক প্রাণী এমনও আছে যা ওদের কোন অঙ্গ হারিয়ে ফেললে খুব দ্রুত ও অবিলম্বে তা ফিরে পায়। যেমন কাক্ড়া যখন শিকারী নখর হারায় তখন তা বুঝতে পারে যে, তার একটা প্রত্যঙ্গ হারিয়ে ফেলেছে, তখন খুব দ্রুততা সহকারে অন্যান্য কোষকে সক্রিয় করে তার এই হারানো প্রত্যঙ্গটি বানিয়ে নেয়। সে প্রত্যঙ্গটি বানানো হলেই কোষসমূহ কাজ বন্ধ করে দেয়। কেননা তা যে-কোনভাবে জানতে পারে যে, আরামের সময় উপস্থিত হয়েছে।[২]

মরীসন এ-ও লিখেছেন যে, এই প্রাণীগুলি ওদের পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়। কোষসমূহের তৎপরতা প্রসঙ্গেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, কোষগুলির কি নিজস্ব বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তি আছে—না নেই? ... প্রকৃতিই কোষগুলিকে এই স্বজ্ঞা দিয়ে সাবলম্বী বানিয়েছে কিংবা কোন চিন্তাশক্তির সাহায্যে তা করতে সক্ষম হয়েছে, তা আমরা বিশ্বাস করি, আর না-ই করি, একথা স্বীকার করার উপায় নেই যে, কোষগুলিই তার আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তনে বাধ্য করে, যেন তা তার দেহাংশের প্রতি মুখাপেক্ষিতা সহকারে চলতে পারে। আর যে জীবন্ত প্রাণীর দেহে যে কোষই উৎপন্ন হোক, তা যেন তার গোশতের অংশ হয় নিজেকে সে ভাবেই তৈরি করে নেয়। কিংবা নিজেকে ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করে। যেমন তার চামড়ার যে অংশটি পুরানো হয়ে যায় সেটি ঝরে পড়ে যায়। দাঁতের উপরের কঠিন মসৃণ আচ্ছাদন রাখবে ও চোখে স্বচ্ছ প্রবহমান পানি বানাবে, অথবা নাক কিংবা কান বানানোর কাজে প্রবেশ করবে... ...

তার প্রত্যেকটি আকৃতি ও অন্যান্য বিশেষত্ব বানিয়ে নিবে যেমন তার কাজসমূহ সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য হয়।

---

১. العلم يدعو الايمان - كريسي موريسن ص ١٣٣

৩. ঐ

এই কোষের ডান বা বাম হাত রয়েছে, তা তো আমরা মনে করতে পারি না। কিন্তু একটি কোষ ডান কানের অংশ হয়ে যায়—ঠিক তখনই অপর কোষটি বাম কানের অংশ হয়ে যায়।[১]

এই সব থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, এই জীবন্ত সত্তাসমূহের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি ও পার্থক্য বোধ তীব্রভাবে রয়েছে? আর তা কি হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বোদ্ধৃত কথারই বাস্তব ব্যাখ্যা নয়?

رَبُّنَا الَّذِىٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

আমার রব্ব প্রত্যেকটি জিনিসকেই তার সৃষ্টিত্ব দান করেছেন, পরে তাকে হিদায়তও দিয়েছেন।

উক্ত কথাটির প্রথম অংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে প্রাণীকুলের মধ্যে সৃষ্টিগত স্বজ্ঞার দিকে। আর শেষাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়ত বা ইলহাম-এর দিকে। দুইটি কথার মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে ثم শব্দ দ্বারা, যার অর্থ 'পরে' বা অতঃপর। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উক্ত 'হিদায়ত' প্রাণী ও পোকা-মাকড়ের মধ্যে জন্মগত বা প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্টি করে দেয়া হয়নি। বরং ওরা যখনই এই ধরনের হিদায়তের মুখাপেক্ষী হয় বা প্রয়োজন বোধ করে, ঠিক তখনই তা ওদের দেয়া হয়। আর তা হলেই বলা যথার্থ হয় যে, ওদের প্রতি আল্লাহ্র নিকট থেকে ওহী বা ইলহাম আসে।

পোকা-মাকড়ের জগতে এরূপ ইলহাম বা হিদায়ত দানের লক্ষণসমূহ আমরা স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করতে পারি। যেমন মানব শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে কোন কাজেরই ক্ষমতার অধিকারী হয় না। সেজন্য কিছু দিনের শিক্ষাদান বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।

এ সব পোকা-মাকড়ের কর্ম-তৎপরতায় আমরা বেশ কয়েকটি ব্যাপার লক্ষ্য করতে পারি।

ক. এ সব পোকা-মাকড় নিজেদের প্রয়োজন এবং তা পরিপূরণের পন্থা খুব ভালো ভাবেই জানে ও বুঝে। সেজন্য কোন দৃশ্যমান শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না।

খ. এ প্রাণীগুলি তাদের নিজেদের মধ্যে কর্মবন্টনের ব্যাপারটি সূক্ষ্মভাবে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। কাজ বাছাই করে-ও নিতে পারে এবং উত্তমভাবেই সামষ্টিক পদ্ধতিতে তা কার্যকর করার উপায় সম্পর্কেও খুব ভালো ওয়াকিফহাল হয়।

---

১. العلم يدعو الايمان

গ. এ সব প্রাণী নিজেদের পরিপার্শ্বের পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় রত থাকে। সেই অনুপাতে নিজেদের তৈরি করে নেয়। তার দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোন কোন পরিবর্তনের স্পষ্ট স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়।

এই বিস্ময়কর অবস্থার মুখোমুখী হয়ে তিনটি পথের যে কোন একটি অবলম্বন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ঃ

১. হয় আমরা ধরে নেব যে, এই প্রাণীগুলির নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি ও অনুভূতি-আঁচ করার শক্তি রয়েছে, সব কিছু বুঝতে পারে। মানুষ যার এত সামান্য অংশের অধিকারী হয় যে, বলা যেতে পারেঃ একশ' ভাগের এক ভাগ।

কিন্তু এই কথাটি খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ কোষ যে কোন জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী নয়, তা সবাই জানেন। ঠিক এই কারণেই মানুষকে আমরা এ পর্যায়ের আলোচনায় শামিল করিনি। শুধু মৌমাছি, পিপীলিকা ও এ পর্যায়ের অন্যান্য পোকা-মাকড় সম্পর্কিত কথার মধ্যেই আলোচনাকে সীমিত রেখেছি। কেননা মানুষ তো সব কাজ করে তাকে দেয়া বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির সাহায্যে, যা এসব পোকা মাকড়ের নেই। মানুষের জীবতাত্ত্বিকতা, তার কোষসমূহ, তার বড় আকারের মগজ এবং চিন্তাশক্তির সাহায্যেই তারা তাদের নিত্যকার স্বাভাবিক ও জৈবিক কাজ-কর্ম-সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। এ জন্য বাইরে থেকে কোন জ্ঞান লাভ বা আহরণ তাদের জন্য অপরিহার্য নয়।

কিন্তু আলোচ্য এসব ইতর প্রাণী ও পোকা-মাকড় সম্পর্কে কেউ চিন্তাও করতে পারে না যে, ওদের কোন বিবেক বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি রয়েছে। কিংবা উদ্ভিজ্জ ও জৈব কোষসমূহ স্বতঃই সেই বুঝ-বুদ্ধি, চিন্তা ও চেতনার অধিকারী, আর ওরা এমন চিন্তা-ভাবনা নিজেরাই করে নিতে পারে যদ্দারা জীবন-পথে চলার নিয়ম ওরা নিজেরাই জেনে নিতে পারে। এ যখন আমরা সম্ভব মনে করি না তখন একথা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

২. এসব প্রাণীর যান্ত্রিক সংস্থার প্রকৃতি এবং বস্তু সংগঠনই এসব কাজ ঘটানোর জন্য যথেষ্ট, তা উপরিউল্লিখিত কাজ হোক অথবা পিঁপড়া ও মৌমাছি, মোরোফিল কীট কিংবা সামুদ্রিক স্পঞ্জের কাজ হোক, তা সবই এসব প্রাণীর দৈহিক উপাদন ও অংশসমূহের সুসংবদ্ধতার ফল, সেগুলির পরস্পরের এমন সহযোজন, যা সেই বিশেষ সংবদ্ধতা ও সংযোজন এসব প্রাণীর দ্বারা এই সব কাজ সম্পন্ন হওয়ার সহকারী হয়, যা আপনা থেকে হলেও ইচ্ছামূলকভাবে হয় না।

অন্য কথায়, এসব প্রাণীর কোষসমূহের রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তিক বিশেষত্ব সমূহই কর্ম-তৎপরতার ধারাবাহিকতাকে অনিবার্য করে তোলে। তাতে বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ঘটে না।

এরূপ অবস্থায় এইসব প্রাণীর জীবন পথের দিকের হিদায়ত প্রাপ্তি আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণকারী দলীল হতে পারে না। তখন তাতে প্রাকৃতিক ব্যবস্থারই প্রমাণ হবে। মনে করতে হবে যে, এসব প্রাণীর সৃষ্টিত্বই বিশেষ সংবদ্ধতা সুদৃঢ় করে দিয়েছে। আর তার বলেই ওরা জীবনের দায়িত্বসমূহ পালন করতে সক্ষম হচ্ছে। যেমন বৃক্ষরাজি। এমতাবস্থায় ওদের হিদায়ত প্রাপ্তিটা তার অংশসমূহের সংযোজনের অনিবার্য দাবি ছাড়া আর কিছু নয়।

৩. যে ধরনের সাজ-সরঞ্জাম থেকেই এসব তৎপরতা প্রকাশিত হয়, সেই সব সরঞ্জামের মূলের সাথে সম্পর্কিত থাকলেই পূর্বাহ্নে সেসব বিষয়ে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়। তখন বস্তুগত সরঞ্জাম ও তার অভ্যন্তরীণ রূপায়ণই যথেষ্ট হয়, তা আয়ত্ত করা সম্ভব হলেই তার কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পারার মাধ্যম বা কারণ হতে পারে।

অন্যভাবে বললে বলতে হয়, এসব পোকা-মাকড় যেসব বিস্ময়কর কাজ সম্পাদন করে, সেগুলিকে যান্ত্রিক সরঞ্জামের ফল বলা যাবে তখন, যদি সেই সরঞ্জামই এসব কার্য সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট হয়।

কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে, সেই সরঞ্জাম বিশেষ কাজ সম্পাদনে সমর্থ হয় না বলে মনে করতে হয়, বরং তা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন পথের সম্মুখবর্তী হয়, আর তা সত্ত্বেও দুটি পথের যেকোন একটি অবলম্বন করে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য, তাহলে বিশ্বাস করতে হবে যে, সেই সরঞ্জামের নিছক জড় সংবদ্ধতা দুইটি পথের একটি অবলম্বনের জন্য আদৌ যথেষ্ট নয়; বরং এ জাতীয় হিদায়ত প্রাপ্তি ও বাছাই থেকে উল্লিখিত সরঞ্জাম ও তার পরিণতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক বর্তমান থাকার কথা জানতে পারা যায়। আর এই সত্য—এই আবিষ্কার ও উদ্ভাবন দ্বিতীয় প্রকারের হিদায়ত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়, যার সাথে মূল সরঞ্জাম ও তার সংবদ্ধতা দৈহিক সংযোজনের কোন সংযোগ নেই, বরং তার সম্পর্ক উচ্চতর জগত থেকে প্রাপ্ত কোন হিদায়তের সাথে।

বস্তুত একটা প্রবল সংবেদনশীল যন্ত্র বানানো সম্ভব যা যোগ-বিয়োগ-পূরণ-ভাগ প্রভৃতি সূক্ষ্ম আঙ্কিক কাজ কর্ম পূর্ণ দক্ষতার সাথে আঞ্জাম দিবে। কিন্তু এ ধরনের যন্ত্র একই গাণিতিক নিয়মে কোন আবিষ্কার-উদ্ভাবনীর কাজ করতে সক্ষম— এমন কথা মনে করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

অনুবাদ যন্ত্র সম্পর্কেও এই কথা। তা হয়ত এক ব্যক্তির কথার বা রচনার অনুবাদ করে দিতে পারে সুষ্ঠু ও সূক্ষ্মভাবে; কিন্তু তার পক্ষে সেই ব্যক্তির কথার বা রচনার ভুল সংশোধন করতে পারা এবং এ পর্যায়ে নব আবিষ্কার-উদ্ভাবনের পথে চলা কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

পূর্বের কথার প্রসঙ্গে বলা যায়, এ সব প্রাণী যে গায়বী প্রচ্ছন্ন কুদরত দ্বারা চালিত হয়, তা একটি প্রশস্ত নিরংকুশ শক্তি। সকল পোকা-মাকড় সম্পর্কে তার জ্ঞান অত্যন্ত ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ, সর্বাত্মক।

আর সেই ব্যাপক, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক শক্তি আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ-ই হতে পারে না। অথবা বলা যায়, সমস্ত বিশ্বলোক কেন্দ্রিক ব্যাপারাদির ব্যবস্থাপক গায়বী শক্তিসমূহ কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমেই কাজ করে। এই পোকা-মাকড়গুলির প্রতি হিদায়ত এই পর্যায়েরই ব্যাপার।

এখানে একটি বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ করা আবশ্যক।

এ সব প্রাণীর কাজ-কর্ম সে সবের বস্তুগত সংযোজনের ও অভ্যন্তরীণ রূপায়ণের উপর কর্তৃত্বশালী বস্তুগত সংস্থার ফল হোক কিংবা তথায় এমন কোন শক্তির অবস্থিতি মেনে নেয়া হোক, যা এ সব পোকা-মাকড়কে এ সব কার্যকলাপ ও বিস্ময়কর জ্ঞানের হিদায়ত দান করে, যা এ সব আবিষ্কার-উদ্ভাবনীতে তার সাথে সহযোগিতা করে—এ দুটির যেটিই হোক, তা স্বতঃই একটি স্বতন্ত্র দলীল হতে পারে।

এ দুটির মধ্যে যেটিই হোক, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাণীকুলের নিজস্ব ভাবে জ্ঞান লাভও আল্লাহ্র পরিচিতির অন্যতম উপায়।

কুরআন মজীদের অপর এক আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছেঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى* وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى* (الاعلى : ٣-٤)

যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং পূর্ণ ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। আর যিনি তকদীর নির্দিষ্ট করেছেন, পরে পথ দেখিয়েছেন।

এই পর্যায়ে হযরত আলী (রা)-র একটি বিশ্লেষণের নির্যাস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

মহান আল্লাহ্র বিরাট শক্তি এবং তাঁর বিপুল নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলেই নির্ভুল পথের সন্ধান পাওয়া যাবে, জাহান্নামের ভয় মনে জাগ্রত হবে.....আল্লাহ্র ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিগুলিও যদি লক্ষ্য করা যায়, দেখা যাবে, তিনি

তাকে কত দৃঢ়তা দিয়েছেন, তার গঠনটাকে কত নিপুণ করেছেন, তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, তার অস্থি ও চামড়া কত ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন।

তোমরা ক্ষুদ্রকায় পিঁপড়া-ই দেখ না কেন! তার অবয়ব কত ক্ষুদ্র। আকার-আকৃতিতে কি মসৃণতা ও সূক্ষ্মতা। চোখের পলকেও তা ধরতে পারা যায় না। তা কিভাবে যমীনের উপর চলে এবং খাদ্যের সন্ধান ও সংগ্রহ করে, তা চিন্তা করেও কূল পাওয়া যায় না। খাদ্য কণা টেনে নিয়ে গিয়ে তার গর্তের মধ্যে জমা করে, গ্রীষ্মকালে শীতকালের জন্য সঞ্চয় করে রাখে। তাদের এই সঞ্চিত পরিমাণ খাদ্য সারা শীত মৌসুমের জন্য যথেষ্ট হয়। এভাবে মহান দয়াময় তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন, যখন যেখানেই ওরা অবস্থান গ্রহণ করুক-না-কেন।

পিঁপড়ার খাদ্য তার পেটের গর্তের কোণায় কি করে স্থান গ্রহণ করে, তার মাথায় চোখ ও কান কি করে স্থান পেয়েছে, তা যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে বলতেই হবে, এ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তার দেহ সংগঠন চিন্তা করেও কোন সীমায় পৌঁছা যাবে না। এরূপ একটি প্রাণী যে মহান স্রষ্টা তাঁর অতুলনীয় কৌশলে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর প্রশংসায় এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিনয়ে মস্তক আপনা থেকেই নত হয়ে আসে।

نهج البلاغة ـ الخطبة ـ ١٨٠

আল্লাহ্ এবং তাঁর পরিচিতির ব্যাপকতা

গোটা বিশ্বলোক আল্লাহ্র উদ্দেশে সিজদা করে, তার হামদ সহকারে তাসবীহ করে

কুরআন মজীদ স্পষ্ট ভাষায় ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিলোক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদা করে এবং তাঁর তাসবীহ করে।

বস্তুত এ এমন এক উচ্চতর মহাসত্যের ঘোষণা যা এত বিস্তারিতভাবে কুরআন ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থেই দৃষ্টিগোচর হয় না।

অন্য কথায়, সমগ্র বিশ্বলোক-বিশ্বলোকের প্রতিটি বিন্দু ও অণু থেকে শুরু করে বড়বড় অবয়ব সম্পন্ন সৃষ্টি পর্যন্ত সকলেরই কাজ হচ্ছেঃ

১. মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদা করা

২. তাঁর হাম্দ করা, তাঁর মহানত্ব বর্ণনা করা এবং

৩. তাঁর তাসবীহ করা ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা।

বিশাল শেষ সীমাহীন এই সৃষ্টিলোক বিনয়, ভাব-গাম্ভীর্য প্রকাশ এবং চেতনা, অনুভূতি ও ধারণ শক্তিতে যেন একটিমাত্র স্তুপ অথবা বলা যায়, গোটা সৃষ্টিলোক—তার সব অংশ ও বিন্দু সহকারে আল্লাহ্র প্রশংসায় অভিন্ন কণ্ঠ। প্রতিটিই তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদাবনত। একই দিলে তাঁর মহানত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে।

সিজদা, তাসবীহ ও হামদ—এই তিনটি শব্দের তাৎপর্যে যে পার্থক্য নিহিত, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

সিজদা হচ্ছে নিরংকুশ পূর্ণসত্তার সম্মুখে চূড়ান্ত মাত্রার বিনয় প্রকাশ, তাঁর অশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহের দ্বিধাহীন অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

হামদ ও তাসবীহ এই দুই শব্দের মধ্যকার পার্থক্যের সরকথা হচ্ছে, 'হামদ হচ্ছে আল্লাহ্র মহানত্ব বর্ণনা করা, তাঁর প্রশংসা করা সর্বোত্তম ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ সহকারে। আর 'তসবীহ'র নিগুঢ় তত্ত্ব হলো, এই বিশ্বলোকে যা কিছু আছে তা সব-ই 'আল্লাহ্ সর্বপ্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি দুর্বলতা বিলুপ্তি থেকে পবিত্র' এই কথা বর্ণনা করে।

ইমাম রাগেব ইস্‌ফাহানী লিখেছেনঃ

'আল্লাহ্‌র জন্য হামদ'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্‌র মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ সহকারে প্রশংসা করা। এ শব্দটির প্রয়োগ বিশেষ ক্ষেত্রে আর مَدح শব্দের অর্থ অনুরূপ হলেও তার প্রয়োগ অপেক্ষাকৃতভাবে সাধারণ। 'হামদ' শব্দটি 'শোকর' শব্দের তুলনায় ব্যাপক। مَدح শব্দটির ব্যবহার মানুষের ব্যাপারেও হতে পারে; কিন্তু 'হাম্‌দ' নয়। শো কর (شُكر) শব্দের ব্যবহার হয় কোন না কোন নিয়ামত প্রাপ্তির জবাবে ও স্বীকৃতি স্বরূপ। সব 'হামদ' 'শোকর' নয়, যদিও সব শোকর হামদ পর্যায়ের।

অতঃপর এই তিনটি বিষয়েরই বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা যাচ্ছেঃ

প্রতিটি বিন্দু ও অণু আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সিজদারত

বিশ্বলোকের সিজদা করার ব্যাপারটিকে কুরআন মজীদে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নানাভাবে সম্পন্ন হয় বলে দাবি করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক আয়াতে এ জগতের বিশেষভাবে চেতনা সম্পন্ন সৃষ্টিকুলের সিজদার কথা বলা হয়েছে। যথাঃ

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ (الرعد: ١٥)

এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজদা করে তারা সকলে, যারাই আছে আসমানে ও পৃথিবীতে স্ব-ইচ্ছা ও উদ্যোগক্রমে এবং বাধ্য হয়ে। আর তার ছায়া (সিজদা করে) সকাল বেলা ও বিকাল বেলা।

এ আয়াতে কেবল বিবেকবান সৃষ্টিকুলের সিজদার কথা বলা হয়েছে। তার প্রমাণ من শব্দটি কেবলমাত্র বিবেকবান সত্তার জন্যই ব্যবহৃত হয় এবং এর মধ্যে 'বিবেকবান বলতে বোঝায় এমন সব সৃষ্টি-ই' শামিল রয়েছে। এ থেকে কেউ-ই বাদ পড়েনি। মু'মিন ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে যে 'সিজদা' করে, উক্ত আয়াতে সেই সিজদার কথা বলা হয়নি। কেননা সে সিজদা বিশেষ লোকদের, বিবেক-বুদ্ধিমান সর্ব সাধারণের সিজদা নয়। মানুষের মধ্যেই এমন অনেক রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী বা তাঁর অনুগত নয় বলে তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না, তাঁর উদ্দেশে সিজদাও দেয় না। অতএব উক্ত সিজদা শরীয়াতের বিধানভুক্ত সিজদা নয়, তা হচ্ছে সৃষ্টিগত বা প্রাকৃতিক সিজদা।

সূরা আন্-নহল-এর আয়াতেও এই সিজদার কথা বলা হয়েছেঃ

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰئِكَةُ

(النحل: ٤٩)

এবং আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশ লোকে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে চলমান জীব-জন্তু এবং ফেরেশতাও।

এ আয়াতের শুরুতে বিবেক-বুদ্ধিহীন সৃষ্টির সিজদার কথা বলা হয়েছে। আর শেষে 'ফেরেশতা'র উল্লেখ করে বিবেক-সম্পন্ন সৃষ্টির সিজদার কথা বলা হয়েছে।

সূরা আল-হাজ্জ-এর আয়াত হচ্ছেঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ (الحج:١٨)

তুমি কি দেখনি, আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সিজদা করে যারাই আছে আসমানে এবং যারাই আছে পৃথিবীতে।

অপর কিছু সংখ্যক আয়াতে 'সিজদা' শব্দটি ব্যাপক বেষ্টনীতে হয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত চলৎশক্তি সম্পন্ন সকল প্রাণীরই সিজদার কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমনঃ

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ (النحل: ٤٩)

আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সিজদা করে তা সবই যা আকাশ লোকে আছে, আর চলৎশক্তি সম্পন্ন প্রাণী পৃথিবীতে যারাই আছে।

তৃতীয় পর্যায়ের আয়াতে উদ্ভিদ-গাছপালা-গুল্ম-লতা ইত্যাদির সিজদার কথা বলা হয়েছেঃ

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (الرحمن: ٦)

এবং তারকা-নক্ষত্র ও বৃক্ষ উভয়ই সিজদাবনত।

চতুর্থ পর্যায়ে আরও অধিক জিনিসের সিজদা'র কথা বলা হয়েছে। তাতে দেহসম্পন্ন সত্তার ছায়ার সিজদা করার কথা বলা হয়েছেঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ* (النحل: ٤٨)

আর এই লোকেরা আল্লাহ্‌র পয়দা করা কোন জিনিসকেই কি দেখে না যে, তার ছায়া কিভাবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে সিজদারত অবস্থায় ডানে ও বামে পতিত হচ্ছে? সব কিছুই এমনিভাবে বিনয় প্রকাশ করছে।

পঞ্চম পর্যায়ে সূর্য, চন্দ্র, তারকা-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা ও চলতে পারে এমন সব জীব ও প্রাণীর সিজদার কথা বলা হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَاَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ.

(الحج: ١٨)

তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্‌র সামনে সিজদায় অবনত হয়ে রয়েছে সেই সব-ই যারা আসমানে রয়েছে, যারা যমীনে রয়েছেঃ সূর্য, চাঁদ, তারকা, পাহাড়, গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার এবং বহুসংখ্যক মানুষ...

এসব আয়াত সম্পর্কে বিবেচনা করলেই বোঝা যায় যে, এতে বাহ্যিক ও সাধারণ সিজদার কথাই বলা হয়েছে। এমন অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যাতে কোন নির্দিষ্ট জিনিসের কথা বিশেষভাবে না বলে এই জগতের প্রত্যেকটি অংশের সিজদার কথা বলা হয়েছে।

কাজেই এই সিজদার তাৎপর্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করতে চেষ্টা করা এবং এই সমস্ত জিনিসই—বিবেকবান ও বিবেকহীন সব কিছুই—আল্লাহ্‌র সম্মুখে কি করে বিনয় পেশ করে ও তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা করে তা বুঝতে চাওয়াই এ পর্যায়ে একান্ত জরুরী কাজ।

বিশ্বের অংশসমূহের সিজদার উদ্দেশ্য কি

মানুষ সিজদা কর্ম সম্পন্ন করে মাটির দিকে নুয়ে এবং কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে দিয়ে। এই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا.

(الاسراء: ١٠٧)

যেসব লোককে ইতিপূর্বে ইল্‌ম দেয়া হয়েছে, তাদেরকে যখন তা শুনানো হয়, তখন তারা নাকে মুখে সিজ্‌দায় পড়ে যায়।

এ আয়াতে সিজদার যে রূপ তুলে ধরা হয়েছে তা নিশ্চয়ই বাহ্যিকরূপ। কিন্তু তার মর্মকথা হচ্ছে মা'বুদের সমীপে চরম মাত্রায় বিনয় ও আত্মনিবেদন গ্রহণ এবং মা'বুদের নিকট নিজের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা পরিহার করা।

এখানে একটি প্রশ্ন তীব্রভাবে জেগে উঠে। তা হচ্ছে সিজদার জন্য কি বিশেষ রূপ বা অবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য? সেই বিশেষ রূপ ও অবস্থা গ্রহণ ব্যতীত অপর কোনরূপ বা অবস্থার পর্যায়ে কি 'সিজদা' শব্দটির ব্যবহার যথার্থ হয় না? ....অথবা সিজদার মৌল কথা হচ্ছে শুধু বিনয় প্রকাশ? ... যখন তা সম্পন্ন হবে তখন সিজদা হয়ে গেল বলে মনে করা যাবে? ... তাতে বিশেষ কোন রূপ বা আকৃতির শর্ত নেই? কার্যত সেইরূপ না হলেও 'সিজদা' হতে কোন অসুবিধা হবে না? এমনকি সেই বিশেষ রূপ ও আকৃতি ধারণ কি প্রচলিত নিয়মে চূড়ান্ত মাত্রার বিনয় প্রকাশের জন্য অপরিহার্য? মা'বুদের সম্মুখে নিজের ছোটত্ব ও হীনতা প্রকাশের একমাত্র পথ বা উপায় কি এই প্রচলিত ধরনের সিজদা?

সত্যিকথা হচ্ছে, কুরআন প্রথমোল্লিখিত পন্থাই গ্রহণ করেছে অর্থাৎ কুরআনের দৃষ্টিতে সিজদা বলতে যে কোন ভাবে বিনয় ও নিজের হীনতা প্রকাশ করা বোঝায়।

তার বড় প্রমাণ এই যে, কুরআনের অভিধানসমূহে 'সিজদা'র অর্থ করা হয়েছে নিজের হীনতা প্রকাশ, মাথা নোয়ানো ইত্যাদি। তাতে প্রচলিত বা বিশেষ ধরনের কোন রূপ বা আকার আকৃতিকে ধরা হয়নি।

ইবনে ফারিস লিখেছেনঃ 'সিজদা করেছে' বললে বোঝায় মাথা নত করা, নিজের হীনতা গ্রহণ। যা কিছুই হীনতা গ্রহণ করে, বলা যায়, তা সিজদা করেছে। আবু আমর বলেছেন, 'ব্যক্তি সিজদা করেছে' এ কথার অর্থ হবে, সে মাথা ঝুঁকিয়েছে, নুইয়েছে। ইমাম রাগেব লিখেছেনঃ 'সিজদা'র আসল অর্থ নুয়ে যাওয়া, হীনতা গ্রহণ। সিজদা বলতে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে হীনতা গ্রহণ ও তাঁর ইবাদত করা বোঝায়। তা মানুষ, জীব-জন্তু, প্রস্তর-খনিজ ইত্যাদি সকলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। এটা দুরকমের।

একটি, নিজ ইচ্ছা ও স্বাধীনতা সহকারে সিজদা দেয়া। তা কেবল মানুষের পক্ষে সম্ভব।

দ্বিতীয়টি, ধরে বেঁধে বাধ্য করে সিজদা দেয়ানো। তা মানুষ, জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ গাছ-পালা সকলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। কুরআনের আয়াতঃ

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا (البقرة: ٥٧)

বিনয়ী, অবনত মস্তক হয়ে দ্বারপথে প্রবেশ কর।

বিশ্বলোকের সিজদার নিগুঢ়তত্ত্ব

সমগ্র বিশ্বলোক নিজ থেকেই আল্লাহ্র জন্য বিনয় ও হীনতা প্রকাশ করে নিজ থেকেই এক বিশেষ ধরনে। তার সর্বোচ্চ প্রদর্শনী বিধৃত রয়েছে এর মধ্যে যে, সমগ্র বিশ্বলোক মহান আল্লাহ্র মুঠির মধ্যে ও তার আদেশ-নিয়েমের অধীন। সব কিছুই আল্লাহ্র অনুগত, কেউ-ই তার বাইরে নয়। এই অধীনতা থেকে কোন কিছুই মুক্ত নয়। সকলেই পূর্ণ বাধ্যবাধকতা সহকারে আল্লাহ্র নিয়ম পালনে রত, তাঁর নিরংকুশ ইচ্ছার নিকট অবনত।

সমগ্র বিশ্বলোকের এই বিনয় ও অধীনতার বড় লক্ষণ হচ্ছে, সার্বিকভাবে সমগ্র সৃষ্টিলোক একটি মাত্র ইচ্ছার অধীন, এ জগতের প্রতিটি অংশ সেই উচ্চতর একক ইচ্ছার অনুসরণ ও অনুগমন করছে কোনরূপ অনিচ্ছা বা প্রতিরোধ ছাড়া-ই। কুত্রাপি সামান্য মাত্রারও বিদ্রোহ, সীমালংঘন বা প্রত্যাখ্যানের অস্তিত্ব নেই।

এ কারণে এই পর্যায়ে কোন জোর-জবরদস্তির বা অসন্তুষ্টি-অনিচ্ছার ধারণা পর্যন্তও করা যায় না। কেননা জোর-জবরদস্তি কিংবা অনিচ্ছা-অসন্তুষ্টির অবকাশ থাকে যখন কোথাও স্বাধীন ইচ্ছার সুযোগ থাকে। তাঁর আদেশের বিরুদ্ধতা কল্পনা করা যায় না, কেননা এই বিশ্বলোকের কারোরই বা কোন কিছুরই অস্তিত্ব পর্যন্ত চিন্তা করা যায় না এক মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত। তাহলে কে বা কি জিনিস তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করতে পারে? এবং কেমন করে কল্পনা করা যায় যে, সিজদা করার জন্য তার উপর শক্তির প্রয়োগ করা বা তাকে বাধ্য করা হয়েছে?

আগ্রহ ইচ্ছামূলক সিজদা ও জবরদস্তির সিজদা

'সিজদা'র অর্থই যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা ও বাসনার সমীপে বর্তমান সবকিছুরই বিনয় প্রকাশ, তখন তাকে ইচ্ছামূলক ও জবরদস্তিমূলক—এই দুই ভাগে বিভক্ত করার কোনই অর্থ হয় না। যদিও কুরআনে মানুষ ও অন্যান্য বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির সিজদাকে উক্ত দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا (الرعد: ١٥)

আল্লাহ্রই জন্য সিজদা করছে তারা সকলে, যারাই রয়েছে আকাশলোকে ও পৃথিবীতে ইচ্ছামূলকভাবে ও অনিচ্ছা-অনাগ্রহ মূলকভাবে।[১]

১. كَـرهًا অর্থ অসহ্য হওয়া, অসন্তুষ্ট, মজবুরী, জবরদস্তি।

وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا অপর পৃষ্ঠায় দেখুন।

এ আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় দু'ধরনের সিজদার কথা বলা হয়েছেঃ

১. আগ্রহ ও ইচ্ছামূলক সিজদা, ২. জোর-জবরদস্তি ও অনাগ্রহ বা অনিচ্ছার সিজদা।

এরূপ অবস্থায় এই দুই প্রকারের 'সিজদা'র ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই বলা যায়, 'আগ্রহমূলক সিজদা' হচ্ছে মানব প্রকৃতি বা অপর কোন সৃষ্টির প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল ও সঙ্গতিসম্পন্ন অবস্থা গ্রহণ। যেমন প্রবৃদ্ধি, রক্তের আবর্তন ও প্রবাহ, হৃদপিণ্ডের গতিশীলতা, নাড়ীর স্পন্দন ইত্যাদি। পক্ষান্তরে 'বাধ্যতামূলক সিজদা' হচ্ছে, স্বভাব-প্রকৃতির পরিপন্থী অবস্থা গ্রহণে বাধ্য হওয়া। যেমন মৃত্যু বা বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট জীব মাত্রকেই ভোগ করতে হয় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণের পূর্ব পর্যন্ত।

স্মরণীয়, উপরিউক্ত আয়াতে طَوْعًا وَّكَرْهًا শব্দদয় ব্যবহৃত হয়েছে আসমান ও যমীনের সিজদা করা সম্পর্কে। তাই তার অর্থ তাই হতে পারে, যা বলা হল। অপর একটি আয়াতে আসমান-যমীনকে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ ائْتِيَا طَوْعًا وَّكَرْهًا 'তোমরা দুইটি এগিয়ে আস ইচ্ছা-আগ্রহ সহকারে ও বাধ্য হয়ে।' এতে যে কোন প্রকারের **পরিবর্তন** পরিবর্ধন গ্রহণ করার জন্য—তা তাদের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন হোক, আর নাই হোক—উভয়ের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

এ দৃষ্টিতে একটি জিনিসের অস্তিত্ব গ্রহণ এবং সেটির উপর যে কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ—তা তার প্রকৃতির অনুকূল হোক কি প্রতিকূল—গ্রহণে রাযী হওয়াই আল্লাহ্‌র সম্মুখে তার বিনয় ও হীনতার প্রকাশ। মোটকথা, এই অবস্থা গ্রহণ কখনও আগ্রহ-ইচ্ছা ও উদ্যম-উৎসাহ সহকারে হয়, আর কখনও হয় নিতান্ত অনিচ্ছা-অসন্তুষ্টি সহকারে—বিশেষ করে যখন তা স্বভাব-প্রকৃতির বিপরীত হয়, তখন এই শেষোক্ত অবস্থাই দেখা দেয়।

"এর তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ ভিন্ন ভিন্নভাবে লিখেছেন। কেউ বলেছেনঃ كَرْهًا অর্থ সর্ব প্রকারের স্বভাবগত দলীল-প্রমাণে বাধ্য হয়ে সিজদা করা, আল্লাহ্‌র 'যাত' ও 'সিফাত' মেনে নেয়া। কেউ বলেছেন, মুসলমান খুশীর সাথে সিজদা করে, আর কাফির খোদায়ী ফয়সালায় বাধ্য হয়ে অস্ত্র সংবরণ করে। কাতাদাহ্ বলেছেন, মুসলমান সন্তুষ্টি সহকারে সিজদা করে, আর কাফির বাধ্য হয়ে। আবুল আলীয়া ও মুজাহিদ বলেছেন, কাফিরও আল্লাহ্‌কে স্রষ্টা হিসেবে মানে, সিজদা করে, যদিও অন্যান্যদের সামনেও মাথা নত করে। ইবন আব্বাস বলেছেন, মুসলিম কি অমুসলিম স্বাভাবিক অবস্থার দিক দিয়ে সব অনুগত, সিজদায় অবনত। (অর্থাৎ সৃষ্টির সীমার বাইরে কেউ যেতে পারে না), যদিও মুখে তা স্বীকার করে না। لغات القرآن ج

সারেজাহানের সমস্ত বস্তু কেবল আল্লাহ্র মুঠি বা হস্তক্ষেপের মধ্যে নয়, সেসবের ছায়াও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, তাকেও আল্লাহ্রই নিয়ম ও ইচ্ছাধীন গতি গ্রহণ করতে হয়। যেমন সূরা আন্-নহর-এর ৪৮ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

এই লোকেরা কি আল্লাহ্ সৃষ্ট কোন জিনিসই দেখেনি যে, তার ছায়া কিভাবে আল্লাহ্র সম্মুখে সিজদারত অবস্থায় ডানে ও বামে ভূ-লুণ্ঠিত হচ্ছে?

সমগ্র বিশ্বলোক—এমনকি এখানকার প্রত্যেকটি জিনিসের ছায়াও এক আল্লাহ্র তাসবীহ্ করে। এরূপ অবস্থায় এই বিশ্বলোকের একটি সামান্য নগণ্য অংশ এই মানুষের পক্ষে সিজদার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে শির্ক করার কিংবা তাঁর সম্মুখে বিনয়াবনত হওয়ায় শির্ক করার কি অধিকার থাকতে পারে?

বিশ্বলোক হাম্দ ও তাসবীহ্ করে কিভাবে?

কুরআনের দাবি ও ঘোষণা হচ্ছে, সমগ্র বিশ্বলোক—বিশ্বলোকের প্রতিটি জিনিস আল্লাহ্র তাসবীহ্ করে, হামদ করে, তাঁকে মহান বলে ঘোষণা করে। বলা-ই হয়েছে, 'হামদ' হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণত্ব, নিখুঁত-নির্ভুল সৌন্দর্যমণ্ডিত কার্যাবলীর জন্য তাঁর প্রশংসা করা। আর 'তাসবীহ' হচ্ছে, তিনি সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি-দোষ-অসম্পূর্ণতা-দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র—এ কথা বলা, প্রকাশ করা, বাস্তবে করে দেখানো।

কুরআনের কোন কোন আয়াতে এ শব্দ দুটি একই স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কোন কোন আয়াতে আলাদা আলাদাভাবে। এই পর্যায়ের একটি আয়াতঃ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ* (الحديد : ١)

আসমান ও যমীনে যা কিছুই আছে সবই আল্লাহ্র তাসবীহ্ করছে। তিনি সর্বজয়ী মহাবিজ্ঞানী।

আসমান-যমীনের সব কিছুই—কোন কিছুই বাদ নেই—আল্লাহ্র তাসবীহ্ করে, তা বিবেকবান হোক বা বিবেকহীন। এখানে এ পর্যায়ের আয়াতসমূহ উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ* (الحشر : ١)

يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ*
(الحشر : ٢٤)

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ* (الصف: ١)

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ*
(الجمعة: ١)

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰت وَمَا فِى الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ* (التغابن: ١)

এসব আয়াতে আসমান-যমীনের সব কিছু আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করেছে বা করে বলে দাবি কিংবা ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

এই পর্যায়ের অধিক বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে এ আয়াতটিতেঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ (بنى اسرا ءيل: ٤٤)

সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং সেসবের মধ্যে যারাই আছে, তা সবই আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করে।

উক্ত আয়াতের শেষাংশ হচ্ছেঃ

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ.
(بنى اسرا ءيل: ٤٤)

এমন কোন জিনিসই নেই, যা আল্লাহ্‌র হামদ সহকারে তাসবীহ্ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ অনুধাবন করতে পার না।

সাধারণভাবে সকলের—সব কিছুরই—তাসবীহ্ করার কথা বলা হয়েছে এ আয়াতে। তা বাস্তব। কিন্তু মানুষের পক্ষে তা বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

কুরআনে ফেরেশতাদের তাসবীহ্ করার কথা বলা হয়েছে কোথাও স্পষ্ট ভাষায় আর কোথাও ইশারায়। যেমন এ আয়াতটিঃ

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ (الشورى: ٥)

আর ফেরেশতাগণ তাসবীহ্ করে তাদের রব্ব-এর হাম্দ সহকারে।

এ ছাড়া অন্যান্য আয়াতেও এই তাসবীহ্ পড়ার কথা বলা হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ (الاعراف:٢٠٦)

তোমার রব্ব-এর নিকটে যারা আছে, তারা তাঁর ইবাদত থেকে অহংকারবশত বিরত থাকে না বরং তারা তাঁর জন্য তাসবীহ্ করে।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ (الرعد: ١٣)

মেঘের গর্জন তাঁরই প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, আর ফেরেশতাগণ তাঁর আতংকে কম্পিত হয়ে তাঁরই তাসবীহ্ পড়ে।

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ-يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ-(الانبياء: ١٩-٢٠)

যমীন ও আসমানে যে মখ্লুক-ই আছে, তা সবই তাঁর সৃষ্ট। আর যেসব (ফেরেশতা) তাঁর নিকট রয়েছে, তারা না নিজেদেরকে বড় মনে করে তাঁর বন্দেগী করতে ত্রুটি করে, আর না পরিশ্রান্ত হয়। রাত দিন তাঁরই তাসবীহ্ করতে ব্যস্ত থাকে। মুহূর্তের জন্যেও থামে না।

اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ (المؤمن: ٧)

যারাই আরশ ধারণ করে আছে এবং তার চারপাশে যারাই আছে, তারা সকলে তাদের রব্ব-এর হামদ সহকারে তাসবীহ্ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করে।

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ* (حم السجدة: ٣٨)

কিন্তু এই লোকেরাই যদি অহংকারে নিমগ্ন হয়ে নিজেদেরই কথার উপর জিদ ধরে থাকে তাহলে সেজন্য কোন পরোয়া নেই। যেসব ফেরেশতা তোমার রব্ব-এর নিকটবর্তী তারা দিন-রাত তাঁর তাসবীহ্ করে এবং কখনই ক্লান্ত হয়ে পড়ে না।

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ (الزمر: ٧٥)

এবং তুমি দেখবে ফেরেশতাদের—তারা আরশকে বেষ্টন করে আছে, তারা তাদের রব্ব-এর তাসবীহ্ করে।

সাধারণভাবে আল্লাহ্র তাসবীহ্ পাঠ হওয়ার কথা বলার পর কোন কোন আয়াতে পাখীকুলের তাসবীহ্ পাঠেরও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ (النور: ٤١)

তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্র তাসবীহ্ তারা সবাই করে, যারা রয়েছে আকাশলোকে ও পৃথিবীতে এবং পক্ষিকুলও সারিবদ্ধভাবে। এদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্র সালাত ও তাসবীহ্ জেনে নিয়েছে।

এ আয়াতটি গভীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে দেখা যায়—এ আয়াতে জানা বা জ্ঞান ও আয়ত্তকরণের কাজটি তাসবীহ্কারী কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, এই বিশ্বলোকে বর্তমান সবকিছুই এবং এদের প্রত্যেকেই মূল তাসবীহ্ বা তাসবীহ'র মর্ম জানে ও বুঝে। অন্যথায় তারা যে তাসবীহ্ করে, তা তাদের এ সম্পর্কিত চেতনা ও সমঝ-বুঝের ফলে সংঘটিত হয়। কেননা আয়াতটির শেষভাগে বলা হয়েছেঃ 'এসব সমঝদার জীব ও পাখির সবাই তাঁর তাসবীহ্ ও সালাত জেনে নিয়েছে।'

অপরাপর আয়াতেও পাখির তাসবীহ্ করার কথা বলা হয়েছে। যেমনঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ (سبا: ١)

এবং আমরা দাউদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলামঃ হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পাখিকুলকেও...।

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً* كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ* (ص: ١٨-١٩)

আমি কর্মে নিরত করেছিলাম পর্বতমালাকে, এরা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা বর্ণনা করত (তাসবীহ্ করত)। এবং একত্রিত করা পাখিকুলকেও—সকলেই ছিল তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।

উপরিউক্ত আয়াতের প্রথমাংশে বিশেষ ও নির্দিষ্ট সময়ে পর্বতকুলের তাসবীহ্ পাঠের কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়ের আয়াত উপরে আরও দুটি উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

বিদ্যুৎ চমকও আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করে বলে সূরা রা'দ-এর ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে।

কিন্তু 'তাসবীহ্' বলতে কি বোঝায়?

اَلتَّسْبِيْحُ لُغَةً يَعْنِى التَّنْزِيْه عَنِ النَّقَائِصِ وَالْمَعَايِبِ

অভিধানে 'তাসবীহ্' অর্থ সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষ-অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র বলে ঘোষণা করা।

অর্থাৎ তাসবীহ্ শব্দে تَقْدِيْس পবিত্রতা বর্ণনা এবং تَنْزِيه পরিচ্ছন্নতা ঘোষণা। এ দুটি তাৎপর্যই পূর্ণমাত্রায় নিহিত রয়েছে। ফলে 'তাসবীহ্' শব্দের এমন তাৎপর্য বর্ণনা কখনই সহীহ্ ও যথার্থ হতে পারে না, যা আল্লাহ্'র এই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার কথা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করে না।

বিশ্বলোকের তাসবীহ্ পর্যায়ে তাফসীর লেখকদের মত

কুরআনের যে আয়াতে مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে কোন কোন তাফসীর লেখক এই মত প্রকাশ করেছেন যে, তাতে চেতনাসম্পন্ন, অনুভূতিশীল ও বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী সৃষ্টিকুলকেই বোঝানো হয়েছে। মানুষ ও ফেরেশতা-ই এ পর্যায়ে পড়ে, যারা মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও পূর্ণ-পরিচ্ছন্নতা বর্ণনা করে পূর্ণ চেতনা, অনুভূতি ও সমঝ-বুঝ সহকারে।

কিন্তু বহু কয়জন তাফসীর লেখক এই মত মেনে নিতে রাযী নন। তাঁরা বলেছেন, مَا বলতে সাধারণ সৃষ্টিকুল—বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিহীন উভয় শ্রেণীর সৃষ্টিই—শামিল করে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থও এ কথারই সমর্থন করে। কেননা مَا ও مَن এ দুটি শব্দের মধ্যে তাৎপর্যগত পার্থক্য এই যে,

প্রথমটি সাধারণভাবে সৃষ্টিকুল বোঝায়. আর দ্বিতীয়টি বিবেক-সম্পন্ন সৃষ্টিকে বোঝায়।

কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, যেসব বিবেক-বুদ্ধিহীন সৃষ্টির তাসবীহ্ করার কথা যে আয়াতে বলা হয়েছে ما শব্দ দ্বারা, সে পর্যায়ের অন্যান্য আয়াতে পাখি, পর্বত ও বিদ্যুতের তাসবীহ্ করার কথা বলা হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীর লেখকগণ 'তাসবীহ্' শব্দের আরও কিছু তাৎপর্য লিখেছেন; কিন্তু তা তাসবীহ্ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্যের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। কয়েকটি মতের উল্লেখ এখানে করা হচ্ছেঃ

প্রথম মতঃ এই মতে বলা হয়েছে, তাসবীহ্ অর্থ প্রাকৃতিক তাসবীহ। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তুই 'নতুন'। তার এই নতুনত্বই সাক্ষ্য দেয় যে, একজন নির্মাতা—সৃষ্টিকর্তা আছেন। এমনকি মুখে আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে এমন জড়বাদী নাস্তিকও স্বীয় অস্তিত্ব দিয়ে একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

এ মতটি মূলত যথার্থ হলেও একে 'তাসবীহ' শব্দের সঠিক তাফসীর মনে করা যায় না, তা গ্রহণযোগ্যও নয়। কেননা পূর্বেই বলেছি, 'তাসবীহ্' শব্দের তাৎপর্যে تَنْزِيه ও تَقْدِيس সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষ থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার কথা প্রকাশ করার তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কিন্তু বড় বস্তুসমূহের নিছক অস্তিত্ব দিয়েই এই তাৎপর্য পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় মতঃ এই মতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাসবীহ্ অর্থ 'প্রাকৃতিক বিনয়, ও আনুগত্য, যা প্রাকৃতিক প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্র ইচ্ছা ও বিধানের সমীপে পেশ করে।' নির্বিশেষে প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ্র ইচ্ছার সম্মুখে কিভাবে আত্মনিবেদন করে আছে—তা কেবল অস্তিত্ব গ্রহণের মাধ্যমে হোক কিংবা বিশ্বলোকে আল্লাহ্র জারী করা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে হোক—তা আমরা আমাদের অনুভূতি (Intuition) দ্বারা বুঝতে পারি। আল্লাহ্র এ উচ্চতর ইচ্ছার নিরংকুশ আনুগত্য এবং আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত এ প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণই হচ্ছে কুরআনে কথিত 'তাসবীহ'। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই মতের ধারকগণ কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিকে তাঁদের মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে পেশ করেছেনঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ* (حم السجدة: ١١)

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দৃঢ় নিশ্চিত স্থির সংকল্প প্রকাশ করলেন. তখন তা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ, তার পরে তিনি তাকে ও পৃথিবীকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা উভয়ই আস—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। ওরা দুটি বললঃ আমরা অনুগত হয়েই আসলাম।

এ আয়াতের আলোকে যে সব আয়াতে আসমান-যমীনের সিজ্দা ও বিনয়ের কথা বলা হয়েছে, সেসব উপরিউক্ত মতের সমর্থন বলে মনে করা যায়।

কিন্তু আমরা মনে করি. এই ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। কেননা জিনিসগুলো সামগ্রিক ও তার সমস্ত অংশসহ অস্তিত্ব এবং আল্লাহ্র কার্যকর করা নিয়মাদি ও আইন পালনের কথা দ্বারা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা বর্ণনা করা হয়—এমন কথা বলা যায় না। এ দুটি মত নিজস্বভাবে যথার্থ হলেও এ দুটিকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করা উচিত নয়।

তৃতীয় মতঃ সাধারণভাবে 'তাসবীহ'র ব্যাখ্যা দিয়ে অন্যান্য কয়েকজন মুফাসসির বলেছেনঃ এই বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি জিনিসের অস্তিত্ব দান ও রূপায়ণে যে বিস্ময়কর ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে রয়েছে এবং তাতে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতা নিহিত, তা এক উচ্চতর কুদরাত, হিকমত—সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা এবং নিরংকুশ জ্ঞান তার স্রষ্টার আছে বলে প্রমাণ করে। সেই সাথে তিনি-যে সকল প্রকারের অজ্ঞতা-মুর্খতা-অক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র, তা-ও প্রমাণ করে। 'তাসবীহ' শব্দটি তাঁর পূর্ণত্ব প্রমাণকারী ও তাঁর নেতিবাচক গুণের প্রতিবাদকারী হওয়া বোঝালেই যথেষ্ট।

তাছাড়া একটি একক ব্যবস্থা সমগ্র সৃষ্টলোক ও তার অণু-পরমাণুকে পর্যন্ত গ্রাস করে আছে, তাও প্রমাণ করে যে, একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, এই সৃষ্টিকর্মে অন্য কারোরই একবিন্দু দখল নেই, অংশীদারিত্ব নেই। এই একক ব্যবস্থাকারীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে, তাঁর সাথে কারোরই শরীক না থাকার কথাও প্রমাণ করে। এই সাক্ষ্য ও প্রমাণই আল্লাহ্র শরীক থেকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার কথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

সৃষ্টিলোকের সমগ্র অংশের উপর একটি মাত্র ব্যবস্থার প্রাধান্য যেমন এক ও অনন্য ব্যবস্থাপকের অস্তিত্ব প্রমাণ করে—যিনি সমগ্র বিশ্বলোক সৃষ্টিলোককে শাসন-নিয়ন্ত্রণ-পরিচালন করছেন, তেমনি তার সৃষ্টার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম জ্ঞান. ইল্ম ও নির্ধারণ ইত্যাদিও নিঃসন্দেহে স্পষ্ট করে তুলে। তিনি যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা থেকেও পবিত্র. তাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়।

উপরিউক্ত মত সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য রয়েছে।

(ক) সাধারণভাবে সব কিছুরই আল্লাহ্‌র 'তাসবীহ' করার অর্থ যদি এই হয়, তাহলে وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 'কিন্তু তোমরা ওদের তাসবীহ্ বুঝতে পার না' বলার কোন মানে হয় না।

কেউ কেউ অবশ্য لَا تَفْقَهُونَ 'তোমরা বুঝতে পার না' এই কথার অর্থ বলেছেনঃ 'সেদিকে ভ্রুক্ষেপ কর না,' 'সে বিষয়ে অবহিত নও।' কেননা মানুষ বস্তুবাদের মধ্যে এতই ডুবে থাকে যে, সমগ্র সৃষ্টিলোকের আল্লাহ্‌র সর্বপ্রকার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না।

কিন্তু এরূপ অর্থ আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যের পরিপন্থী। কেননা সেই কথা বলা-ই যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তাহলে তিনি বলতে পারতেনঃ 'তোমরা যখন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে, মনোযোগ দেবে, তখনই তা বুঝতে পারবে'। কিন্তু তা তো তিনি বলেন নি।

(খ) সৃষ্টিকুলের 'তাসবীহ্' করার তাৎপর্য যদি তা-ই হয়, যা উক্ত মতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—অর্থাৎ বস্তুসমূহের সৃষ্টির মধ্যে নিহিত তার স্রষ্টার সকল অজ্ঞতা-মুর্খতা দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়ার তত্ত্ব অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব, তাহলে পাখি ইত্যাদি প্রাণীর পক্ষে তাঁর তাসবীহ্ ও পবিত্রতা বর্ণনা বুঝতে পারা—তার নিগুঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করতে সমর্থ হওয়ার কথা কুরআনে কেন বলা হলো?

(গ) 'সমগ্র বিশ্বলোক আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করে' একথার যে তাৎপর্য উক্ত মতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তা যদি যথার্থ হতো, তাহলে সে তাসবীহর জন্য বিশেষ ও নির্দিষ্ট সময়ে তাসবীহ্ করার কথা বলা হলো কেন? তা সার্বক্ষণিকভাবে হওয়ার কথা বললেই সত্য কথা বলা হতো।

চতুর্থ মতঃ কোন কোন মুসলিম দার্শনিক এই 'তাসবীহ্' সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেছেনঃ

'গোটা সৃষ্টিলোক তার সমস্ত অংশসহ আল্লাহ্‌র 'হামদ' সহকারে তাসবীহ্ করে—তার তারীফ বা প্রশংসা করে পূর্ণ চেতনা ও অনুভূতি সহকারেই।

তার অর্থ, সৃষ্টিলোকের সব কিছুরই কিছু-না-কিছু মাত্রার চেতনা ও অনুভূতি রয়েছে। সেই চেতনা ও অনুভূতির ভিত্তিতেই তা সৃষ্টিকর্তার তাসবীহ্ করে। তা ঘোষণা করে যে, তার স্রষ্টা সকল প্রকারের দুর্বলতা-অক্ষমতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। অতঃপর বলা হয়েছে, এই অস্তিত্বমান জগতের

বস্তুসমূহের সকল পর্যায়ের জিনিসেই জ্ঞান, অনুভূতি ও চেতনা রয়েছে। তা শুরু হয়েছে মহান আল্লাহ্ থেকে এবং বিস্তৃত হয়েছে প্রস্তর, উদ্ভিদ-সব কিছুর মধ্যে। বর্তমান ও অস্তিত্বসম্পন্ন যে কোন জিনিসেরই সাধারণ গুণ হিসেবে রয়েছে জ্ঞান, চেতনা ও জীবন। তা কোনদিনই এ গুণ থেকে বঞ্চিত হবে না। অবশ্য তা আমাদের গোচরীভূত না-ও হতে পারে। কেননা আমাদের দৃষ্টি অতটা সূক্ষ্মদর্শী নয়।

তবে বিশ্বলোকের অস্তিত্বমান জিনিসসমূহ যদি কখনও বস্তু ও বস্তুত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কার্যত নির্ব্যূঢ় বা বিমূর্ত (Abstruct) হয়ে পড়ে, তখন এই গুণসমূহের শক্তি, তীব্রতা ও স্পষ্টতা অনেক বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে তা 'বস্তু' ও 'বস্তুত্বে'র যতই ঘনিষ্ঠ হবে, তার মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে পড়বে, তখন সে সবের মধ্যে এই গুণ আনুপাতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থাও দেখা দিতে পারে, যখন এই গুণ নির্মূল ও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

কুরআনে যে বলা হয়েছেঃ বস্তুলোকের জিনিসসমূহের (موجودات) তাসবীহ্—'হে মানুষ—তোমরা অনুধাবন করতে পার না,' তা কিন্তু সাধারণ ভাবে সকল মানুষের বেলায় প্রযোজ্য নয়, তা অধিকাংশ মানুষের বেলায় সত্য। কেননা অধিকাংশ মানুষ সত্যিই তা অনুধাবন করতে অক্ষম। কিন্তু এ কথা প্রমাণ করে না যে, মানুষের মধ্যে তা বুঝবার লোক আদৌ নেই। যাদের রূহ্ বিশ্বলোক নিহিত নিগূঢ় মর্ম ও তত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত, তারা তাদের অন্তরের চোখ দ্বারা নিশ্চয়ই তা দেখতে পারে, তারা যে আল্লাহ্র মহান পবিত্রতা বর্ণনা করছে, সকল দুর্বলতা অক্ষমতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার কথা প্রকাশ করছে, তা তারা বুঝতে সক্ষম।

আমরা এই মতের আলোকে বলতে চাই, কুরআনের ঘোষণানুযায়ী প্রত্যেকটি জিনিসই যখন আল্লাহ্র তাসবীহ্ করে, তখন বুঝতে হবে, প্রত্যেকটি জিনিসেরই চেতনা ও ইল্ম রয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিসেরই রয়েছে অনুভূতি শক্তি। বস্তুত আল্লাহ্র অস্তিত্বের চেতনা সমগ্র সৃষ্টিলোকের মধ্যে সাধারণভাবেই বিস্তৃত। কুরআন বলছেঃ

১. বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি জিনিসই—তা জীবন্ত প্রাণশীল হোক, কি নির্জীব প্রাণহীন—সবেরই চেতনা রয়েছে।

২. এ কথার সত্যতা বিবেক-বুদ্ধি নিঃসৃত অকাট্য দলীল থেকেও প্রমাণিত।

এখানে উভয় দিকের আয়াত ক্রমিকভাবে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

১. কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পিঁপড়া বিশেষ ধরনের চেতনার অধিকারী। কেননা কুরআন বলেছে, যে সময় সুলায়মান (আ) ও তাঁর বাহিনী ওদের উপত্যকা অতিক্রম করছিল, তখন তার প্রজাতিকে সম্বোধন করেছিল এবং অবিলম্বে তাদের গর্তসমূহে প্রবেশ করে নিজেদের রক্ষা-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পূর্বেও এ আয়াত উদ্ধৃত হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهُ (النمل:١٨)

হে পিঁপড়েরা, শীগ্গীর করে তোমাদের বসবাস স্থানে ঢুকে পড়, নতুবা সুলায়মান ও তার বাহিনীর লোকেরা তোমাদেরকে নিষ্পেষিত করে ফেলবে।

এটা ছিল পিঁপড়েটার একটা সাবধান বাণী, সতর্কতামূলক পদক্ষেপ। আর তা ছিল প্রকৃত ও নিতান্তই বাস্তব। উক্ত ঘোষণাকে পরোক্ষ (مجازى) মনে করা ঠিক হবে না। কেননা উক্ত কথা অবস্থার কণ্ঠে (زبان حال) বলা ছিল না। কেননা সুলায়মান (আ) সে কথা শুনে মুচকি হাসি হেসে ছিলেন এবং ওদের কথা বুঝবার যে সুযোগ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দিয়েছিলেন এবং তাঁর পিতামাতার প্রতি যে নিয়ামত দান করেছিলেন, তার শোকর আদায়ের তওফীক যেন আল্লাহ্ তাঁকে দেন সেজন্য তিনি দোয়াও করেছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ (النمل: ١٩)

সুলায়মান ওর (পিঁপড়েটির) কথা শুনে মৃদু হেসে বললেনঃ হে আমার রব্ব। আমাকে এ সামর্থ্যের উপর দৃঢ় স্থির কর, আমি যেন শোকর করি তোমার সেই নিয়ামতের, যা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি দান করেছ।

২. হুদহুদ নামের এক বিশেষ পাখির কথা কুরআনে বলা হয়েছে। সে বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই পাখিটির এক বিশেষ ধরনের চেতনা ও বুদ্ধিমত্তা ছিল। তা তওহীদবাদী ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারত। সুলায়মান (আ) তাকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতেন, তা চেতনা, জ্ঞান ও বুঝ-সমঝ ছাড়া সম্পন্ন করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

এই পর্যায়ের আয়াত হচ্ছেঃ

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ* لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَا أَذْبَحَنَّهُ أَوْلَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ* فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ* إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ* وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ* أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ* (النمل: ٢٠-٢٥)

সুলায়মান পাখিকুলের খবর নিল। বললঃ ব্যাপার কি, হুদ্‌হুদকে দেখছি না কেন, সে অনুপস্থিত নাকি? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই সেটিকে কঠিন শাস্তি দেব অথবা যবেহ করব। অনতিবিলম্বে হুদ্‌হুদ এসে পড়ল এবং বললঃ আপনি যা জানতে পারেন নি, আমি তা জেনে ফেলেছি এবং সাবা থেকে সুনিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি। আমি নারীকে দেখলাম—তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার লোকজনকে দেখলাম, তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে সূর্যের উদ্দেশ্যে সিজদা করছে। শয়তান ওদের কার্যাবলীকে ওদের নিকট চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছে এবং ওদেরকে সত্য পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে ওরা সৎ পথে চলছে না। নিবৃত্ত করেছে এজন্য যে, ওরা যেন আল্লাহ্‌কে সিজদা না করে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ করে দাও।

এই কথাগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ বিস্ময়কর পাখিটি সব সূক্ষ্ম জটিল ব্যাপার স্পষ্ট অনুধাবন করছে, পূর্ণ বিশ্বস্ততা সহকারে সে বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছে এবং তার মুনিবের সব নির্দেশ যথাযথভাবেই পালন করছে।

এ থেকে কি বোঝা যায় না যে, পাখিকুল বিশেষ চেতনা, অনুভূতি ও জ্ঞানের অধিকারী? অবশ্য তা সেই মাত্রায় যা ওর জন্য উপযোগী, যেন ওর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেতে সক্ষম হয়, ততটুকুই।

৩. হযরত সুলায়মান (আ) পাখির কথা বুঝতেন বলে কুরআনে বলা হয়েছে। তাতে প্রামণিত হয় যে, পাখির একটা বিশেষ ভাষা আছে এবং আছে চেতনা। বলা হয়েছেঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ

(النمل:١٦)

সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল এবং সে বলেছিল, হে জনগণ! আমাকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

কুরআনে এ-ও বলা হয়েছে যে, সুলায়মান (আ) মানুষ, জ্বিন ও পাখিদের সমন্বয়ে একটি বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। তারা সকলেই তাঁর আদেশ পালনকারী ছিল। তাঁর ইশারানুযায়ী তারা কাজ করত।

বলা হয়েছেঃ

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَٰنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ (النمل: ١٧)

এবং সুলায়মানের জন্য জ্বিন, মানুষ ও পাখি সমন্বয়ে তার সেনাবাহিনী সংগঠিত করা হয়েছিল।

মোট কথা, এই পর্যায়ের আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, পাখিকুল ও পিপীলিকা এক ধরনের অনুধাবন ও চেতনার অধিকারী। মানুষকে যদি সমগ্র বিশ্বলোকের উপর কর্তৃত্ব চালানোর সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে তারা ওদের সাথে কথা বলতে ও ওদের কথা বুঝতে সক্ষম হবে। সেই বিশ্বলোকের উপর একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র নিরংকুশ কর্তৃত্ব চলার—অন্য কথায় তওহীদের সত্যতার—অকাট্য প্রমাণও পাওয়া যাবে।

প্রস্তরলোকে চেতনার অবিস্থিতি

কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, প্রস্তর ও খনিজ পদার্থ প্রভৃতি নির্জীব-নিষ্প্রাণ সৃষ্টির মধ্যেও চেতনা ও অনুভূতি রয়েছে।

কুরআন বলছে, কোন কোন প্রস্তরখণ্ড পর্বত শৃঙ্গ থেকে নিম্নে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। তার এ পতন অকারণ নয়। কুরআনের দাবি হচ্ছে, এ পতন নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ভয় ও তজ্জনিত আতংকের পরিণতি মাত্র। একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ (البقرة:٧٤)

প্রস্তরের কোন কোন খণ্ড আল্লাহ্‌র ভয় ও আতংকে ধ্বসে পড়ে।

সাধারণত কুরআনের এই কথাটিকে ইয়াহুদীদের দিলের নির্মমতা ও কঠিনতা-কঠোরতা বোঝাবার একটা রূপক দৃষ্টান্ত বলে মনে করা হয়। যেমন বলা হয়েছে, পর্বত দীর্ণ হয়ে তা থেকে পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। কিন্তু ইয়াহুদীদের দিল নরমও হয় না, তা থেকে দয়া-মায়ার স্রোতও প্রবাহিত হয় না।

আর তাই যদি হয়, তাহলে এ কথাটিকে সাধারণভাবে সৃষ্টিলোকে চেতনার অবস্থিতি পর্যায়ে প্রমাণ বা দলীল হিসেবে পেশ করার সুযোগ থাকে না।

কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপর এরূপ কথার কোন প্রভাব পড়ছে না। কেননা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হলেও এ থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, প্রস্তরেরও চেতনা রয়েছে। কুরআন প্রস্তরের দুটি গুণের কথা বলেছে। একটি হচ্ছেঃ التفجير। প্রস্রবণ ফুটে প্রবাহিত হওয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র ভয়ে নিচে পড়ে যাওয়া। লৌহ দৃঢ় পর্বত দীর্ণ হয়ে প্রস্রবণ প্রবাহিত হওয়া একটি বাস্তব সত্য। অনুরূপভাবে প্রস্তর খণ্ডের পাহাড়ের উপরের দিক থেকে নিচে গড়িয়ে পড়াও একান্তই সত্য ও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তবে কুরআনের দাবি হচ্ছে, তা ঘটে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়ে ও আতংকে।

অপর আয়াতে আসমান-যমীন ও পর্বতের প্রতি আমানতের দায়িত্ব গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে এবং এসব জিনিস তা গ্রহণ করতে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়েই অস্বীকৃতি জানিয়েছে, ভয় প্রকাশ করেছে বলে দাবি করা হয়েছে আয়াতটি এইঃ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (الاحزاب: ٧٢)

আমরা নিশ্চিতভাবে আসমান-যমীন ও পর্বতমালার নিকট আমানত পেশ করেছিলাম। কিন্তু ওরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে এবং তা গ্রহণ করতে ভয় পেয়েছে। অবশ্য মানুষ তা গ্রহণ করেছে।

কোন কোন তাফসীরে অবশ্য এ আয়াতের . مجازى . বা পরোক্ষ তাৎপর্য বলা হয়েছে। মত প্রকাশ করা হয়েছে, কুরআনের উদ্ধৃত এসব কথা আসলে 'অবস্থার কণ্ঠে' বলা কথা। কথা বলার মানবীয় ধরনে বলা কথা এ নয়। কেননা ঠিক কথা বলার ধরনে তা বলা হয়েছে একথা মেনে নিলে সঙ্গে সঙ্গেই মানতে হয় যে, ওদেরও চেতনা, সংবেদনশীলতা ও বুঝ-সমঝ আছে।

আমরা এসব আয়াতকে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণকরা জরুরী মনে করি। এর ভিন্ন ধরনের বা অবাস্তব ব্যাখ্যা দেয়ার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই থাকতে পারে বলে আমরা স্বীকার করি না। ওসব নিষ্প্রাণ-নির্জীব বস্তুর চেতনা আছে, আমরা তা অনুভব করতে পারছি না কেবল এই কারণেই ওর কোন-না-কোন ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিতে হবে, এমন কথা মেনে নেয়া যায় না। কেননা অনেক বিষয়েই মানুষের জ্ঞান নেই, তাই বলে সেই জিনিসের অস্তিত্ব নেই—এমন কথা বলার কি অধিকার থাকতে পারে?

অপর আয়াতে বলা হয়েছেঃ

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ (الحشر : ٢١)

আমরা যদি এই কুরআন পর্বতের উপর নাযিল করতাম, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি পর্বতকে ভীত-আতংকিত ও আল্লাহ্র ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় দেখতে পেতে।

অন্যথা চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে বাস্তবতার দৃষ্টিতে আয়াতটি বিবেচনা করা হলে সহজেই আমরা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হব যে, পর্বতেরও ভীত-সন্ত্রস্ত-আতংকিত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় সংবেদনশীলতা রয়েছে। না থাকলে কুরআন নিশ্চয়ই এ ধরনের 'আজগুবী' (?) কথা বলতো না।

বলা যেতে পারে যে, আয়াতটির আসল বক্তব্য হচ্ছে কুরআনের বিরাটত্ব ও মহানত্ব প্রকাশ করা। তাতে পর্বতের চেতনা থাকার আবশ্যিকতা বোঝা যায় না। এরূপ কথা বলার কারণ হচ্ছে, আগেই হয়ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রূপে ধরে নেয়া হয়েছে যে, পর্বতের চেতনা বলতে কিছুই নেই। আর এই কারণে ওরূপ কথা চিন্তা করা হয়েছে। তাই সে চিন্তা থেকে মন-মগজকে মুক্ত করে যদি বিবেচনা করা যায়, তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আয়াতটিতে কুরআনের বিরাটত্ব মহানত্ব ব্যক্ত করার সাথে সাথে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পর্বতেরও চেতনা-সংবেদনশীলতা রয়েছে। পাহাড়ও বাস্তবভাবেই ভীতসন্ত্রস্ত ও নিবেদিত বিনত হতে পারে। প্রথম কথাটি মেনে নিলে দ্বিতীয় কথাটি মেনে নেয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকতে পারে না। অন্যান্য আয়াত থেকেও পর্বতের চেতনার কথা বোঝা যায়। যেমনঃ

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ (ابراهيم: ٤٦)

তারা নিজেদের সব কলা-কৌশল প্রয়োগ করে দেখেছে; কিন্তু ওদের প্রত্যেকটি অপকৌশলের জবাব আল্লাহ্‌র নিকট বর্তমান ছিল, যদিও ওদের কৌশলগুলো এমন সাংঘাতিক ছিল যে, তাতে পর্বত নড়ে উঠতে পারত।

এ আয়াতটিও এই পর্যায়েরঃ

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا- (مريم: ٩٠)

উপক্রম হয়েছিল যে, আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে ও পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে।

পর্বতের পক্ষে যদি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিপতিত হওয়া, যমীনের পক্ষে খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া এবং আকাশমণ্ডলীর বিদীর্ণ হওয়া মূলতই সম্ভবপর না হতো, তাহলে কুরআন নিশ্চয়ই এরূপ কথা বলত না। আর বললেও তার ভিন্নতর ও বোধগম্য কোন তাৎপর্য বলার আবশ্যকতা দেখা দিত। কিন্তু এখানে তা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

কুরআনে একথাও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সকল রহস্যজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে নিগূঢ় সত্য উদঘাটিত ও দিনের আলোকের মত উদ্ভাসিত হয়ে

উঠবে। তখন ব্যক্তির হাত, পা ও চামড়া পর্যন্ত আল্লাহ্র ভয়ে ও আদেশক্রমে ব্যক্তির 'আমল' সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় সাক্ষ্য দেবে। সে পর্যায়ের আয়াত এইঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ * (يس: ٦٥)

আজকের দিনে তাদের কথা বলার মুখ বন্ধ করে দেব, আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত এবং তারা যা 'আমল' করেছে তার সাক্ষ্য দিবে তাদের পা।

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُوْنَ * حَتّٰى اِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ * وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ * (حم السجدة: ١٩-٢١)

যেদিন আল্লাহ্র দুশমনদের জাহান্নামের নিকটে একত্রিত করা হবে, তারা সকলে সমবেত হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত তখন তারা জাহান্নামের মুখে এসে যাবে তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও তাদের চামড়া তাদের আমল সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। ওরা ওদের চামড়াকে বলবে, তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? ওরা বলবে, আল্লাহ্ আমাদের দ্বারা কথা বলিয়েছেন, যিনি সব জিনিসকেই কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই তো তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা ফিরে যাবে।

উদ্ধৃত গোটা আয়াত যদিও পরকালে সংঘটিতব্য বিষয়ে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদানের ব্যাপার ঘটবে ইহকালে নয়,—পরকালে; কিন্তু সেই সাথে আয়াতটি থেকে একথাও নিঃসন্দেহে জানা যাচ্ছে যে, মানুষের চামড়া হাত ও পায়ের 'চেতনা' রয়েছে, কথা বলার শক্তি মূলত আছে, যদিও এখন বলছে না। কিন্তু পরকালে যা ঘটবে, দুনিয়ায় তা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়, এ দুয়ের মাঝে মৌলিকভাবে কোন বৈপরীত্য নেই।

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে জমিও কথা বলবে। তার উপর যা যা সংঘটিত হয়েছ, তা সে অকাতরে ও অকপটে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেবে। বলা হয়েছেঃ

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا * (الزلزال: ٤-٥)

সে দিন (কিয়ামতের দিন) যমীন তার সব খবর বলে দেবে। কেননা তার রব্ব তাকে এই নির্দেশ-ই দিয়েছেন।

সূরা হা-মীম আস্-সিজদা'র ১১ আয়াতেও আসমান যমীনের কথা বলা হয়েছে। আয়াতটি পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে।

এসব আয়াত সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে চিন্তা করলে মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে, এই বিশ্বলোকের সকল অংশে চেতনা সমঝ-বুঝ ও কথা বলার যোগ্যতা আছে। আর এটাই হচ্ছে কুরআনের দাবি। কিন্তু তা বাস্তবিক পক্ষে কিভাবে সংঘটিত হবে? ... সে বিষয়ে বিভিন্ন আয়াতের আলোকে শুধু এতটুকুই বলা যায় যে, তা সবই একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুক্রমেই সম্ভব হবে। এছাড়া আমরা আর কিছু জানি না, আর কিছু বলতে পারি না। কিন্তু আমরা কোন বিষয়ে জানি না বা তার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারিনে বলে তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করব, এমন অধিকার বস্তুতই আমাদের নেই, আল্লাহ্-ই আমাদের তা দেন নি।

বিবেক-বুদ্ধির ফয়সালা

১. বিশ্বলোকের মহান মৌল এবং সমস্ত কীর্তিকলাপ ও পূর্ণত্বের উৎস হচ্ছে 'অস্তিত্ব' (Existence)। বস্তুগত ও ভাবগত সকল অবদানের মৌল উৎসই তা। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শক্তি-ক্ষমতার জন্মস্থান, জীবন ও অনুভূতি স্বজ্ঞার কেন্দ্রবিন্দু।

সবকিছুই বস্তুসমূহের অস্তিত্ব থেকে উৎসারিত। তার গুরুত্ব এত বেশী যে, মাঝখান থেকে সে অস্তিত্ব উঠে গেলে সমস্ত গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে, থেমে যাবে সমস্ত কর্ম-তৎপরতা, সমস্ত অবদান নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর শেষ পর্যন্ত সবকিছুই অস্তিত্বহীনতার গভীর অন্ধকারে মহাসাগরের অতল গভীরে তলিয়ে যাবে।

২. অস্তিত্ব—তা 'ওয়াজিব,' মুম্‌কিন—সম্ভব, নির্ব্যূঢ় বা বিমূর্ত ও বস্তুগত এবং অস্থায়ী ও সার-নির্যাস (Substance) প্রভৃতি পর্যায়ের কোন একটি পর্যায়ে এক ও অভিন্ন মহাসত্যের প্রতীক।

অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত মহাসত্য (Ultimate Reality) আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত না হলেও আমরা তা মানসিক বুঝ-সমঝের ধারাবাহিকতার সাহায্যে অনুধাবন করতে—তার সাথে পরিচিত হতে খুবই সক্ষম হতে পারি। আমরা

বলতে পারি, অস্তিত্ব হচ্ছে তা যেখানে অস্তিত্বহীনতা (عــدم) বিতাড়িত, অনুপস্থিত। বস্তুর সারবত্তা তারই অবদান, 'বস্তু'র অভিব্যক্তি তা থেকেই সম্ভব হয়।

অন্য কথায় অস্তিত্ব (وجود) উত্তমতর হোক, নীচ ও হীন হোক, 'ওয়াজিব' হোক, মুস্‌কিন হোক, এক অভিন্ন মহাসত্য বিশেষ। তাছাড়া অন্য কিছু নয় তা। তার স্তর ও পর্যায়ের পার্থক্যের অনুপাতে তীব্রতা, কঠিনতা-কঠোরতা ও দুর্বলতার দিক দিয়ে তাতে পার্থক্য সংঘটিত হয়। তখন সেই তীব্রতা-কঠিনতা-কঠোরতা সেই মূল অস্তিত্বেরই নিজস্ব গুণ, বাইরে থেকে তা তার সাথে এসে শামিল হয়ে যাওয়া কোন জিনিস নয়। আর দুর্বলতা? তাও সেই অস্তিত্বেরই সসীমতার মধ্যের ব্যাপার।

বলেছি, অস্তিত্ব তার সকল পর্যায়ে এক অভিন্ন সত্য মাত্র। আমরা এখানে সেই মহা একক সত্যের কথাই বোঝাতে চাচ্ছি, যা অনস্তিত্ব বিতাড়নকারী। আমরা যখন তাকেই সকল পূর্ণতার উৎস মনে করি, বুঝব, তার একটি মাত্র বাস্তবতা—অধিক নয়, তখন আমরা এ সিদ্ধান্তে সহজেই পৌঁছতে পারি যে, অস্তিত্ব যখন তার কোন এক পর্যায়ে—যেমন প্রাণী ও জীব-জন্তুর অস্তিত্ব—জ্ঞান ও চেতন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার অধিকারী হবে, তখন 'অস্তিত্বে'র সকল পর্যায়ে অস্তিত্বের অনুপাত অনুযায়ী সেই প্রতিক্রিয়ার সক্রিয় থাকা একান্তই জরুরী হয়ে পড়ে।

আর ভিন্নতর অবস্থায় অস্তিত্ব হয় পূর্ণত্ব ও ক্রিয়ার উৎস হবে না, অথবা আমরা অস্তিত্বের জন্য পরস্পর বিরোধী সত্যকে মেনে নেব, অর্থাৎ তার সত্যতাকে প্রাণী ও জীব-জন্তুর পর্যায়ে যা হবে তা উদ্ভিদ ও প্রস্তর স্তর থেকে সম্পূর্ণ বিরোধী বল্লে মেনে নেব। কেননা একই সত্যের এক পর্যায়ে নির্দিষ্ট ক্রিয়া মেনে নেব, যা ভিন্ন পর্যায়ে হবে না তা কখনই যুক্তিসঙ্গত ও বিবেক সম্মত নয়।

অন্য কথায় অস্তিত্ব যখন পরস্পর বিরোধী সত্যের ধারক হয়, তখন এক ক্ষেত্রে তার একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়া হওয়া এবং অপর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ক্রিয়া হওয়া যেমন অস্বাভাবিক নয়, তেমনি নয় অবৈধ।

কিন্তু সে অস্তিত্বে যদি এক ও অভিন্ন সত্যতা (Reality) হয় এবং তার প্রকাশ যদি কঠোরতা-কঠিনতা ও দুর্বলতা ছাড়া অন্যভাবে ও ক্ষেত্রে বিভিন্ন না হয়, তাহলে তা কোন ক্ষেত্রে এক ধরনের ক্রিয়া দেখাবে, আর অন্য ক্ষেত্রে তা হারিয়ে যাবে, এরূপ মনে করার কোনই অর্থ হতে পারে না।

কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের জাহিরী তাৎপর্য থেকে আমরা উপরিউক্ত তত্ত্বেরই সমর্থন পাচ্ছি। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ
(الاسراء:٤٤)

কোন জিনিসই এমন নেই যা আল্লাহ্‌র হামদ সহকারে তাঁর তাসবীহ্ করে না (অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসই তা করে); কিন্তু তোমরা ওদের তাসবীহ্ হৃদয়ঙ্গম করতে পার না।

আধুনিক বিজ্ঞানও এই তত্ত্বকেই স্বীকার করেছে এবং নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত করেছে যে, উদ্ভিদ জগতে অনুধাবন-সমঝ-বুঝ ও জ্ঞানের অস্তিত্ব রয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী এতদূর বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, উদ্ভিদ—গাছপালা ও গুল্ম লতারও স্নায়ুমণ্ডলী (Nerves) রয়েছে মানুষের মতই। তা চিৎকার করে এবং নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। বিজ্ঞানীদের ইলেকট্রোন পরীক্ষায় তা একান্ত বাস্তব বলেই ধরা পড়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন কৃষি গবেষণাগারে শারীরবৃত্তিক (Pysiological) পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এ পর্যায়ের একটি নিরীক্ষণ কার্যে কোন জীবন্ত উদ্ভিদের শিকড় উত্তপ্ত পানিতে রাখা হলে উদ্ভিদের কষ্টবোধ জনিত ধ্বনি বের হতে শুরু হল এবং সূক্ষ্ম ধ্বনি ধারক ইলোকট্রোন যন্ত্রের সাহায্যে সে ধ্বনি শ্রুত হয়েছিল। যদিও স্বাভাবিক ও সাধারণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তা কখনই শ্রুত হবে না।

তওহীদী আকীদার ভিত্তি ও ব্যাখ্যা

কুরআন মজীদে তওহীদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ উপরিউক্ত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হলে তওহীদী আকীদাকে নিম্নোক্ত চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ

১. التوحيد فى الذات 'আল্লাহ্র মূল সত্তার একত্ব ও অবিভাজ্যতা।'

২. التوحيد فى الصفات 'গুণাবলীর দিক দিয়ে আল্লাহ্র অনন্যতা।'

৩. التوحيد فى الافعال 'কার্যাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্র একক ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব।'

৪. التوحيد فى العبادة 'ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্র একক অধিকার।'

১. আল্লাহ্র মূল সত্তার একত্ব ও অবিভাজ্যতার তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্ এক, একক। তাঁর শরীক কেউ নেই, তাঁর সদৃশ কেউ নেই। তাঁর প্রতিকৃতি বা তাঁর দৃষ্টান্ত অকল্পনীয়। শুধু তা-ই নয়, সেই সাথে এও যে, তাঁর মহান সত্তা অখণ্ড, অবিভাজ্য—অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তা বিভিন্ন খণ্ডে খণ্ডিত বা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা তা বিভিন্ন খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন অংশের সংযোজনে বা সংমিশ্রণে গড়ে উঠেনি। কোন বিশেষ রাসায়নিক বা ভাবাদর্শের বিশেষ সংমিশ্রণের ফলেও নয়—যেমন সৃষ্টিলোকের বস্তুসমূহ বিভিন্ন উপাদান উপকরণের সংমিশ্রণের ফসল।

২. গুণাবলীর দিক দিয়ে আল্লাহ্র এককত্ব ও অনন্যতার তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার বহু-বিচিত্র ধরনের গুণাবলী রয়েছে। যেমন—ইলম, কুদরাত, জীবন প্রভৃতি। কিন্তু বহুত্ব বা বিচিত্রতা কেবলমাত্র তাৎপর্যগতভাবে, বাহ্যিক অস্তিত্ব ও বাস্তবতার দিক দিয়ে এই সবই এক ও অভিন্ন। তাঁর প্রতিটি গুণ সর্বতোভাবে অপর গুণ। এ সব গুণই আল্লাহ্র মূল সত্তায় সমন্বিত, মূল সত্তার বাইরে কোনটিরই কোন অস্তিত্ব নেই।

যেমন আল্লাহ্র ইল্ম। আল্লাহ্র মূল সত্তা-ই এই গুণের ধারক। তাঁর গোটা সত্তা-ই ইল্ম। ঠিক সেই সময়েই, যখন তা আসল কুদরাত। আল্লাহ্র সত্তায় ইলম এক জিনিস, আর কুদরাত তা থেকে ভিন্নতর কিছু—এমন নয়। বরং প্রত্যেকটি অপর প্রত্যেকটির মূল। আর এ সব গুণই হচ্ছে আল্লাহ্র মহান সত্তা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আমরা প্রত্যেকে আল্লাহ্র সৃষ্ট, ঠিক সেই সময়ই আল্লাহ্র জ্ঞান-ভুক্তও। কিন্তু বাহ্যিক সমন্বয় বিধানে এ দুটি এক। আমরা যখন

আল্লাহ্র সৃষ্ট ঠিক তখনই আল্লাহ্ কর্তৃক জ্ঞাত (معلوم) দুই দিক দিয়েই অভিন্ন। আমাদের প্রত্যেকেরই আল্লাহ্র সৃষ্ট হওয়া ও জ্ঞাত হওয়া—এই দুই গুণে আমাদের গুণান্বিত হওয়াটা বাহ্যিক প্রয়োগ রূপ, একটি অপরটিরই মূল, আমাদেরও মূল সত্তা। আমাদের কিছু অংশ আল্লাহ্র ইলম ভুক্ত, আর অপর কিছু অংশ আল্লাহ্র সৃষ্ট—এরূপ নয়। বরং আমাদের সকল সত্তা একসাথে আল্লাহ্র সৃষ্টও, জ্ঞান-ভুক্তও।

৩. কার্যাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্র অনন্যতা। প্রাকৃতিক জগতে—পদার্থের ক্ষেত্রে—কার্য ও কারণের একটা পরম্পরা রয়েছে। তার স্বভাবগত লক্ষণ বা চিহ্নও রয়েছে।

যেমন সূর্য ও ঔজ্জ্বল্য—ঔজ্জ্বল্য সূর্যের কার্য ও চিহ্ন। আগুন ও জ্বালানো তার চিহ্ন ও কার্য। তরবারী ও কর্তন, কর্তন তরবারিরই চিহ্ন ও কার্য।

কার্যাবলীর ক্ষেত্রে তওহীদ হচ্ছে এই বিশ্বাস মনে স্থান দেয়া যে, এই চিহ্নগুলিও আল্লাহ্র সৃষ্ট, তার চিহ্ন। যেমন কারণসমূহ-ও তাঁরই সৃষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এসব 'কারণ' (cause)—ওসব চিহ্ন যার অবদান—আল্লাহ্ই সৃষ্ট করেছেন। তিনি সূর্যকে সৃষ্টি করে তাকে উজ্জ্বলতা দানের বিশেষত্ব দান করেছেন। তিনি আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দিয়েছেন জ্বালানোর বিশেষত্ব। তিনি তরবারির সৃষ্টা এবং তাতে তিনিই দিয়েছেন কর্তনের বিশেষত্ব। এইভাবে কার্য ও কারণ-এর এক অবিচ্ছিন্ন ধারা অব্যাহতভাবে চলেছে।

অন্য কথায়, কার্যাবলীর ক্ষেত্রে তওহীদ হচ্ছে কার্যকারণ সম্পর্কে এই জ্ঞান যে, তা সবই মহান আল্লাহ্র কাজের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরই ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের তীব্র প্রভাবেও সব নিরন্তর ঘটছে, ঘটে যাচ্ছে। এ দুনিয়ায় যা কিছুই (Beings) রয়েছে, তার কোন একটিও স্ব-ক্ষমতায় ও স্বতঃই দাঁড়িয়ে নেই। তা সবই মহান আল্লাহ্র কারণে অস্তিত্বশীল, তার কারণও স্বতই অধিষ্ঠিত নয়।

ফল কথা, মহান আল্লাহ্র শরীক কেউ নেই তাঁর মূল সত্তায় যেমন, তেমনি তাঁর কার্যকরতায়, কারণ সৃষ্টিতেও। শক্তি ক্ষমতা বলতে যা কিছু তা সবই একান্তভাবে আল্লাহ্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই কিছু নেই। যা-ই কারণ বা কর্তা তার মূল সত্তায়, প্রকৃত বাস্তবতায়, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় তা কেবলমাত্র আল্লাহ্র দরুনই। তাঁরই ইচ্ছায় এবং তাঁরই অনুগ্রহে। মানুষও এই বিশ্বলোকের অসংখ্য সত্তার মধ্যেই একটা সত্তা, বিপুল অংশের মধ্যের একটা অংশ বিশেষ। তার যা কিছু কারণত্ব ও কার্যকরতা তার কার্যাবলীর দিক দিয়ে, সেক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা ও জীবন-নিরাপত্তা, তা তার নিজের অবদান নয়। তা সবই মহান আল্লাহ্র শক্তি ও কুদরাতেরই ফসল, তারই কারণে তা আছে।

কার্যাবলীর ক্ষেত্রে 'আল্লাহ্‌র তওহীদ' প্রাকৃতিক জগতের কার্যকারণকে অস্বীকার করে না। তার ক্রিয়াশীলতারও পরিপন্থী নয় তা। তার নিত্য নতুন উদ্ভূতিরও অস্বীকৃতি নয়। এগুলো তো এ কারণসমূহের বিশেষত্ব। আসল কথা প্রকৃত প্রভাবশালী শক্তি আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারোর নয়. অন্যান্য জিনিসের যা কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, তা সবই আল্লাহ্‌র কুদরাতের অধীন। সূর্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই আলো দানের শক্তি অর্জন করে, আগুন পায় জ্বালাবার শক্তি. যেমন এ দুটির মূল সত্তাও সেই আল্লাহ্‌র কুদরাত ও সাহায্যেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। এই বিশেষত্বসমূহকে 'কারণ' হিসেবে তিনিই গড়েছেন। তিনিই এগুলির মধ্যে এই ক্রিয়ার সৃষ্টি করেছেন, যেমন সৃষ্টি করেছেন এই মূল জিনিসগুলিকে। আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সকল জিনিস ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্রষ্টা। কিন্তু তিনি নিজে কারোর অবদান নয়, এসব জিনিস ও তাতে নিহিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ব্যাপারে অন্য কারোর মুখাপেক্ষীও তিনি নন।

৪. التوحيد فى العبادة ইবাদত-বন্দেগীতে তওহীদ—আল্লাহ্‌র একক অধিকার।

অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগীর একক প্রাপক হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা। তিনি ছাড়া আর কারোরই একবিন্দু অধিকার নেই মা'বুদ হওয়ার, মা'বুদরূপে গৃহীত ও উপাসিত বা মানিত হওয়ার। পূর্ণত্ব ও কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার যত উচ্চতার শৃঙ্গেই কেউ আরোহণ করুক না কেন, কারোর নিজস্ব বলতে কিছু নেই, কেননা কোন একজনের সম্মুখে ইবাদতমূলক বিনয় গ্রহণ দুটি কারণের যে কোন একটির দরুণই হতে পারে। সে দুটি কারণ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যেতে পারে। দুটি কারণের একটি হচ্ছে, মা'বুদকে পূর্ণত্বের উচ্চতর শীর্ষে অবস্থিত হতে হবে যে, তাতে কোন প্রকারেরই একবিন্দু দোষ, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা থাকবে না। এ হচ্ছে নিরংকুশ পূর্ণত্ব।

এ দৃষ্টিতেই মা'বুদের সত্তা হতে হবে অশেষ। অস্তিত্বহীনতার কল্পনাও করা যাবে না তার ব্যাপারে, কোন এক সময়ও। তাকে হতে হবে অসীম জ্ঞানের অধিকারী, এমনভাবে যে, অজ্ঞতা-মুর্খতার সামান্য পরিমাণও তার থাকবে না। আর তার কুদরাত হতে হবে অসীম, অক্ষমতা বা দুর্বলতার একটি বিন্দু পরিমাণ-ও তার ব্যাপারে চিন্তা করা যাবে না।

এসব কারণ বা গুণ কোন সত্তায় একীভূত ও সমন্বিত হলেই কোন সুস্থ সচেতন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাকে বড় মনে করার—তার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করার ও তার নিকট বিনীত হওয়ার জন্য মনে প্রাণে প্রস্তুত হতে পারে। পারে সেই নিরংকুশ পূর্ণত্বের সমীপে দাসত্ব প্রকাশ করতে, আত্মসমর্পিত হতে।

আর দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, মানুষের অস্তিত্ব ও জীবনের মূল উৎস ও চাবিকাঠি তার হাতে নিবদ্ধ হতে হবে। তাকে হতে হবে মানুষের প্রকৃত স্রষ্টা, দেহসত্তা দানকারী, প্রাণ ও জীবনের উদ্ভাবক। সেই দেহ ও প্রাণ রক্ষা ও প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ামতসমূহের একক পরিবেশকও তাকেই হতে হবে। এমনভাবে যে, তার এই পরিবেশনা মুহূর্তের তরেও বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়তে বাধ্য হবে, তার বেঁচে থাকাই হবে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এক্ষণে বিবেচ্য, এ দুটি গুণ পূর্ণ মাত্রায় কোথায় কার নিকট আছে বলে মনে করা যায়? ...... আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর নিকট এর একবিন্দু পরিমাণও আছে বলে বিশ্বাস করা যায় কি? পরিপূর্ণ পূর্ণত্ব আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর আছে কি? মানুষকে সৃষ্টি ও তার জীবন সম্ভব করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান পরিবেশন আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর দ্বারা সম্ভব হয়েছে কি? মানব জীবনের মূল চাবিকাঠি আর কারোর নিকট রক্ষিত কি, যে সে যদি তার জীবনকে স্বয়ং মানুষের হাতেই ছেড়ে দেয় তাহলে জীবনটা এমন পরিণতি লাভ করবে যে, মনে হবে, তা কোন দিন ছিল-ই না?

বস্তুত নবী-রাসূলগণ এবং নেককার লোকেরা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছেন এজন্যই যে, তিনিই হচ্ছেন মা'বুদ হওয়ার গুণ ও যোগ্যতার পূর্ণমাত্রার অধিকারী। তাঁরা গভীর সূক্ষ্মভাবে জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা তাঁকেই 'আলেমুল গায়ব' ও পূর্ণমাত্রার সৌন্দর্য সম্পন্নরূপে পেয়েছেন। অসীম তাঁর পূর্ণত্ব। এই কারণে তাঁরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই মা'বুদ রূপে গ্রহণ করেন নি। তিনিই মানুষের একমাত্র স্রষ্টা, যাবতীয় নিয়ামতের দাতা, গোটা সৃষ্টিলোকের সবকিছুরই মূল চাবিকাঠি তাঁরই হস্তে নিবদ্ধ। ফলে ইবাদতের যোগ্য তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারে বলে তাঁরা ভাবতেও পারেননি।

ইবাদতের জন্য উপরিউক্ত দুটি কারণের সমন্বয়ে যেখানেই দেখা যাবে, তাকেই মা'বুদ রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু যে সত্তায় তা নেই, সে কখনই মা'বুদ হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। তার ইবাদত করারও কোন যুক্তি নেই, বাঞ্ছনীয়ও নয়, না সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতে, না শরীয়াতের দলীলের ভিত্তিতে।

উপরে তওহীদী আকীদা'র যে চারটি পর্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে তওহীদী আকীদার সমস্ত পর্যায় কিন্তু এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট অকাট্য আয়াতের ভিত্তিতে তওহীদী আকীদা'র আরও কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। এ পর্যায়ে পঞ্চম হচ্ছে التوحيد في الولاية কর্তৃত্ব করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র একত্ব। প্রথমত তা দুভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে الولاية التكوينية

প্রাকৃতিক কর্তৃত্ব। অর্থাৎ রবুবিয়াত—লালন-পালন, ক্রমবৃদ্ধিদান ও تدبير ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণা-বেক্ষণ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে الولاية الشريعة শরীয়াত বা জীবন বিধান প্রদানে এককত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ জীবন সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য যে আইন-বিধানের একান্ত প্রয়োজন, তা দেয়ার ব্যাপারেও আল্লাহ্‌র একক কর্তৃত্ব ও অধিকার বা মর্যাদা একান্তভাবে স্বীকৃতব্য। এ পর্যায়ের তওহীদী আকীদার তিনটি দিক স্পষ্ট।

প্রথম التوحيد فى الحاكمية 'হুকুম বা নির্দেশ' দানও জায়েয-নাজায়েয নির্ধারণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র একক কর্তৃত্ব। কুরআন মজীদ তার বহু সংখ্যক ঘোষণার মাধ্যমে এই আইন-বিধান দান পর্যায়ে তওহীদী আকীদাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। কুরআনের বক্তব্য হলো,-মানুষকে হুকুম দানের কোন অধিকার কারোই নেই। তা আছে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। মানুষ হুকুম দাতা—আইন-বিধানদাতা বা জায়েয-নাজায়েয নির্ধারণকারী হিসেবে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই যোগ্য অধিকারী রূপে মেনে নেবে। তিনি ছাড়া আর কাউকেই এ মর্যাদা দেবে না, কারোর এ অধিকার আছে বলেও আদৌ স্বীকার করবে না। মানুষের কোন অধিকারই নেই মানুষের শাসক—আইন-বিধানদাতা হয়ে বসার। তবে সে অধিকার মানুষকে দেয়া যেতে পারে শুধু এই ভাবে যে, সে নিজের ইচ্ছামত নয়, নিজের বা তারই মত অন্য মানুষের রচিত আইন-বিধান দ্বারা নয়, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র দেয়া আইন-বিধান কার্যকর করবে, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে পুরা মাত্রায় স্বীকার করে। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকার না করে এবং তাঁরই নিকট থেকে পাওয়া আইন-বিধান ছাড়া মানুষের উপর যে কোন রূপ শাসন-প্রশাসনই চালানো হবে, কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণায় তা-ই হচ্ছে 'তাগুতী শাসন'। এই তাগুতী শাষনককে মেনে নিতে বা বরদাশ্‌ত করতে, সমর্থন করতে কুরআন নিষেধ করেছে তীব্রভাবে।

কেননা 'হুকুম' দানের নিরংকুশ অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র। সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র তাঁরই নিকট নিবদ্ধ। তবে তার অর্থ কখনই এ হতে পারে না যে, আল্লাহ্ নিজে মানবীয় পৃথিবীতে নেমে এসে ও অবস্থান করে মানুষের উপর এই নিরংকুশ হুকুম দেয়ার অধিকার বা সার্বভৌমত্ব কার্যকর করবেন। তিনি নিজেই এখানকার প্রশাসন চালাবেন সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে, কোনরূপ মাধ্যম ছাড়াই। বরং এখানকার প্রশাসন বাস্তবভাবে চালাবে তো মানুষই। তবে তা সে মানুষের নিজস্ব অধিকার বলে নয়, আল্লাহ্‌র দেয়া অধিকারের বলে, তাঁরই নিকট থেকে পাওয়া অনুমতির ভিত্তিতে এবং তাঁরই নাযিল করা আইন বিধানের মাধ্যমে। যার শাসন-প্রশাসনে সে অধিকার, ভিত্তি বা মাধ্যম নেই, তা আল্লাহ্‌র

তওহীদের প্রতি ঈমানদার লোকদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বা মানবীয় হতে পারে না, ইসলামের দৃষ্টিতে তার কোন মূল্য নেই। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا (الزمر: ٤٤)

বল হে নবী! সমস্ত শাফা'আত কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য।

তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ শাফা'আত করবে না। বরং তার অর্থ হচ্ছে, শাফা'আত হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট এবং তা করতে পারবে কেবল সেই, যাকে আল্লাহ্‌ অনুমতি দেবেন। আল্লাহ্‌ যাকে তার অনুমতি দেবেন না, তার তা করার কোন অধিকারও থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়—আনুগত্য তওহীদ— التوحيد في الاطاعة

মানুষের উপর সার্বভৌমত্ব যেমন চলবে একমাত্র আল্লাহ্‌র, তেমনি মানুষ আনুগত্য ও মৌলিকভাবে স্বীকার করবে কেবলমাত্র সেই আল্লাহ্‌রই। মানুষ মৌলিকভাবে এক আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কাউকেই মানতে বাধ্য নয়, আর কারোরই একবিন্দু আনুগত্য বা অধীনতা কখনই স্বীকার করা যেতে পারে না। কেননা এ আনুগত্য—তা যে কোন দিক দিয়ে, যে কোন ব্যাপারে বা ক্ষেত্রেই হোক—পাওয়ার অধিকার আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারোরই নেই; আছে বলে কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র শরীক কেউ নেই, তা পাওয়ার জন্য দ্বন্দ্ব বা চেষ্টা করার অধিকার কারো আছে বলে স্বীকারই করা যেতে পারে না। তবে কুরআন মজীদেই আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করার নির্দেশ হয়ে থাকলে তা এজন্য নয় যে, তা পাওয়ার তার মৌলিক বা নিজস্ব কোন অধিকার রয়েছে; কিংবা মানুষ মূলত তাকে মেনে চলতে ও তার আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য। না, তা নয়। তা শুধু এ জন্য যে, আল্লাহ্‌ নিজেই তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন খোদ আল্লাহ্‌র আনুগত্য বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে, এ উদ্দেশ্যে যে, তার আনুগত্য করা হলে প্রকৃতপক্ষে সে আনুগত্যটা আল্লাহ্‌রই হবে। যে আনুগত্য আল্লাহ্‌র অনুমতি প্রাপ্ত নয় বা যে আনুগত্য করা হলে কার্যত আল্লাহ্‌র আনুগত্য হয়ে যায় না, তা করা সম্পূর্ণরূপে শির্‌ক।

আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা যায়, আল্লাহ্‌ই আদেশ করেছেন সে আনুগত্য করার। কাজেই সে আনুগত্য করা হলে কার্যত আনুগত্যটা আল্লাহ্‌রই হয়ে যায়। আর বান্দা সে আনুগত্য করতে বাধ্য। কেননা সে তো আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে

বাধ্য। আর সে আনুগত্য করে সে কার্যত আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে, অন্য কারোর নয়। আল্লাহ্ নিজেই তাকে মানবার ও আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মোট কথা, কুরআনের বিধানে মানুষের আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ্, অন্য কেউই নয়। যা করলে আল্লাহ্‌র আনুগত্য হয়, বান্দা কেবল তাই করতে বাধ্য। তাই সে করতে পারে, অন্য কিছু নয়।

তৃতীয়— التوحيد فى التقنين আইন-প্রণয়নের অধিকারে আল্লাহ্‌র এককত্ব।

বস্তুত কুরআনের ঘোষণানুযায়ী মানুষের জন্য অপরিহার্য আইন প্রণয়নের অধিকার একান্তভাবে আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট। এ অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোরই নেই, আছে বলে মেনে নেয়া যায় না। এ অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে দেয়াও যেতে পারে না। কেননা মানুষ সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত করতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র। আর সার্বভৌমত্ব যার স্বীকৃত হবে, আইন রচনার অধিকার কেবল তারই স্বীকৃত হতে পারে। যার সার্বভৌমত্ব নেই, আইন রচনার কোন অধিকারও তার নেই। এ এত বেশী যুক্তিসঙ্গত কথা যে, পাশ্চাত্যের আল্লাহ্‌হীন আইন-দর্শনেও আইন-এর সংজ্ঞা স্বরূপ বলা হয়েছেঃ আইন হচ্ছে Command of the sovereign—সার্বভৌমের নির্দেশ। এ অধিকার যাকেই দেয়া হবে, যারই আছে বলে মেনে নেয়া হবে, কুরআনের পরিভাষায় তাকেই 'রব্ব' বানানো হবে। অথচ কুরআনের ঘোষণায় 'রব্ব' হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ্। ইয়াহুদী-খৃস্টানরা আইন রচনার নিরংকুশ অধিকার দিয়েছিল তাদের পাদ্রী পুরোহিত এবং পণ্ডিত নেতাদেরকে। ফলে তারা আইন রচনার ব্যাপারে তওহীদী বিশ্বাসকে হারিয়ে ফেলে শিরক-এর জুলুমে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। এ তওহীদী আকীদাই ইসলামের রাষ্ট্রদর্শন, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রশাসন পদ্ধতির মূল উৎস। কেননা ইসলামে 'জাতির উপর ব্যক্তির শাসন' কিংবা 'জাতির উপর অপর জাতির শাসন'-এর কোন স্থান নেই। কুরআন উপস্থাপিত রাষ্ট্রদর্শন হচ্ছেঃ

حكومة لله على المجتمع بواسطة المجتمع

সমাজের উপর আল্লাহ্‌র শাসন সমষ্টির মাধ্যমে।

অথবা বলা যায়ঃ

حكومة القانون الالهى على المجمع

সমাজ-সমষ্টির উপর আল্লাহ্‌র আইনের শাসন।

বিস্তারিত দলীলভিত্তিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আলোচনায় যদিও ইসলামের তওহীদী আকীদাকে মোট সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে কিন্তু মূলত ও সংক্ষিপ্তভাবে তাকে মোট চারটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। তা হচ্ছেঃ

التوحيد فى الذات

التوحيد فى الصفات

التوحيد فى الافعال

التوحيد فى العبادة

অপর তিনটি এ শেষোক্ত ইবাদতের তওহীদ-এর শাখা মাত্র। এ পর্যায়ে আমরা এবার ওটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা এক-এক করে পেশ করতে চাচ্ছি।

১. 'আল্লাহ্‌র মূল সত্তার তওহীদ' বলতে বোঝায়, আল্লাহ্‌র সত্তা বহু খণ্ডের সংমিশ্রণ বা সংযোজনের সম্মিলিত রূপ নয় এবং এর শরীক কেউ নেই, এর কোন দৃষ্টান্ত নেই, এর সদৃশ কেউ নেই। অন্য কথায়, আল্লাহ্‌র সত্তা বহুত্বকে স্বীকার করে না। বাহ্যিক জগতে আল্লাহ্‌র প্রতিভূ বা বিকল্প, কিংবা প্রতিকৃতি অথবা প্রতিমূর্তি কল্পনা করা যায় না। এদিক দিয়ে আল্লাহ্‌র সত্তা বহুত্ব বা 'বিপুলতা' গ্রহণ করে না।

ইসলামী দর্শনে 'একত্ব'কে চার পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছেঃ

১. ব্যক্তিগত এককত্ব (সংখ্যার দিক দিয়ে)

২. লিঙ্গগত এককত্ব

৩. প্রজাতীয় এককত্ব

৪. জাতীয় এককত্ব

এ 'এককত্ব'কে 'একত্ব'ও বলা যায়। বলা যায়, এক ব্যক্তি, এক লিঙ্গ, এক প্রজাতি ও এক জাতি। এ 'একত্ব' ও এককত্ব অনেক সময় এমন ভাবে মিলে-মিশে যায় যে, এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য বোঝা যায় না। এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য এ যে, যে দুটো জিনিস একই প্রকার বা প্রজাতির মধ্যে পড়ে, সে দুটো প্রজাতি প্রকারকে ব্যক্তি বা জাতি হিসেবে 'এক' বলা হয়। যেমন জায়দ ও উমর একই মানুষ প্রজাতিভুক্ত বলে তাদের 'এক' বলা হয়। মানুষ ও অশ্ব এক অভিন্ন প্রাণী জাতিভুক্ত বলে সে দুটিকেও 'এক' বলা হয়। দুজন ছাত্র ছাত্র হিসেবে একই প্রকারের বলেও তাদেরকে 'এক' বলা হয়। এ হিসেবে সংখ্যার

দিক দিয়ে আমরা বলতে পারি না যে, আল্লাহ্ 'এক'। এ 'এক' বলা যায় সেখানে যার পরই 'দুই' সংখ্যাটি হতে পারে। কিন্তু যেখানে 'এক'-এর পর দুই বা দ্বিতীয় কেউ নেই, সেখানে শুধু 'এক' বললে যথার্থ বলা হয় না। সেখানে সে 'এক'-এর অর্থ একক, অর্থাৎ এ এক-এর পরই 'দুই' নেই। কেননা আল্লাহ্‌র মহান সত্তা কোন প্রকারেরই সংখ্যাগত বহুত্বকে স্বীকার করে না। এমনিভাবে 'ইলাহ' একটি সাধারণ অর্থবোধক শব্দ যার এক দুই তিন সম্ভব। কিন্তু 'আল্লাহ্' একটি বিশেষ নাম, তারপর 'দুই' 'তিন' বা চার বলা যায় না। কেননা তিনি একক বা অনন্য। কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ বা অনুরূপ অর্থবোধক কথা এসেছে, তথায় আল্লাহ্‌র সত্তাকে এমন একক ও অনন্য বোঝায়, যার অর্থ, এর কোন দৃষ্টান্ত বা প্রতিরূপ বা অনুরূপ কিছু নেই। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহ মহান আল্লাহ্‌র সত্তার এককত্ব ও অনন্যতা প্রমাণ করেঃ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ* (ال عمران: ١٨)

আল্লাহ্ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া কেউই 'ইলাহ' নেই। এ সাক্ষ্য ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরাও দিয়েছে সুবিচার নীতির উপর অবিচল থেকে। কেননা তিনি ছাড়া প্রকৃত ইলাহ্ কেউ হতে পারে না, তিনিই সর্বজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী।

এ পর্যায়ের আরও আয়াত হলোঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (محمد: ١٩)

আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ কেউ নেই।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (الحشر: ٢٢)

তিনি ছাড়া কেউ ইলাহ নয়।

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ (الانبياء: ٨٧)

হে আল্লাহ্! তুমি ভিন্ন কেউ ইলাহ্ নয়।

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا (النحل: ٢٠)

আমি ভিন্ন কেউ ইলাহ্ নয়।

প্রথমোক্ত আয়াতটিতে আল্লাহ্‌র একত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র ফেরেশতা ও জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। এ সাক্ষ্যদানটির তাৎপর্য কি?

হতে পারে এ৷ মৌখিক কথার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে, যেমন আমরা আমাদের কথায় ঘোষণা করি বা সাক্ষ্য দেই এ বলে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্ নিজেও ওহীর মাধ্যমে এর কালাম বা কথা নাযিল করে সেই সাক্ষ্যই দিয়েছেন। আর قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ন্যায়পরতার উপর দাঁড়িয়ে থেকে কথাটি ইঙ্গিত করছে কথা ও কাজে আল্লাহ্‌র ন্যায়পরতার দিকে। একথা জানাই আছে যে, সাক্ষ্য গ্রহণ সাক্ষীর সততা-বিশ্বস্ততা-ন্যায়পরতার উপর নির্ভরশীল। সাক্ষী সত্যবাদী, বিশ্বাস্য ও ন্যায়বাদী হলে তার সাক্ষ্যও অবশ্যই সত্য ও সঠিক হবে।

উক্ত সাক্ষ্যদানটা কর্মগতও হতে পারে। কেননা আল্লাহ্ এর এ গোটা বিশ্বলোককে সৃষ্টি করে তার উপর এক অভিন্ন নিয়ম কার্যকর করে দিয়েছেন। সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি অংশ অপরাপর অংশের সাথে সংযোজিত, ওতোপ্রোত। এ এক অভিন্ন অখণ্ড অস্তিত্ব। তা-ই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এ বিশ্বলোকের স্রষ্টা এক, একক। কেননা সব কিছুর উপর একই নিয়ম কার্যকর থাকার দরুন অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, এর ব্যবস্থাপক-পরিচালক-নিয়ন্ত্রক অবশ্যই এক ও অভিন্ন হবে। এক 'সুসংবদ্ধ ইচ্ছা' সমগ্র জগতের উপর সদা ক্রিয়াশীল হয়ে আছে। এখানে দু'জন বা ততোধিক প্রশাসক থাকলে বিশ্বপ্রকৃতি নিহিত এ নিয়ম ও শৃঙ্খলা কখনই স্থায়ী হয়ে থাকতো না। এখানে সৃষ্টিলোকের অংশগুলির মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য ও মিল-মিশ থাকতে পারতো না। অবশ্য ফেরেশতা ও জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারটি মৌখিক বটে। তাই আল্লাহ্, ফেরেশতা এবং জ্ঞানী-বিজ্ঞানী এ তিন জনেরই সাক্ষ্য মৌখিক বা কথার মাধ্যমে ধরে নিলেও কোন ব্যত্যিম হয় না। এ সাক্ষ্যদানের কথা নিম্নোদ্ধৃত আয়াতেও বলা হয়েছে।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا* (النساء: ٦١)

বরং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন তোমার প্রতি নাযিল করা কিতাবের মাধ্যমে। তা তো তিনি জ্ঞান সহকারে নাযিল করেছেন। আর ফেরেশতারাও এরই সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্-ই তো যথেষ্ট।

এ দুটো আয়াতে কথার মাধ্যমে সাক্ষ্যদানের অর্থ গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়, যা

ওহীর সূত্রে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন। সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সাক্ষীর সততা-সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা-ন্যায়পরতার এক সর্বজন স্বীকৃত শর্ত। আর আল্লাহ্ তা'আলা অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী ন্যায়পর আর কে হতে পারে। কাজেই তিনি নিজেই যখন এর নিজের এককত্ব ও অনন্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তখন তা অবশ্যই গৃহীত হবে এবং এ ক্ষেত্রের পূঞ্জীভূত সকল শোবাহ সন্দেহ অবশ্যই দূরীভূত হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্র এ সাক্ষ্য কুরআন মজীদে উদ্ধৃত। আর কুরআন যে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কালাম তা তো দেড় হাজার বছরের উদাত্ত চ্যালেঞ্জের মাধ্যমেও অকাট্যভাবে প্রমাণিএ হয়ে আছে।

ফেরেশতাদের সাক্ষ্যদানের কথাটিও কুরআনেই ঘোষিত। বলা হয়েছেঃ

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ (الشورى: ٥)

ফেরেশতাগণ সর্বক্ষণই তাদের রব্ব-এর হামদ সহকারে পবিত্রতা বর্ণনায় নিরত।

এ পবিত্রতা সকল প্রকারের দুর্বলতা অক্ষমতা থেকে, বহুত্বের আবিলতা ও অংশীদারিত্ব থেকে। আর জ্ঞানী-বিজ্ঞানীগণ আল্লাহ্র এককত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় বিভিন্ন প্রকারের বলিষ্ঠ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মানব প্রকৃতি। মানব প্রকৃতি সম্পর্কে এ অভিজ্ঞতা সকলেরই রয়েছে যে, মানুষ যখন কঠিন বিপদে নিপতিত হয়, তখন সে একান্তভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করে একমাত্র আল্লাহ্র নিকট, হৃদয়মনে এ দৃঢ় গভীর বিশ্বাস নিয়ে যে, আসন্ন সমাচ্ছন্ন বিপদ থেকে তাকে কেবলমাত্র সেই এক আল্লাহ্ই রক্ষা করতে পারেন, আর কেউ নয়। এ চিরন্তন ব্যাপার। আর এ আল্লাহ্র একত্ব ও এককত্বের অকাট্য দলীল। আল্লাহ্র এ এককত্ব, অনন্যতা ও দৃষ্টান্তহীনতা-সমকক্ষ-হীনতার ঘোষণা রয়েছে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহেওঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشورى: ١١)

এর মত কেউ নেই, কিছু নেই।

لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

তার সমকক্ষ কেউ-ই নেই, হতে পারে না।

আল্লাহ্র সমকক্ষ কি কেউ হএে পারে না? ......না, হতে পারে বটে, তবে তা কেউ-ই নেই? ... ... এবং তা ঘটনাবশত মাত্র। অন্যথায় হওয়াটা অসম্ভব নয়? ... তাই কি?

কুরআন ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল বলছে, আল্লাহ্‌র সমকক্ষ হওয়াটা আদপেই সম্ভব নয়।

দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌র মহান সত্তার এককত্ব পর্যায়ে দুটি দিক দিয়ে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন।

একটি, আল্লাহ্‌র সত্তা সীমাহীন। আর সীমাহীন সত্তা কখনই 'বহু' হতে পারে না।

দুই, আল্লাহ্‌র সত্তা নিরংকুশ। অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্তা-ও একটিই হতে পারে, একাধিক নয়।

এ যুক্তিদ্বয়ের বিশ্লেষণে প্রথমটির পর্যায়ে আমাদেরকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে, আল্লাহ্‌র সত্তা অনন্ত, অসীম। কেননা যা সসীম তা এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। যেমন বড় আকারের কোন গ্রন্থ। তার চারটি দিকের যে-কোন দিকে তাকালেই এমন একটা প্রান্ত দৃষ্টিগোচর হয় যে, তারপর আর কিছুই নেই। অথবা যেমন হিমালয় পর্বত। তার বিরাটত্ব বিশালতা থাকা সত্ত্বেও তার সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। এ পর্বতমালার দুটি পর্বতের মাঝখানে এমন শূন্যতা রয়েছে যেখানে কোন পাহাড় নেই। এ থেকেও প্রমাণিত হলো যে, দুটি পাহাড়-ই সসীম। এ থেকে একথাও বোঝা যায় যে, সময়ের দিক দিয়ে যে-কোন ঘটনার সীমাবদ্ধতা কিংবা স্থানের দিক দিয়ে যে কোন অবয়বের সসীমতা অস্তিত্বহীনতায় পর্যবসিত হবে অনিবার্যভাবে। কেননা সসীমতা ও অস্তিত্বহীনতা পরস্পরের জন্য অপরিহার্য। অস্তিত্বের জগতের সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতা যখন অস্তিত্বহীনতায় পর্যবসিত, তখন আমরা অনায়াসেই বলতে পারি, অমুক ঘটনা অমুক সময়ে ঘটেনি বা অমুক জিসিনটি অমুক স্থানে পাওয়া যায়নি।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, আল্লাহ্‌র সত্তাকে কোনক্রমেই 'সীমিত' বলা যায় না। কেননা যা সসীম তা অনিবার্যভাবে নিঃশেষ-এ পরিণত। আর অস্তিত্বহীনতা সম্পন্ন যে অস্তিত্ব, তার অস্তিত্বশীলতাই অর্থহীন। আল্লাহ্‌র প্রসঙ্গে এরূপ অস্তিত্বের কথা অপ্রাসঙ্গিক ও অস্বাভাবিক। কেননা আল্লাহ্ তো সব কিছুরই অস্তিত্বদানকারী, নিত্যনতুন সৃষ্টিকারী, রক্ষণা-বেক্ষণকারী ও লালন-পালনকারী। এাকে শতকরা একশ' ভাগই (বরং ততোধিক) জীবন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। অন্যথায় গোটা সৃষ্টিলোকই অচল ও লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে। আল্লাহ্ সম্পর্কে কুরআন ও বুদ্ধিবৃত্তি— উভয়েরই এ যুক্তি চির অকাট্য।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ

(الحج: ٦٢)

তা এজন্য যে, আল্লাহ্ই হচ্ছেন চির সত্য-প্রতিষ্ঠিত এবং এাকে বাদ দিয়ে ওরা যাদের ডাকে—ইবাদত করে, তা সবই চির-বাতিল (স্থিতিহীন, অপ্রতিষ্ঠিত)।

বস্তুত আল্লাহ্র সত্তায় সসীমতা বা সীমাবদ্ধতার কারণসমূহ (Fctors) অনুপস্থিত। সময় ও কাল এবং স্থান-এর দিক দিয়ে তা বিবেচ্য। কেননা phenomenon ও অবয়বসমূহের সীমাবদ্ধতার এ দুটিই হচ্ছে প্রধান কারণ।

যে ঘটনা কালের কোন একটা বিশেষ সময়ে সংঘটিত হয়, তা সেই সময়ের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। তাই স্বভাবত তা সময়ের অন্য পরিসরে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অনুরূপভাবে একটি অবয়ব একটি নির্দিষ্ট স্থান পরিবেষ্টনীর অধিকারী। স্বাভাবিকভাবেই তা অপর স্থানের পরিবেষ্টনে একেবারে অনুপস্থিত। 'সসীমতা' বা 'সীমাবদ্ধতার এটাই বাস্তব রূপ'। অতএব আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্থান ও কাল-এর (Time and space) বন্ধন মুক্ত ও তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ কারণে আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন 'স্থান' বা 'কাল'-এর ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই এ উভয় দিক দিয়েই আল্লাহ্কে "অসীম' 'অনন্ত' মেনে নিতে হবে।

যে কোন জিনিসই পরিমাণ ও গুণ-এ ভূষিত হয়। ফলে একটি সীমায় তা হয় সীমাবদ্ধ। কেননা নির্দিষ্ট বা মাত্রা (quantity) ও গুণ (quality) সমন্বিত জিনিসের অপর কোন পরিমাণ বা গুণ সমন্বিত না হওয়া একান্তই অনিবার্য। তাই আল্লাহ্ এ পরিমাণ বা গুণ (quality) মুক্ত। তাঁকে না কোন পরিমাণ দ্বারা পরিমাপ করা যায়, না কোন অবস্থার গুণে গুণান্বিত মনে করা যায়। তিনি এ পরিমাণ ও অবস্থা থেকে মুক্ত বলেই তিনি অনিবার্যরূপ 'অসীম' 'অনন্ত'। তিনি এ সবের অনেক উর্ধ্বে।

অনুরূপভাবে যা অসীম ও অনন্ত তা কখনই 'বহু' হতে পারে না। কেননা তা 'বহু' হতে পারে মনে করলে এক-এর পর 'দুই' হওয়া সম্ভব মনে করতে হবে। আর তা সম্ভব হবে, যখন মেনে নেয়া হবে যে, 'এক' শেষ হওয়ার পর-ই 'দুই' শুরু। তখন একটিকে অপরটি থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন মেনে নিতে হবে। কেননা 'এক' যদি সর্বদিক দিয়েই 'দুই'র মত হয়, তাহলে এ 'এক' ও 'দুই' দুই হতে পারে না। আমরা যখন বলি এটি ওটি থেকে ভিন্ন, তখন তার অর্থ হয় এ যে,

দুটির প্রত্যেকটিই অপরটি থেকে—একটির অস্তিত্ব অপরটির অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং দ্বিতীয়টি তখনও সেখানে পাওয়া যাবে, যেখানে বা যখন প্রথমটি পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে প্রথমটি তখনও সেখানে পাওয়া যাবে যখন ও যেখানে দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। এটাই হচ্ছে 'সসীমতা' বা সীমাবদ্ধতার তাৎপর্য। অথচ আমরা আল্লাহ্‌কে পূর্বেই অসীম ও অনন্ত মেনে নিয়েছি।

একটি অবয়বকে যখন বড়ত্ব বিরাট ও বিশালতায় অসীম মনে করা হবে তার সমস্ত দিকে, তখন অনুরূপ অপর একটি অবয়বকে তার চতুর্দিক দিয়ে বড়ত্ব-বিশালতায় অসীম মনে করা যেতে পারে না। কেননা প্রথমটি তো বড়ত্ব বিশালতায় অসীম হওয়ার কারণে গোটা পরিবেষ্টনীই (كل الفضا) অধিকার করে বসে আছে। সেখানে অন্য কোন অবয়বের জন্য একবিন্দু পরিমাণ স্থান খালি নেই। মহান আল্লাহ্‌র ব্যাপারে এ তত্ত্ব দিনের আলোর মত ভাস্বর। এ বিশ্লেষণে উপরিউক্ত 'তাঁর মত কিছু নেই, কেউ নেই' এবং 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, হতে পারে না' আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যেসব আয়াতে আল্লাহ্‌র গুণ-পরিচিতি হিসেবে وَاحِدٌ এবং قَهَّارٌ এ দুটি শব্দ একসাথে এসেছে, তা একই সঙ্গে আল্লাহ্‌র এককত্ব ও মহা পরাক্রমশালী সর্বজয়ী হওয়ারই ঘোষণা দিয়েছে। যেমনঃ

مَامِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (ص: ٦٥)

আল্লাহ্ এক-মহাপরাক্রমশালী সর্বজয়ী—ব্যতীত আর কেউ-ই ইলাহ্ নয়।

سُبْحَانَهٗ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الزمر : ٤)

মহান পবিত্র তিনি, তিনিই সেই এক মহাপরাক্রমশালী-সর্বজয়ী আল্লাহ্।

وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الرعد: ١٦)

তিনিই এক মহাপরাক্রমশালী সর্বজয়ী।

এসব আয়াতে আল্লাহ্‌র قَهَّارِيَة 'মহাপরাক্রমশালী-সর্বজয়ী হওয়াটাই তাঁর এককত্বের প্রমাণ। কেননা সীমিত-সীমাবদ্ধ জিনিস সীমার বন্ধন দ্বারা নিষ্পেষিত। সে জিনিস সম্পর্কেই বলা চলে, এটি ওখানে আছে, এখানে নেই, কিংবা তা তখন ছিল, এখন নেই। এ এখানে বা এখন না থাকা সেই জিনিসের সসীমতার প্রমাণ। কিন্তু যা নিজে قَاهِرٌ 'মহাপরাক্রমশালী সর্ব জয়ী'—সর্বদিক দিয়ে, সেখানে বা তাতে 'সীমা'র কোন স্থান বা কর্তৃত্ব নেই।

পক্ষান্তরে যা সীমাহীন, তা অনিবার্যভাবে একক ও অনন্য। এ কারণেই উপরোদ্ধৃত আয়াতত্রয়ে وَحدانية (এককত্ব)-এর সাথে قَاهِرية মহাপরাক্রমশালী সর্বজয়ী হওয়ার গুণদ্বয় একসাথে পাশপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুটি গুণের মধ্যে গভীর সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াতে আল্লাহ্‌র পরিচিতি স্বরূপ واحد (এক) উল্লেখ করা হয়েছে।[১] অথচ এ 'এক' তো তা, যার পর 'দুই' রয়েছে অনিবার্যভাবে। পূর্বোদ্ধৃত বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে এ এক এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে?

আসলে এসব আয়াত মুশরিকদের বহুত্ববাদী আকীদার প্রতিবাদস্বরূপ নাযিল হয়েছিল। ওদের ধারণা ছিল, প্রত্যেক গোত্রের এক একটি বিশেষ ইলাহ থাকবে, সেই গোত্রের লোকেরা সেই বিশেষ 'ইলাহ্‌র' পূজা-উপাসনা করবে। অপর গোত্রের ইলাহকে বিশ্বাস করবে না। ওদের দাবিকৃত এসব 'ইলাহ' ও মূর্তিসমূহের 'ইলাহ' হওয়াকেই এসব আয়াতে অস্বীকার করা হয়েছে এবং সকলের দৃষ্টি এক অভিন্ন 'ইলাহ'রূপে আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট করা ও তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণের আহ্বান জানানোই এর লক্ষ্য। কিন্তু সে এক আল্লাহ্ কিরূপের ও কিভাবের একত্বের কোন্ প্রকারের সে আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। সেজন্য অপর বহু আয়াত-ই তো রয়েছে কুরআন মজীদে।

খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদী আকীদা

খৃস্টানদের আকীদা এমন অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম রহস্যময় যে, আকীদা-বিশ্বাসের জগতে তার দৃষ্টান্ত বিরল। সে আকীদার অযৌক্তিকতা, ভিত্তিহীনতা ও অবৈজ্ঞানিকতাও কম প্রকট নয়। এক কথায় তা হচ্ছে 'ত্রিত্ববাদ'। খৃস্টান সমাজের কেউ কেউ তাদের আকীদার একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা পেয়েছেন বটে; কিন্তু সে ব্যাখ্যার পরও তা একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কোন অভিধা পাওয়ার অধিকারী হতে পারেনি। আবার অনেকে সে ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে কিংবা তেমন যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত এ দাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন যে, ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান এক ও অভিন্ন নয়। অথবা বলেছেন, ধর্ম এক জিনিস, আর জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এ দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য হওয়া জরুরী নয়। সত্যি কথা এ যে, কুসংস্কার কখনই যুক্তি ও বিজ্ঞানের ধোপে টিকে না। খৃস্টানদের আকীদা এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ

---

১. যেমনঃ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ* (البقرة: ١٦٣)
وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ* (العنكبوت: ٤٦)

—খোদা তিন জন, আল্লাহ্ সে তিন জনের তৃতীয়।

—আল্লাহ্ মহান সন্তান গ্রহণ করেছেন।

বলা বাহুল্য, ত্রিত্ববাদী আকীদা হযরত ঈসা (আ) প্রচার করেন নি। তাঁর অন্তর্ধানের বহু দিন পর 'পুলসা' বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে, ঈসা সাধারণ মানুষের অনেক উর্ধ্বের এক বিশেষ সত্তা এবং তিনি নতুন 'মানুষে'র নমুনা বিশেষ। অর্থাৎ সাম-এর বুদ্ধি, যা খোদার থেকে প্রসূত। তবে কুরআনের বিশ্লেষণে জানা যায়, 'ত্রিত্ববাদ' খৃস্টধর্মেরও পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেখান থেকেই খৃস্টধর্মে এ জিনিস আমদানী করা হয়েছে। কুরআন জানাচ্ছেঃ

وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ* (التوبة: ٣٠)

খৃস্টানরা বলেছে, ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র। আসলে এটা তাদের মুখের কথা। তারা সাদৃশ্য রচনা করছে তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের কথার সাথে। আল্লাহ্ ওদের ধ্বংস করুন! ... ওরা কোন্ দিক দিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে?

উত্তরকালের গবেষকদের গবেষণায় উক্ত কুরআনী ঘোষণার যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। তা থেকে জানা গেছে যে, আল্লাহ্ সম্পর্কিত আকীদায় খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এ ত্রিত্ববাদ শামিল করা হয়েছিল এবং তা ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংস্কারের ফসল। আর তারই ফলে হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি। হিন্দু ধর্মের মৌল বিশ্বাস হলোঃ শাশ্বত-চিরন্তন ভগবান উদ্ভাসিত হলেন, শরীরী হয়ে উঠলেন তিনটি রূপেঃ

১. ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা)
২. বিষ্ণু (রক্ষাকর্তা)
৩. শিব (ধ্বংসকারী)

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, ব্রহ্মা হচ্ছে সৃষ্টিকর্মের প্রথম উদগাতা। চিরন্তন স্রষ্টা। তিনিই পিতা। বিষ্ণু তাঁরই পুত্র, তিনি রক্ষাকর্তা। আর শিব এ বিশ্বলোকের ধ্বংস করে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

العقائد الوثنية في الديانة النصرانية গ্রন্থে লিখিত হয়েছে, এ পবিত্র ত্রিত্ববাদ ব্রাহ্মণ্য ও অন্যান্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মসমূহে স্বীকৃত ছিল এবং তা হযরত ঈসা (আ)-এরও অনেক পূর্বে। গস্তাফ লোবন লিখেছেনঃ

খৃস্ট ধর্ম তার জীবনের প্রথম পাঁচটি শতাব্দীতে গ্রীক ও প্রাচ্য ধর্মীয় দার্শনিক চিন্তাধারা গ্রহণ করে অনেকখানি সমৃদ্ধ ও বিবর্তিত হয়েছে। ফলে তাতে প্রথম খৃস্টীয় শতকে ইউরোপে প্রচারিত মিসরীয় ও ইরানীয় আকীদাসমূহ মিশ্রিত হয়েছে। আর খৃস্টানরা প্রাচীন ত্রিত্ববাদের পরিবর্তে পিতা, পুত্র ও রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) এ তিনজন সমন্বিত নতুন ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে।

কুরআন মজীদ এ ত্রিত্ববাদী আকীদার যৌক্তিকতা খণ্ডন করেছেন অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও দলীলের ভিত্তিতে। বলেছেঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا* (المائدة: ١٧)

সেসব লোক কাফির হয়ে গেছে যারা বলেছে যে, মরিয়ম পুত্র ঈসা-ই আল্লাহ্। হে নবী! বলে দাও, আল্লাহ্-ই যদি মরিয়ম পুত্র ঈসা, তার মা এবং দুনিয়ার সকল অধিবাসীকে ধ্বংস করে দেন, তাহলে আল্লাহ্ থেকে এদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতাবান কে হবে?

এ আয়াতে যদিও স্পষ্টভাবে ত্রিত্ববাদকে নস্যাৎ করা হয়নি; বরং মরিয়ম পুত্র ঈসার আল্লাহ্ হওয়ার কথার প্রতিবাদের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর ঈসাকে খৃস্টানরা 'তিন খোদার একজন' বলে বিশ্বাস করে। ফলে তার খোদা হওয়া মিথ্যা হয়ে গেলে ত্রিত্ববাদী-আকীদার মিথ্যা প্রাসাদ নিমেষে ধুলিসাৎ হয়ে যায়, গিয়েছে-ও। নিম্নোক্ত আয়াতটিতে সে ত্রিত্ববাদকে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করা হয়েছেঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (المائدة: ٧٣)

সেসব লোক কাফির হয়ে গেছে যারা বলেছে যে, আল্লাহ্ তিনজনের তৃতীয়। প্রকৃতপক্ষে সেই একজন ছাড়া আর কোন ইলাহ-ই নেই।

বস্তুত এ বিষয়ে কুরআন দু'পর্যায়ের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেঃ

১. ঈসা-মসীহ্‌কে ধ্বংস করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কুদরত।

২. ঈসা-মসীহ দুনিয়ার অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত একজন মানুষ, মা'র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন ও পানাহার করেন।

প্রথম কথাটির প্রমাণ স্বরূপ কুরআন বলেছেঃ

فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ* (مائدة: ١٧)

আল্লাহ্-ই যদি মরিয়ম পুত্র মসীহকে, তার মাকে এবং পৃথিবীতে যা আছে তার সব কিছুকে ধ্বংস করারই ইচ্ছা করেন, তাহলে আল্লাহ্র এ ইচ্ছার মুকাবিলা করার একবিন্দু ক্ষমতার মালিক কে হবে? আসমান যমীনের মালিকত্ব নিরংকুশভাবে আল্লাহ্র, তিনি যা-ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি তো সব কিছুর উপরই শক্তিমান।

সব খৃস্টানই ঈসাকে 'মরিয়ম পুত্র' নামে প্রচার করে। তাহলে তিনি মা'র গর্ভে জন্মগ্রহণকারী অন্যান্য লক্ষ্য-কোটি মানুষের মত একজন মানুষ। তাঁর জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে তাঁর পানাহার গ্রহণ করে বেঁচে থাকা পর্যন্ত সব কাজই সাধারণ মানুষের মত। অতএব এঁকে সেই সাধারণ মানুষের মত একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। আবার তিনিই যখন ইচ্ছা করবেন, তাকে জীবন দিবেন— তাহলে খৃস্টানরা এঁকে 'ইলাহ' মানছে কি করে, কোন্ যুক্তিতে? যিনি 'ইলাহ' এর তো মৃত্যু বা ধ্বংস হতে পারে না?

এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত আয়াতে ঈসা-মসীহ্র মানুষ হওয়ার উপর যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেননা উপরিউক্ত দুটি বিষয়ের প্রথম বিষয়ের ভিত্তি তারই উপর স্থাপিত। আর এ কারণেই কুরআন তাঁকে ইবনে মরিয়ম— 'মরিয়ম-পুত্র' বলে প্রায় সর্বত্রই অভিহিত করেছেন। তাঁর মা সম্পর্কে জরুরী বর্ণনা দিয়েছে। তাঁকে, তাঁর মাকে এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে এক ও অভিন্ন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর ফলে ঈসা (আ)-এর মানুষ হওয়াটা অকাট্য ও নিঃসন্দেহে হয়ে উঠেছে। তার অর্থ হচ্ছে ঈসা-মসীহ্ দুনিয়ার সংখ্যাতীত মানব প্রজাতিরই একটি ব্যক্তি মাত্র, তার অধিক কিছু নন। ফলে মানবোচিত সকল গুণের ও নিয়মে তিনি সকল মানুষেরই সম পর্যায়ভুক্ত, ভিন্ন কিছু নন।

আরও স্পষ্ট করে বললে ইসলামী দর্শনের একটি মৌলনীতির উল্লেখ করতে হয়। তা হচ্ছেঃ

حكم الامثال فيما يجوز (عليها) وما لا يجوز واحد

সদৃশ জিনিসসমূহ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যার উপর তা বর্তায় ও যার উপর তা বর্তায় না তা সবই অভিন্ন।

অতএব মসীহ্ বাদে অন্যান্য প্রত্যেকটি মানব সত্তার ধ্বংস যখন সম্ভব, তখন মসীহ্‌র ধ্বংসও অনিবার্যভাবে সম্ভব। কেননা মসীহ্ অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষই। এরূপ অবস্থায় খৃস্টানরা তাঁকে 'ইলাহ্' বলছে কোন যুক্তিতে? 'ইলাহ' তো কখনই মরণশীল নয়—হতে পারে না। এ প্রসঙ্গের পূর্ণাঙ্গ সমাপ্তির জন্যই আয়াতটির শেষাংশে বলা হয়েছেঃ 'আসমান যমীনের নিরংকুশ মালিকত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র'। এ কথাটি আয়াতের শুরু অংশে বলা কথার যুক্তি বা প্রমাণ। অর্থাৎ আল্লাহ্ মসীহ্‌কে ধ্বংস করতে সক্ষম, তাঁর মা'কে-ও—সকল মানুষকেই। কেননা এরা সকলেই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন, তাঁর মুঠোর মধ্যে, তাঁর ক্ষমতার আওতাভুক্ত। তাহলে গোটা আয়াতে অর্থ হলঃ

আল্লাহ্ ঈসাকে ও তাঁর মাকে ধ্বংস করতে সক্ষম। কেননা তিনি এ সবের একচ্ছত্র মালিক। এ সবের কপোল তাঁরই মুষ্ঠিবদ্ধ, কেউ-ই তার বাইরে নয়। আর তাঁকে ও তাঁর মাকে ধ্বংস করতে আল্লাহ্‌র এ সক্ষমতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি আল্লাহ্‌র-ই সৃষ্ট, অন্য কিছু নয়।

দ্বিতীয় কথাটির দলীলঃ

কুরআন বলেছে, ঈসা-মসীহ্ (আ) ইলাহ্ নন, তিনি একজন মানুষ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল। মানুষের মত তিনি পানাহার করেনঃ

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ (المائدة: ٧٥)

মরিয়ম পুত্র রাসূল ছাড়া কিছু নয়। তার পূর্বে বহুসংখ্যক রাসূল অতীত হয়ে গেছে। আর তার মা সত্যবাদিনী। এরা দুজন-ই খাদ্য গ্রহণ করত।

খাদ্য গ্রহণ করতেন এ জন্য যে, মা ও পুত্র উভয়ই মানুষ ছিলেন। মানুষ মাত্রেরই ক্ষুধা লাগে এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। আর মানুষ কখনই 'ইলাহ' হতে পারে না। ঈসা-মসীহ (আ) 'ইলাহ' ছিলেন না, ছিলেন

আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। ইলাহ্‌ হলে নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষুধা লাগতো না, খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনও দেখা দিত না। আর যে কোন না কোন প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী, সে কখনই 'ইলাহ' হতে পারে না। বস্তুত ঈসা (আ) কখনই নিজেকে ও নিজের জননীকে 'ইলাহ্‌' রূপে পেশ-ই করেন নি, তার দাবিও করেন নি, বলেনও নি যে, আমাকে ও আমার মাকে তোমরা 'ইলাহ্‌' মেনে নাও।

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ (المائدة: ١١٦)

যখন আল্লাহ্‌ বললেন, হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা, তুমি লোকদিগকে বলেছ নাকি যে, তোমরা আমাকে ও আমার মা'কে 'ইলাহ্‌'রূপে মেনে নাও আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে? বললে, হে আল্লাহ্‌, তুমি পবিত্র, আমার কোন অধিকার নেই—এমন বিষয়ে কোন কথা বলা আমার জন্য কখনই শোভন হতে পারে না।

খৃস্টানরা ঈসা (আ)-কে খোদার পুত্র বলে তিন খোদার একজন রূপে বিশ্বাস করে। কুরআন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্‌র কোন 'পুত্র' নেই, তিনি কাউকেই পুত্র বা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না। যদিও ইয়াহুদীরা বলেছেঃ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ 'উজাইর আল্লাহ্‌র পুত্র' এবং আরবের মুশরিকরা يَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهُ 'আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে, অথচ তিনি তা থেকে পবিত্র, মহান। কুরআন এ সব কিছুর প্রতিবাদ করেছে ও তার ভিত্তিহীনতা তুলে ধরেছে।

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا.(الفرقان: ٢)

তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সর্বাধিনায়ক, তিনি সন্তান গ্রহণ করেন নি, মালিকত্বে তাঁর শরীক-ও কেউ নয়। তিনি সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং তার পরিমিতি ঠিক করে দিয়েছেন।

সমগ্র বিশ্বলোক মহান আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। অতএব এ বিশ্বলোকের মালিকানায় তাঁর শরীক কেউ নেই। তিনি

তো সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা, জন্মদাতা কারোরই নন, যে জন্মদাতা, সে কখনই সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না।

খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদী আকীদা আল্লাহ্-ঈসা-রুহুল কুদুস—এই তিন জনের সমন্বয়ে গঠিত। তাদের মতে এটা ধর্মীয় বিশ্বাস; এর চুলচেরা বিশ্লেষণ, অনুধাবন বা এর স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের কোন অবকাশ নেই, বুদ্ধি-বিবেকের মানদণ্ডে তার উত্তীর্ণ হওয়া-ও জরুরী নয়। বর্তমান যুক্তির দুনিয়ায় এ অযৌক্তিক কথা বলছে তারা, যারা দুনিয়ায় বড় যুক্তিবাদীরূপে নিজেদের পেশ করেছে এবং অকাট্য যুক্তি ছাড়া তারা কিছুই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় বলে বড় গলায় দাবি করছে।

এ পর্যায়ে তাদের একটা বিশ্লেষণ হচ্ছে, এই তিনজনে মিলিত হয়ে একটি সমষ্টিগত রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর তা-ই হচ্ছে 'অসীম খোদায়ী প্রকৃতি।' এর প্রত্যেকজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার অধিকারী, অপর দুজন থেকে স্বতন্ত্র। তবুও বিচ্ছিন্ন নয়, সম্পর্কহীন নয়। যদিও খোদায়ীর ব্যাপারে তাদের মধ্যে শরীকদারীও নেই বরং প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পূর্ণমাত্রার খোদায়ীর অধিকারী।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, 'একই সময় এক ও তিন' কি করে সম্ভব হতে পারে? এতো সেই শির্কী আকীদা, যা তদানীন্তন জাহিলিয়তে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল আরবের অজ্ঞ-মূর্খ জনগণের মধ্যে, যদিও তা নির্দিষ্ট ভাবে 'তিন ইলাহর মধ্যে সীমিত ছিল না, ছিল বহু সংখ্যক খোদার প্রতি বিশ্বাস। কিন্তু তওহীদী আকীদার অকাট্য দলীল-প্রমাণ সকল প্রকারের শির্ককে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়েছে।

ত্রিত্ববাদের আর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, তিন খোদা ভিন্নভিন্ন ও স্বতন্ত্র শক্তি মর্যাদা সম্পন্ন খোদা নয়; বরং তিন খোদা মিলে এক খোদা। তিন জনের কেউ-ই স্বতন্ত্রভাবে খোদা নয়। তিনটি অংশের সংমিশ্রণে গড়ে উঠা এক খোদা।

তার অর্থ এক খোদা তার অস্তিত্বের জন্য অপর খোদার প্রতি মুখাপেক্ষী। তিন জনের ঐক্য না হলে খোদার অস্তিত্ব হওয়াই অসম্ভব। কিন্তু যা খোদা হওয়ার জন্য অপরের মুখাপেক্ষী, তা কোনক্রমেই খোদা হতে পারে না। তার অর্থ, খোদা খোদার স্রষ্টা এবং খোদা খোদারই সৃষ্টি। এ যেমন পরস্পর বিপরীত কথা, তেমনি আল্লাহ্ সম্পর্কে এ এক অপমানকর ধারণা

অথচ আল্লাহ্‌র সত্তা অখণ্ড অবিভাজ্য। বাহ্যিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক অংশ সংযোজনের পরিণতি নয় এর সত্তা। এর দুটি অর্থ। একটিঃ আল্লাহ্ এক, একক। এর কোন দৃষ্টান্ত, কোন প্রতিকৃতি প্রতিমূর্তি কল্পনাই করা যায় না।

দুই, আল্লাহ্‌র সত্তা অখণ্ড, অবিভাজ্য। অখণ্ড ও অবিভাজ্য হওয়ার অর্থ, তা বিভিন্ন বাহ্যিক খণ্ডের সমন্বিত নয়, যেমন খনিজ দ্রব্য বা রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংমিশ্রণে তৈরী কোন জিনিস। আল্লাহ্‌র গুণাবলী তাঁর সত্তার স্বতন্ত্র গুণ নয়, তা মূল সত্তারই শামিল। যেমন ইল্‌ম, কুদরত, জীবন, এই গুণাবলী যেমন আল্লাহ্‌র সত্তায় শামিল, তেমনি তাঁর সত্তার মতই চিরন্তন, শাশ্বত ও অনাদি। অতএব আল্লাহ্‌র মহান অনিবার্য সত্তা "অপর'-এর প্রতি কোন দিক দিয়েই মুখাপেক্ষী নন। তিনি কোন দিক দিয়েই কারোরই মুখাপেক্ষী নন। এ কথাটি স্পষ্ট শব্দে বলা হয়েছে কুরআন মজীদের অন্তত ৬টি আয়াতে।[১]

১. আল-বাকারা-২৬৩ ও ২৬৭, আল-ইমরান-৯৭, আল-ফাতির-১৫, ইউনুস-৬৮, আন-নমল-৪০।

কার্যাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র এককত্ব বা তওহীদ

সৃষ্টিকর্মে আল্লাহ্‌র এককত্বঃ কুরআন মজীদ অত্যন্ত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র এক আল্লাহ্। আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ সৃষ্টিকর্তা নয়. হতে পারে না। আর সৃষ্টিকর্মে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কেউ একবিন্দু শরীক নয়।

সৃষ্টিকার্য এককভাবে আল্লাহ্ তা'আলাই করেন। এই মূল কাজে কারোরই একবিন্দু অংশীদারিত্ব নেই। তবে এ কার্য সম্পাদনে আল্লাহ্‌রই সৃষ্ট কোন কিছু মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা স্বতন্ত্র কথা। এই ঘোষণা যেসব আয়াতে উচ্চারিত হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত করা গেলঃ

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - (الرعد: ١٦)

বল, আল্লাহ্ই সব জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা। তিনি একাই মহা পরাক্রমশালী।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ (الزمر: ٦٣)

আল্লাহ্ই সব জিনিসের স্রষ্টা। তিনিই সব জিনিসের ভারপ্রাপ্ত—দায়িত্বশীল।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (المؤمن: ٦٢)

তোমাদের এই আল্লাহ্ই তোমাদের রব্ব, সব জিনিসেরই স্রষ্টা, মাবুদ তিনি ছাড়া কেউ-ই নেই।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ (الانعام: ١٠٢)

তোমাদের এই আল্লাহ্ই তোমাদের রব্ব, মা'বুদ তিনি ছাড়া কেউ-ই নেই। তিনিই সব জিনিসের স্রষ্টা। অতএব দাসত্ব করবে তোমরা তাঁরই।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (الحشر: ٢٤)

সেই আল্লাহ্ই সৃষ্টিকর্তা, নির্মাতা, অস্তিত্বদানকারী, প্রতিকৃতি রচয়িতা, তাঁরই জন্য রয়েছে অতীব উত্তম-সুন্দর নামসমূহ।

اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ (الانعام:١٠١)

কেমন করে কোত্থেকে তাঁর সন্তান হবে, তার তো সঙ্গিণী কেউ ছিল না? তিনি বরং প্রত্যেকটি জিনিসই সৃষ্টি করেছেন।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ

(فاطر:٣)

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্র নিয়ামতকে স্মরণ কর। চিন্তা কর, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই কি সৃষ্টিকর্তা আছে, হতে পারে?

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ* (الاعراف: ٥٤)

জেনে রাখো। তাঁরই জন্য সৃষ্টিকর্ম ও যাবতীয় কর্তৃত্ব। মহান বরকতওয়ালা আল্লাহ্ সারেজাহানের রব্ব।

এসব আয়াতে অতীব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জিনিস সৃষ্টি ও সবকিছুর উপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্রই মুঠির মধ্যে নিবদ্ধ। তিনিই আসমান-যমীন, চাঁদ-সূর্য-গ্রহ-তারা সব কিছুর স্রষ্টা যেমন, তেমনি সবকিছুরই নিয়ন্ত্রক। আলো, তাপ তাঁরই অবদান। এসব জিনিসের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র তিনিই স্থাপন করেছেন। তার অর্থ, তিনিই সব কার্যের কারণ সৃষ্টি করেছেন।

সেই সাথে একথাও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র, পাহাড়-মরু, নদী-সমুদ্র, মৌল উপাদান, খনিজদ্রব্য, মেঘ, বিদ্যুৎ গর্জন, বজ্র, বৃষ্টি বাদল ঝড়, গাছ-পালা লতা-গুল্ম, প্রস্তর ও জীব-জন্তু-প্রাণী-মানুষ—যা কিছুই রয়েছে, এসব নিজস্বভাবে প্রকৃত কোন শক্তি বা ক্ষমতার অধিকারী নয়। এ সবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যা-ই আছে, তা এর কোনটিরই নিজস্ব নয়। এ সব কিছুই মহান আল্লাহ্র কুদরাতের ফসল। সব কিছু তাঁরই প্রদত্ত, তাঁর নিকট থেকেই প্রাপ্ত। এ সবের মধ্যে যে কার্যকারণ সংযোগ রয়েছে তাও আল্লাহ্রই অবদান। সন্দেহ নেই, মানুষেরও রয়েছে অনেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। মানুষের পানাহার, উঠা-বসা, চলা-ফেরা—এ সব কাজ মানুষেরই ইখতিয়ারভুক্ত বটে। তবে এর সাথে জড়িত রয়েছে আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ। ওগুলি মানুষের একান্ত নিজস্ব কিছু নয়। তার কাজ-কর্ম যেমন তার বলে পরিচিত, তেমনি সাথে সাথেই তা আল্লাহ্র-ও বলে চিহ্নিত। সে সব কাজ মানুষের দ্বারা সম্পাদিত হয় বলে তা মানুষের কাজ; কিন্তু তা করার শক্তি ও ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত বলে তা একান্তভাবে ও সর্বদিক দিয়ে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত। অন্য কথায় বান্দার কাজ একান্তভাবে ও সর্ব দিক দিয়ে বান্দার নিজস্ব নয়, নয় আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, জায়দ উমরকে একটি তরবারী দিল একথা জানা সত্ত্বেও যে, সে তা দিয়ে

আত্মহত্যা করবে। অতঃপর তার দ্বারা এই আত্মহত্যা কার্য সম্পাদিত হলে সে কাজটি তরবারিদাতার কাজ বলা হবে না, হত্যাকাণ্ডের জন্য তাকে দায়ীও করা হবে না। কেননা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার মূহূর্তে তার সাথে তার কোন সম্পর্ক বা সংযোগ ছিল না। অথচ এই হত্যাকাণ্ড ঘটানোর অস্ত্র সে-ই দিয়েছিল। তার এই তরবারী দান ছিল হত্যাকাণ্ডের প্রাথমিক কাজ। কিন্তু মূল হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তার কোন দায়িত্ব নেই। আল্লাহ্‌র দেয়া শক্তি ও উপায়-উপকরণ দ্বারা বান্দার কাজ করাও ঠিক এইরূপ।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর শুধু স্রষ্টাই নন, তিনি সে সবের ক্রিয়াশীলতাও নির্ধারিত করেছেন। তার জন্য সীমাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ পর্যায়ের কয়েকটি আয়াতঃ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا* (الفرقان* ٢)

এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন সব জিনিসই। অতঃপর তার পরিমিতিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যথার্থভাবে।

رَبُّنَا الَّذِىٓ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى (طه: ٥٠)

আমার রব্ব তো তিনি যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে অস্তিত্ব দিয়েছেন সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে। অতঃপর তার চলার বিধানও দিয়েছেন।

এ সব কয়টি আয়াত আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ক্ষেত্রের একত্বের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলছে। মূলত স্বতন্ত্র ও নিজস্ব ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই। তেমনি প্রত্যেকটি সৃষ্টির কার্যপদ্ধতি এবং জীবনাচরণও কেবল তিনিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তার কোন অভাবই তিনি থাকতে দেননি। সৃষ্টিকুলের কোন কিছুকেই প্রয়োজনীয় জীবনাচরণের বিধান অন্য কোথাও থেকে নিতে হবে না, আল্লাহ্ নিজেই তা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী চালু করে দিয়েছেন।

'সৃষ্টিকর্তা' বলতে কি বোঝায়?

আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, মৌলিকভাবে সব কিছুরই সৃষ্টি কর্ম তিনিই সম্পন্ন করেছেন। উপরিউদ্ধৃত আয়াতসমূহ থেকে কুরআনের এই দাবির সমর্থন পাওয়া গেল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য কি? কুরআনের শব্দ خلق এর অর্থ কখনও হয় পরিমাণ নির্ধারণ— تقدير আবার কখনও হয় উদ্ভাবন, নব অস্তিত্ব দান। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মৌল উপাদান দ্বারা কোন অভিনব জিনিসের রূপদানকেও 'সৃষ্টি' বলা যায়।

যেমন হযরত ঈসা (আ)-এর জবানী নিম্নোক্ত কথাটি কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

إِنِّىٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِ اللَّهِ، (ال عمران: ٤٩)

আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির আকৃতির মত তৈরি করি। পরে তাতে ফুঁ দেই। তখন তা পাখি হয়ে যায় আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে।

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) মাটি দিয়ে যে পাখির আকৃতি বানাতেন, তাতে ফুঁ দিলেই তা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে পাখি হয়ে যেত। হযরত ঈসা (আ)-এর এই পাখি 'সৃষ্টি'র কাজটি সম্পন্ন হতো আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মাটি দিয়ে এবং তাতে ফুঁ দিলেই আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে একটা জীবন্ত পাখি হয়ে উঠে। কিন্তু এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্মের মত নয়। তিনি নিজের বানানো মৌল উপাদান দিয়েই জীব সৃষ্টি করেন। অতএব তাঁর সৃষ্টি কর্মের সাথে অপর কোন সৃষ্টিকর্মের একবিন্দু সামঞ্জস্য নেই। বলা হয়েছেঃ

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، (المؤمن: ٦٧)

সেই আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে শুক্র থেকে, পরে রক্তপিণ্ড থেকে এবং অতঃপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করে আনেন।

সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ্‌র এককত্ব ও অনন্যতা প্রমাণ করে যে, নবোদ্ভাবন ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র এককত্ব ও অনন্যতা অনস্বীকার্য। তার অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া আর যা কিছুই বর্তমান ও অস্তিত্বশীল, তা-ই তার মূল সত্ত্বার দিক দিয়ে অ-স্বয়ংসম্পূর্ণ, অ-স্বতন্ত্র। তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও তাই। তবে তা সেক্ষেত্রে একান্তভাবে বাধ্য নয়, ইখতিয়ার সম্পন্ন বটে। সব কিছুর প্রকৃত ধারক ও রক্ষক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ، (البقرة: ٢٥٥)

আল্লাহ্ (সর্বতোভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র স্বত্বাধিকারী), তিনি ছাড়া 'ইলাহ্' কেউ-ই নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক-সংরক্ষক।

এই ঘোষণার পর আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে জীবন্ত ও সবকিছুর ধারক রক্ষক মনে করা যায় না। আর কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কে সৃষ্টা

হিসেবে উপস্থাপন এবং অপরাপর শক্তির কোনটিরই স্রষ্টা না হওয়ার কথা বলিষ্ঠভাবে বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মুশরিকরা বুঝি তাদের দেব-দেবী ও স্বহস্ত নির্মিত মূর্তিগুলিকে 'স্রষ্টা' মনে করত, আর কুরআনে তারই প্রতিবাদ করা হয়েছে। বরং আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুশরিকদিগকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোই ইবাদত করা থেকে বিরত রাখা, বাধাগ্রস্থ করা (Restrain)। কেননা ইবাদত পাওয়ার অধিকারী হচ্ছে সেই সত্তা, যা পূর্ণত্ব গুণের অধিকারী ও সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। অন্য কথায় ইবাদত হচ্ছে স্রষ্টা ও মালিকের একান্ত অধিকার ও দাবির প্রাপ্য। সৃষ্টি ও মালিকানাভুক্ত প্রত্যেক জিনিস ও জীবেরই তা করণীয় কেবলমাত্র স্রষ্টা ও মালিকের জন্য। তাই মুশরিকরা যখন দাবি করছে যে, তাদের দেব-দেবী ও হাতে গড়া মূর্তিগুলো সৃষ্টিকর্তা নয় বরং তারা আল্লাহ্‌কেই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার ও ঘোষণা করেছে, তখন তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যদের ইবাদত পূজা-উপাসনা-আরাধনা করছে কেন? তা থেকে তারা বিরতই বা থাকছে না কেন? এটা তো চরম অযৌক্তিক কাজ।

কুরআন বারবার বলেছে যে, মুশরিকরা আল্লাহ্‌র স্রষ্টা হওয়ার তওহীদ বা এককত্বকে অস্বীকার করছে না, তাতে কোনরূপ সংশয়ও প্রকাশ করছে না। এই পরম ও মহান সত্য সম্পর্কে তারা কিছুমাত্র অসতর্কও নয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু তারা এই তওহীদের অনিবার্য দাবিকে গ্রাহ্য করে না বলেই তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যদের ইবাদত করছে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করছে না।

লালন-পালন (রবুবিয়ত) ও ব্যবস্থাপনায় তওহীদ

আল্লাহ্ তা'আলার একক সৃষ্টিকর্তা হওয়া একটা অনস্বীকার্য মহান সত্যরূপে চিরকালই প্রতিভাত ছিল। এমন কি কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা রূপে মক্কার কাফিরদেরও মেনে নেয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। এ পর্যায়ের কয়েকটি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ* (العنكبوت: ٦١)

তুমি যদি ওদের (মক্কার কাফিরদের) জিজ্ঞেস কর যে, আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করেছে? কে সূর্য ও চন্দ্রকে দৃঢ়ভাবে কর্মে নিরত করে রেখেছে? ... ওরা নিশ্চয়ই বলবে যে, আল্লাহ্। তাহলে ওরা কোন্ দিক থেকে বিভ্রান্ত হচ্ছে।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ (لقمان: ٢٥)

তুমি যদি ওদের জিজ্ঞেস কর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে ওরা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ্।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ (الزمر: ٣٨)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ- (الزخرف: ٩)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ- (الزخرف: ٨٧)

এ সবকয়টি আয়াতের বক্তব্য অভিন্ন। ভাষা ও ব্যবহৃত শব্দে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

দরদাশ্‌ত প্রচারিত ধর্মীয় আকীদায় এই বিশ্বলোকের স্রষ্টা ও সূচনাকারী হিসেবে দুই সত্তার প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করা হয়েছিল। তাদের একজন 'ইয়াজদান' আর অপরজন 'আহরিমন'। মূলত সে এক অস্পষ্ট ও রহস্যময় আকীদা। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের আকীদার মধ্য মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না।

তদানীন্তন আরব মুশরিকদের আকীদায় এক সৃষ্টিকর্তার স্বীকৃতি থাকলেও তা ছিল অস্পষ্ট ও মোটামুটি ধরনের। তাদের অনেকেরই বিশ্বাসে শির্ক ছিল এই দিক দিয়ে যে, তারা মনে করত, বিশ্বলোকের স্রষ্টা আল্লাহ্ এক হলেও তিনি একাই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন না, করা তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই কাজে তাঁর সাথে অন্যান্য শক্তিও শরীক রয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করত আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বলোককে সৃষ্টি করার পর এ থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হয়ে গেছেন, এখন তা স্বতঃই চলছে। অথবা তার পরিচালনার দায়িত্ব বিভিন্ন সত্তার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। এদের ধারণা ছিল ফেরেশতা, জ্বিন, নক্ষত্রসমূহ এবং পবিত্র আত্মাসমূহই হচ্ছে বিশ্ব পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন সত্তা। কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার সময় তদানীন্তন আরবে এই আকীদা ব্যাপকভাবে বর্তমান ছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়ে উক্তরূপ আকীদার ধারক কয়েকটি জনগোষ্ঠী বর্তমান ছিল। তারা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের পূজা করত একথা মনে করে নয় যে, এগুলি বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা। বরং তাদের বিশ্বাস ছিল, এই আসমানী অবয়বসমূহ বিশ্বলোকের নিম্নস্তরের (পৃথিবীর) ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম। আর এগুলির উপরই বিশ্ব পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত। তারাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এক-একটি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। তাদের বিশ্বাস মতে এইগুলিই এই বিশ্বলোকের রব্ব। আল্লাহ্ নন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াত

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর . افول Setting, Declination অস্তগমন বা অদৃশ্য হয়ে যাওয়াকে ভিত্তি করে উক্ত তিনটি জিনিসেরই প্রত্যেকটির রব্ব হওয়া সংক্রান্ত বিশ্বাসকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়ের লোকদের বিশ্বাস অনুযায়ী ও-গুলিই ছিল গোটা পৃথিবীর ব্যবস্থাপক, পরিচালক। মানুষও এই পৃথিবীতে বসবাসকারী। অতএব মানুষও এসবেরই ব্যবস্থাধীন। এগুলির অনুগ্রহেই মানুষ দুনিয়ায় বেঁচে আছে, ক্রম-বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। ফলে এগুলির সার্বক্ষণিকভাবে এই পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকা একান্ত আরশ্যক। অন্যথায় পৃথিবীর ও তার মধ্যে অবস্থিত সবকিছু অচল হয়ে যাবে। কিন্তু অদৃশ্য ও অস্তমিত হওয়া এই অব্যাহত ব্যবস্থাপনা পরিচালনার পরিপন্থী। তাই এগুলির এই অস্তগমন ও অদৃশ্য হওয়ার বাস্তব ব্যাপারটিকে এগুলির পৃথিবীর ব্যবস্থাপক-পরিচালক-নিয়ন্ত্রক না হওয়ার অকাট্য দলীলরূপে পেশ করেছেন। তিনি স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, এর কোনটিই রব্ব বা মা'বুদ হওয়ার

যোগ্য নয়। আর এইগুলি পবিত্র অবয়ব হিসেবে যদি ইবাদত পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতো তাহলে এগুলির অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। বরং সেগুলির সার্বক্ষণিকভাবে পূজারীদের সম্মুখে ভাসমান হয়ে থাকা একান্ত আবশ্যক। তবে বলা যায়, ইবাদতকারীদের সম্মুখে ইবাদতের সময় দৃশ্যমান থাকাই তো যথেষ্ট, যখন ইবাদতের সময় নয়, তখন অদৃশ্য হয়ে গেলে কোনই অসুবিধার কারণ হতে পারে না। এই কারণে হযরত ইবরাহীম খলীল (আ) প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই 'রব্ব' শব্দ বলে প্রশ্ন তুলেছেন, এই কি আমার 'রব্ব'?

তার কারণ হচ্ছে, অভিধানে রব্ব শব্দের অর্থ হচ্ছে المتصرف হস্তক্ষেপ-কারী, ব্যবহারকারী, কোন কাজে প্রয়োগকারী এবং المدبر ব্যবস্থাকারী, পরিচালক। সে কোন জিনিসের ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা করে ও এই ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা ব্যাপদেশে তাতে নিজ ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করে, সে-ই রব্ব। এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীমের সময় الشرك الربوبى রবুবিয়াত লালন-পালনে ক্রমবর্ধন ও সংরক্ষণ পর্যায়ে শির্‌কের আকীদা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ফেরেশতা, জ্বিন ও পবিত্র আত্মাসমূহকে যারা রব্ব মনে করত, তাদের বিশ্বাস ছিল, চন্দ্র, সূর্য থেকে শুরু করে জীব-জন্তু-মানুষ, বৃক্ষ ও প্রস্তর প্রভৃতি সবই এই বিশ্বলোকের নব সৃষ্ট উপকরণ। আল্লাহ্ তা'আলা এ উপাদানসমূহ সৃষ্টি করার পর এগুলিতে হস্তক্ষেপ করার কর্তৃত্ব ওসব রব্ব-এর উপর অর্পণ করেছেন। অতঃপর ওরা তাতে স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে এবং নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা-ক্ষমতাকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করছে।

স্পষ্ট বোঝা যায়, ওরা সৃষ্টিকর্ম ও ব্যবস্থাপনা দুই ভিন্ন ভিন্ন ও একটি থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন কাজ মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, সৃষ্টিকর্ম তো একান্তভাবে আল্লাহ্‌র; তিনিই এক একটি জিনিসকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে বের করে এনে অস্তিত্বের উন্মুক্ত আলোকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। কেননা সেই জিনিসটির ক্ষেত্রে অতঃপর কাজ হচ্ছে ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা ও সংরক্ষণ। এগুলি সৃষ্টি কর্ম থেকে ভিন্নতর কাজ। এ কারণে তা অন্যদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ওরাই হচ্ছে অতঃপর সমগ্র বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপক। এই ব্যবস্থাপনা কর্মে আল্লাহ্‌র কোন কর্তৃত্ব চালাবার বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। আর এটাই হচ্ছে রবুবিয়তের ক্ষেত্রে শির্‌ক।

মক্কায় মূর্তি পূজার প্রথম প্রচলন করে আমর ইবনে লুহাই। তা এই ব্যবস্থাপনা শির্‌ক-এর আকীদার ভিত্তিতেই। ইবনে লুহাই সিরিয়া থেকে এই

মূর্তিপূজার আমদানী করেছিল। সে তার সিরিয়া সফর ব্যাপদেশে একস্থানে কিছু লোককে মূর্তিপূজা করতে দেখতে পেল। সে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এই গুলোর পূজা করছ কেন? জবাবে তারা বলেছিল, এই মূর্তিগুলির আমরা পূজা করছি এজন্য যে, আমরা যখন ওদের নিকট বৃষ্টি চাই, তখন ওরা বৃষ্টি দেয়, বিপদে সাহায্য চাই, ওরা সাহায্য করে। তখন সে তাদের নিকট থেকে 'হুবল' (هبل) নামক এক বিরাট মূর্তি নিয়ে এস কাবার ছাদের উপর স্থাপন করে লোকদিগকে তার পূজা করার জন্য আহবান জানায়।[১] মূর্তি সম্পর্কে উদ্ধৃত সিরীয়দের ধারণা অনুযায়ী বৃষ্টি দান ও সাহায্য দান মূর্তির দ্বারা সম্ভব হত এইজন্য যে, বিশ্ব ব্যবস্থাপনায়ও ওদের কর্তৃত্ব চলে বলে ওরা বিশ্বাস করত।

এ বিশ্বাসেরও মূলে নিহিত কথা হচ্ছে, এই হস্তনির্মিত মূর্তিই যে এই শক্তির অধিকারী তা কিন্তু মনে করত না, বরং এই মূর্তির অন্তরালে যে আত্মিক সত্তাসমূহ রয়েছে, তাই হচ্ছে আসল ক্ষমতার ধারক। কিন্তু লোকেরা সেই সত্তাসমূহকে ধারণায় বা কল্পনায় আয়ত্ত করতে পারে না বলেই আয়ত্তযোগ্য একটি আকার দিয়ে সেগুলির পূজার অনুষ্ঠান করা হয়। আসল পূজ্য দেবতা তো সেই অশরীরী আত্মাগুলিই, মূর্তিটি নিশ্চয়ই নয়।

তাফসীর গ্রন্থাবলী থেকে জানা গেছে, উদ্দ, সূয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক ও নসর প্রভৃতি নামের মূর্তিগুলি মূলত আল্লাহ্‌র কয়েকজন নেক বান্দার প্রতিমূর্তি বিশেষ। এরা যখন মরে গেলেন, তখন কিছুলোক মনে করল, লোকেরা যদি এদের প্রতিমূর্তি দেখতে পায় তাহলে তারা এদের মতই উত্তম মানের ইবাদতে আকৃষ্ট হবে। কেননা এ মূর্তিগুলি তাদেরকে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়ে দেবে। কালের অগ্রগতির সাথে সাথে এ মূর্তিগুলিই স্বয়ং দেবতা ও পূজ্য হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। উত্তরকালে মূর্তি পূজারীদের মধ্য থেকে আলোকপ্রাপ্ত ও সংস্কৃতি ধন্য লোকেরা বলতে শুরু করেছেঃ

وَمَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللهِ زُلْفَى-(الزمر: ٣)

আমরা এ মূর্তিগুলির পূজা করি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, ওরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র অতীব নৈকট্যে পৌঁছিয়ে দেবে।

'রব্ব' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

আরবী ভাষায় প্রখ্যাত অভিধান গ্রন্থ রচয়িতা ইবনে ফারেস লিখেছেনঃ الرب. অর্থঃ মালিক, সৃষ্টিকর্তা, অধিকারী। কোন জিনিসের সংশোধনকারী, কল্যাণকারীকেও রব্ব বলা হয়।[২]

---

১. سيرة ابن حسام ج ص: ٧٩

২. مقاييس اللغة ج ٢ ص: ٣٨١

ফীরোজাবাদী লিখেছেনঃ

رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مَالِكُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ وَصَاحِبُهُ

প্রত্যেকটি জিনিসের রব্ব হচ্ছে সে, যে তার মালিক, প্রাপক ও অধিকারী।

বলা হয়ঃ رب الامر সে ব্যাপারটির সংশোধন করেছে।[১]

المنجد এ লিখিত হয়েছে . الرب المالك المصلح السيد 'রব্ব' অর্থ মালিক, সংস্কারক-ব্যবস্থাপক, প্রধান।

এ প্রেক্ষিতে আমরা দেখছি, কুরআন মজীদে 'রব্ব' শব্দটি নিম্নোক্ত পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ

১. التربية যেমন رَبَّ الْوَلَدَ সন্তান লালন-পালন করেছে।

২. الاصلاح والرعاية যেমন رَبَّ الضَّيْعَةَ ছোট্ট গ্রাম জনপদটি লালন ও সংরক্ষণ করেছে।

৩. শাসন ও প্রশাসন বা হুকুমত চালানো। বলা হয়ঃ অমুকে তার জনগণের রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। রাজনৈতিক শক্তিও বোঝায়। পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা বোঝায়।

৪. মালিকঃ যেমন رَبَّ غَنَمٍ اَمْ رَبَّ اِبِلٍ ছাগলের মালিক, না উটের মালিক? কথাটি নবী করীম (স)-এর।

৫. অধিকারীঃ যেমন رب الدار ঘরের অধিকারী, ঘরের উপর কর্তৃত্বকারী, তার নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধানকারী ও পরিচালনাকারী। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ 'এই ঘরের অধিকারী, তার উপর কর্তৃত্বকারী ও তার নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধানকারীর ইবাদত করা তাদের কর্তব্য।

উপরিউক্ত অর্থসমূহের মধ্যে শব্দটির আসল ও মূল অর্থ—মালিক, ব্যবস্থাপক, লালন-পালনকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, ব্যবস্থাপক ও পরিচালক-নিয়ন্ত্রক এবং প্রশসক।[২] এছাড়া অন্যান্য অর্থ এই মূল অর্থেরই শাখা-প্রশাখা বা আনুসঙ্গিক। হযরত ইউসুফ (আ) এই অর্থেই আজীজ মিসরকে বলেছিলেনঃ

اِنَّهٗ رَبِّىْ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ (يوسف: ٢٣)

---

১. قاموس اللغة مادة - الرب

২. اعنى التربية والاصلاح والحاكمية والمالكية والصاحبية

সে আমার লালন-পালনের ব্যবস্থাকারী। সে আমার অবস্থান উত্তম বানিয়ে দিয়েছে।

আর জনৈক কয়েদীর মনিব সম্পর্কেও বলেছনঃ

أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا۔(يوسف: ٤١)

তোমাদের দুইজনের একজন তার মুনিব-মালিককে মদ্য পান করাবে।

কেননা আজীজ মিসর ছিল তদানীন্তন মিসরের প্রধান, শাসক-পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী। তার ব্যাপারাদিতে স্বাধীন হস্তক্ষেপকারী এবং তার লাগামের মলিক, ধারক ও বাহক অর্থাৎ নীতি নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক। আর কুরআন মজীদে যে বলা হয়েছে যে, 'ইয়াহুদী খৃস্টানরা তাদের পণ্ডিত-বুদ্ধিমান ও পাদ্রী-পুরোহিতদের 'রব্ব' বানিয়েছে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়েঃ

اِتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ (التوبة: ٣١)

তা এজন্য বলা হয়েছে যে, তারা আইন প্রণয়নের নিরংকুশ কর্তৃত্ব তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ্‌ বিশেষ ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়াদিতে তাদের কর্তৃত্ব সম্পন্ন ও ক্ষমতাবান বানিয়ে নিয়েছিল। আল্লাহ্‌ নিজে নিজেকে কা'বা ঘরের রব্ব رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ বলেছেন এজন্য যে, এ ঘরের যাবতীয় বিষয় ও ব্যাপার তার পরিচালনা ও আন্তর্নিহিত ভাবধারা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ তার নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত ও নিবদ্ধ করে রেখেছেন, এ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার একবিন্দু অধিকার কারো নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ নিজেকে رب السموت والارض আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রব্ব বলে অভিহিত করেছেন এজন্য যে, তিনিই এর ব্যবস্থাপক-পরিচালক, তাতে সকল প্রকার হস্তক্ষেপকারী, তার অবস্থার উন্নয়ন-সংশোধনকারী। এ দুটির প্রতিষ্ঠাকারীও তিনি, তিনিই এ দুটির চালক ও রক্ষক।

এভাবে 'রব্ব' শব্দের প্রকৃত তত্ত্ব ও রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌-ই সমগ্র বিশ্বলোকের একমাত্র রব্ব, কেননা তিনিই সব কিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তাঃ

بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِىْ فَطَرَهُنَّ (انبياء: ٥٦)

বরঞ্চ তিনিই হচ্ছেন আসমান ও যমীনের রব্ব, যিনি এগুলোকে সৃষ্ট করেছেন।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ (البقرة: ٢١)

হে লোকেরা, তোমরা দাসত্ব কর তোমাদের রব্ব-এর, তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন।

মানুষের যিনি রব্ব তিনিই মানুষের ইবাদত পাওয়ার অধিকারী। কেননা তিনিই তো মানুষের সৃষ্টিকর্তা। অন্য কথায়, তিনি সৃষ্টিকর্তা বলেই তিনি রব্ব—ব্যবস্থাপক-পরিচালক। আর একই কারণে তিনি মানুষের একমাত্র মা'বুদ।

রাসূলের সময়ের মুশরিকরা আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তারূপে মেনে নিয়েও রব্ব রূপে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। আর রাসূলে করীম (স) প্রেরিত-ই হয়েছিলেন এই দায়িত্ব লয়ে যে, তিনি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র 'রবুবিয়ত' প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারা তাঁকেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সত্তাকে 'রব্ব' মেনে নিতে বলছিল। কুরআনের ভাষায় তিনি ওদের জবাবে বললেনঃ

اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِى رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ (الانعام: ١٦٤)

আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে রব্বরূপে মেনে নেব? অথচ তিনিই তো সব ও প্রত্যেক জিনিসেরই রব্ব।

ফিরাউন দাবি করে বলেছিলেনঃ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى 'আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব্ব।' এর অর্থ ছিল, সর্বোচ্চ প্রশাসক ও নিয়ন্ত্রক-পরিচালক হওয়ার দাবি। সে কখনই আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা হওয়ার দাবি করেনি।

সেকালের তাগুতী শাসকরা যে সমাজ গড়ে তুলেছিল, তাতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য শক্তিকে 'ইলাহ্'রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কখনই বহু সংখ্যক সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ছিল না। হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পর তাতে চিন্তার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়; কিন্তু তবু সেখানে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্তা হওয়ার বিশ্বাস অস্বীকৃত হয়নি। তাদের বিশ্বাস ছিল বহু সংখ্যক রব্ব—পরিচালক-নিয়ন্ত্রক-ব্যবস্থাপক হওয়ার প্রতি। কিছু সংখ্যক যুবক সেই বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছিল, তারা ঈমান এনেছিল হযরত ঈসা (আ)-এর তওহীদী দাওয়াতে—মহান আল্লাহ্‌র একমাত্র 'রব্ব' হওয়ার প্রতি তারা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলঃ

رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهًا (الكهف: ١٤)

আমাদের রব্ব তো তিনিই যিনি আসমান-যমীনের রব্ব। আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকেই 'ইলাহ্' রূপে কখনই মেনে নেব না।

এই ঘোষণার তাৎপর্য ছিল 'তওহীদে উলুহীয়ত' ও 'তওহীদে রবুবিয়তের' প্রতি ঈমান গ্রহণ। অর্থাৎ যিনি রব্ব, তিনিই ইলাহ্। যিনি ইলাহ্ তিনিই রব্ব। যে ইলাহ্ নয়, রব্ব হওয়ার বা রব্বরূপে স্বীকৃতি লাভের তার কোন অধিকারই নেই।

সূরা আর-রহমান-এ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 'তোমরা তোমাদের দুজনার—জ্বিন ও মানুষের—রব্ব প্রদত্ত কোন সব নিয়ামতকে অসত্য মনে করবে ও অস্বীকার করবে?' বলে যে বারবার প্রশ্ন তোলা হয়েছে তা এই মহাসত্য প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে, আল্লাহ্ই সারাজাহানের রব্ব—ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক এবং মানুষেরও রব্ব কেবলমাত্র তিনিই। কেননা মানব জীবনের লালল-পালন-সংরক্ষণ ইত্যাদি সমস্ত কাজ একমাত্র আল্লাহ্ই এককভাবে সম্পন্ন করে থাকেন। এই কারণে নিয়ামত দানের ব্যাপারটি আল্লাহ্র লালন-পালন-সংরক্ষণের এককত্বের অকাট্য প্রমাণ হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই রবুবিয়তের তওহীদের কারণেই আল্লাহ্রই শোকর আদায় করার কথা বলা হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত পাঁচটি আয়াতেঃ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ*

(ابراهيم: ٧)

এবং স্মরণ কর, তোমাদের রব্ব ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি শোকর কর, তাহলে আমি নিশ্চয়ই আরও বাড়িয়ে বৃদ্ধি করে দেব। আর যদি কুফরি কর, তাহলে জানবে আমার আযাব বড়ই কঠিন ও রূঢ়।

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ

(النمل: ١٩)

(সুলায়মান) বলল, হে আমার রব্ব, আমাকে তওফীক দাও যেন আমি তোমার সেই নিয়ামতের শোকর আদায় করি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ।

قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ

لِنَفْسِهٖ (النمل: ٤٠)

বলল, এটা আমার রব্ব-এর অনুগ্রহ, তা এই জন্য যে, তিনি আমাকে পরীক্ষা করবেন আমি শোকর করি; কিংবা কুফর করি। আর সত্যি কথা হচ্ছে, যে শোকর করে সে শোকর করে তার নিজের জন্যই।

قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ.

(احقاف: ١٥)

বলল হে আমার রব্ব্ আমাকে শক্তি দাও যেন আমি তোমার সেই নিয়ামতের শোকর করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছ।

كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ (سبا: ١٥)

তোমরা খাও তোমাদের রব্ব-এর দেয়া রিযিক থেকে এবং শোকর তাঁরই কর। দেহ পবিত্র এবং রব্ব তো ক্ষমাশীল।

এ সব আয়াতের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, বিশ্বলোক পরিচালনা ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব যার, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্। অতএব রব্ব কেবল তিনিই। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করান, তিনিই ধন-মাল ও জনশক্তি বৃদ্ধিদান করেন। এই পৃথিবীর বুকে খাল-বিল-নদী-সমুদ্র ও বাগ-বাগিচা তিনিই রচনা করেন। এই সমস্ত কাজের আঞ্জামদান একান্তভাবে আল্লাহ্র কর্তৃত্বাধীন। তা-ই কুরআন মজীদের বক্তব্যঃ

اَسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا* يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا*
وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا*

(نوح: ١٠-١٢)

তোমরা সকলে ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের রব্ব-এর নিকট। তিনিই তো হচ্ছেন অতি বড় ক্ষমাদানকারী। তিনিই তোমাদের উপর আকাশমণ্ডলকে প্রবল বৃষ্টিপাতকারী বানিয়ে দেন। এবং তোমাদের সাহায্য দেন ধন-মাল ও সন্তানাদি দিয়ে। আর তিনিই তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা ও খাল ঝর্ণা বানিয়ে দেন।

অর্থাৎ পৃথিবীর যমীনের উপর যাঁর কর্তৃত্ব চলে তাঁরই কর্তৃত্ব চলে মানুষের উপর। তাঁরই কর্তৃত্ব চলে আকাশমণ্ডলের উপর। অতএব মানব সমাজে নীতি-আদর্শ-আইনও কেবল তারই চলবে ও মানুষকে তা-ই পালন করে চলতে হবে। কাজেই এই আদেশ ও আদর্শ পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে সেজন্য ক্ষমা তাঁরই নিকট চাইতে হবে। কেননা তিনি যেমন মানুষের জন্য বৃষ্টি দানকারী, বাগিচা ও ঝর্ণা সৃষ্টিকারী, তেমনি তিনিই ক্ষমাদানকারীও। বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনাকারী যেহেতু আল্লাহ্ অতএব আল্লাহ্‌রই বিধান মেনে চলতে হবে মানুষকে, ইবাদতও কেবল তাঁরই করতে হবে। আইন-বিধান পালন ও পূজা-উপাসনা আরাধনা (ইবাদত) কার্যত একই পর্যায়ের কাজ। ইবাদত যেমন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোরই করা যায় না, তেমনি আইন-বিধান ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বও আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই মানা চলবে না। তা মানলেই শির্‌ক হবে। কিন্তু প্রকৃতিতে—আসমানে ও যমীনে—একাধিক সত্তার কর্তৃত্ব চললে বিপর্যয় অনিবার্য। তেমনি মানুষের উপর এক আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব চলতে থাকা অবস্থায় অপর কারোর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলেও বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে। কুরআন এ ঘোষণাই দিয়েছেঃ

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ* (الانبياء: ٢٢)

আসমান ও যমীনে বহু সংখ্যক ইলাহ্ হলে দু'টোই অবশ্যই বিপর্যস্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। অতএব ঘোষণা করছি, লোকেরা যা বলে (বহু কর্তৃত্ব মেনে নেয়া) তা থেকে আরশের রব্ব অতীব পবিত্র।

মৃত্যু তিনিই দান করেন, জান তিনিই কবজ করেন (আয-যুমার—৪২), যদিও তা কার্যত সংঘটিত হয় আল্লাহ্ প্রেরিত ফেরেশতাদের দ্বারা (আল-আন্‌আম—৬), শাফা'আত কেবল আল্লাহ্‌রই কাজ (আয-যুমার—৪৪), যদিও ফেরেশতা, নবী-রাসূল ও অন্যান্যের শাফা'আতও হবে—হবে কেবল আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে (আন্-নজম—২৬; আন-নাবা'—৩৮)। গায়েব কেবল আল্লাহ্ই জানেন, আল্লাহ্ ছাড়া গায়েব সম্পর্কে কেউই অবহিত নয়। (আন্-নমল—৬৫), যদিও তিনি তাঁর রাসূলগণের মধ্য থেকে বাছাই করা লোকদেরকে গায়েব জানিয়ে দেন যাকে তিনি চান (আল-ইমরান—১৭৯), হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভাষায় রোগ নিরাময় করেন আল্লাহ্ (আশ-শূয়ারা—৮০) যদিও রোগ নিরাময়তা মধু (আন্-নহল—৬৯) ও কুরআন

দ্বারাও (আল-ইসরা—৮২) সাধিত হয়। কুরআনের ঘোষণায় রিযিকদাতা একা আল্লাহ্ (আয্-যারিয়াত—৫৮); যদি কুরআন ধনী লোকদিগকে তাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণকারীদের রিযিক দিতে নির্দেশ দেয় (আন্-নিসা—৫)। প্রকৃত কৃষিকাজ আল্লাহ্ করেন বলে কুরআন দাবি করেছে (আল-ওয়াকিয়া—৬২-৬৪); কিন্তু সেই কুরআনের কথায় জানা যায় যে, কৃষিকাজ অন্যরাও করে (আল-ফাত্হ—৩৯) আল্লাহ্-ই বান্দাদের আমল লিখে রাখেন(আন-নিসা—৮); কিন্তু অপর একটি আয়াত মতে তা লেখার জন্য আল্লাহ্ ফেরেশতাদের নিযুক্ত করেন (আল-যুখরুফ—৮১)। কাফিরদের নিকট তাদের কুফরি আমলসমূহ চাকচিক্যময় করে তোলেন আল্লাহ্ নিজে (আন-নমল—৪); পরমুহূর্তে সে কাজ শয়তান করে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে (আন্-আনফাল—৪৮), অপর আয়াতে আবার সে কাজ অন্যরা করে বলে জানান হয়েছে (ফুস্সিলাত—২৫)।

বস্তুত কুরআনের বাচনভঙ্গী নিহিত তত্ত্ব যারা বুঝতে পারে না, তারা এই সব আয়াতের মধ্যে বিরাট বৈষম্য ও পরস্পর বিরোধীতা মনে করবে। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেই বুঝতে পারা যায়, এসব কাজের আসল স্বয়ংসম্পূর্ণ কারক বা কর্তা স্বয়ং আল্লাহ্, অন্যরা সবাই নিজেদের অস্তিত্বের জন্য-ও আল্লাহ্র প্রতিই মুখাপেক্ষী, তাঁরই উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এসব ক্ষেত্রে আমাদের কাজ আল্লাহ্র অধীনতা ও আদেশ পালন স্বরূপ মাত্র। তাদের কারোরই নিজস্ব কোন ইখতিয়ার নেই কিছু একটা করার। সব কিছুই আল্লাহ্র সীমাহীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন কুদরাতের অধীন।

কেননা এ জগতটা কার্যকারণের (cause and causes) জগত। তাই কুরআন এই জগতের কার্যাবলী সংঘটনকে বাহ্যিকভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন বানিয়ে পেশ করে। কিন্তু তাতে মৌলিক সৃষ্টি ক্ষমতা সে নিয়মের তা প্রমাণিত হয় না। ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের। আল্লাহ্ই সকল কাজের আসল কর্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা প্রত্যক্ষভাবে নিজে করেন না, অন্য কিছুর মাধ্যমে তা ঘটিয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ্ রাসূলে করীম (স)-কে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (الانفال: ١٧)

তুমি যখন তীর নিক্ষেপ করছিলে, তখন তা ঠিক তুমি নিক্ষেপ করছিলে না; বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করছিলেন।

যে মুহূর্তে রাসূল (স) নিজে তীর নিক্ষেপ করছিলেন, আল্লাহ্ বলেছেন যে, ঠিক সেই মুহূর্তে স্বয়ং আল্লাহ্ই তা নিক্ষেপ করছিলেন। প্রকৃত নিক্ষেপকারী আল্লাহ্, যদিও তা সম্পাদিত হচ্ছিল নবী করীম (স)-এর হস্তে। কেননা তিনি তাঁর নিক্ষেপার্থে যে শক্তির বলে দাঁড়িয়েছিলেন, সে শক্তি তো আল্লাহ্রই দেয়া। আর তীর নিক্ষেপও করছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্র হুকুমে। এই কারণে তার করা কাজটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র করা হয়ে গেল। বস্তুত আল্লাহ্র বান্দার কাজকে আল্লাহ্র কাজ বলা অধিকতর শক্তিশালী এই দৃষ্টিতে যে, বান্দর অস্তিত্ব, তার শক্তি-সামর্থ্য সব কিছুই তো আল্লাহ্রই দান। বান্দার নিজের তো কিছুই নেই। যদিও বান্দার কাজের পিছনে বান্দার নিজের ইচ্ছা, সংকল্প ও উদ্যোগ বলে দায়ী হয় সেই বান্দা-ই—আল্লাহ্ নন।

ইবাদতে তওহীদ ও শির্ক

ইবাদতে তওহীদ

নবী-রাসূলগণের দাওয়াত মৌলিকভাবেই আল্লাহ্র ইবাদতে তওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক ও মূর্তিপূজার সমস্ত শৃঙ্খল ছিন্ন-ভিন্ন করার উপরই নিবদ্ধ। আল্লাহ্র নাযিল করা কিতাবসমূহেরও এই রীতি পুরোপুরি রক্ষিত। সকল নবী ও রাসূলের জীবনের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। আর তা হচ্ছে তওহীদের বিশ্বাসকে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত করা এবং শিরক-এর বিরুদ্ধে লড়াই করা—তাকে নির্মূল ও নস্যাৎ করা। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل: ٣٦)

প্রত্যেক জনসমষ্টির নিকট আমরা রাসূল পাঠিয়েছি এই দাওয়াত দেয়ার জন্য যে, তোমরা দাসত্ব কবুল কর আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্-দ্রোহী শক্তিসমূহ পরিহার কর।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنَ* (الانبياء: ٢٤)

হে নবী! তোমার পূর্বে যে নবীই পাঠিয়েছি, তার প্রতিই ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া মা'বুদ কেউ নেই, অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর।

কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে, ইবাদতের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রার তওহীদী সকল আসমানী ধর্মমতের সম্মিলিত ঐক্যের মূল ভিত্তি। ইরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ يَاهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا (العمران: ٦٤)

বল হে নবী! হে আহ্লি কিতাব লোকেরা! তোমরা আস এমন এক বাণী ও মতাদর্শের দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সর্বতোভাবে সমানভাবে

গ্রহণীয়। আর তা হচ্ছে, আমরা এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোরই দাসত্ব বা ইবাদত করবো না এবং তাঁর সাথে অন্য কোন কিছুই শরীক বলে মেনে নেব না।

এ আয়াতে তওহীদী ইবাদত গ্রহণের আকুল আহবান ধ্বনিত ও ঘোষিত হয়েছে। দুনিয়ার যেসব জনগোষ্ঠীই আল্লাহ্র তওহীদের প্রতি নীতিগত ও আদর্শগতভাবে ঈমান গ্রহণ করেছে, বিশ্বাস করেছে যে, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি নিজ কিতাব নাযিল করেছেন এবং আল্লাহ্র নাযিল করা কোন কিতাবের প্রতি ঈমানও এনেছে; কিন্তু উত্তরকালে সেই তওহীদী আকীদা হারিয়ে ফেলে শির্ক-এর পংকিলতায় নিমজ্জিত হয়েছে, নির্বিশেষে তাদের সকলের প্রতি নতুন করে তওহীদী আকীদা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে উপরিউদ্ধৃত আয়াতটিতে।

'শির্ক'-এর পরিণতি সঠিক রূপ স্পষ্ট করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاۤءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ * (الحج: ٣١)

যে লোক আল্লাহ্র সাথে শির্ক করে, সে যেন আসমান থেকে পড়ে গেছে। অতঃপর তাকে পাখী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে নিক্ষেপ করবে অনেক দূরবর্তী স্থানে।

শির্ক এ নিমজ্জিত ব্যক্তির মর্মান্তিক পরিণতির বীভৎস রূপ তুলে ধরা হয়েছে আয়াতটিতে। সে পরিণতি দেখানো হয়েছে রূপক ভাষায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ কথার দ্বারা। বস্তুত শির্কের বাতুলতা, মুশরিকের ধ্বংস এবং তার চরম ব্যর্থতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা বোঝাবার জন্য এর চাইতে উত্তম দৃষ্টান্ত আর কিছু হতে পারে না।

শির্ক ও পৌত্তলিকতা

শির্ক ও পৌত্তলিক বিশ্বাসের মৌল উৎস সূচনা ও বিকাশ পর্যায়ে স্পষ্ট অকাট্য কথা বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কেননা দুনিয়ায় কবে, কখন ও কোন সমাজে তা প্রথম সূচিত হয়েছিল তা যেমন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তেমনি তার আনুষ্ঠানিক রূপ, পদ্ধতি ও ধরন-ধারণও কিছুমাত্র অভিন্ন নয়। বিচিত্র ধরনের ক্রিয়া-কলাপে তা বৈচিত্র্যময়।

জাহিলিয়াতের যুগে আরবে যে ধরনের পৌত্তলিকতা ছিল, ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিকতা তা থেকে ভিন্নতর। বৌদ্ধদের পৌত্তলিকতার সাথে আবার হিন্দুদের পৌত্তলিকতার কোন মিল নেই। শির্‌ক পর্যায়ে এই মূর্তিপূজারী ধর্মগোষ্ঠী সমূহের বিশ্বাসের মধ্যেও কোন সৌসাদৃশ্য নেই।

প্রাচীন আরব—আদ ও সামুদ—হযরত হূদ ও হযরত সালিহ (আ)-এর জনগোষ্ঠী, যেমন মাদয়ান ও সাবা'র অধিবাসী এবং হযরত শুয়াইব ও সুলায়মান (আ)-এর সময়কার লোকেরা মূর্তিপূজার সাথে সাথে সূর্যেরও পূজা করত। কুরআন মজীদে তাদের আকীদা ও চিন্তা-বিশ্বাসের উল্লেখ হয়েছে।

জাহিলিয়াতের আরবের অধিবাসীদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধররা মূলত তওহীদ বিশ্বাসী ছিল। তারা হযরত ইবরাহীম (আ) প্রচারিত আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি মৌলিকভাবে আস্থাবান থাকা সত্ত্বেও কালক্রমে এবং মূর্তিপূজারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলা-মেশার কারণে ধীরে ধীরে মূর্তিপূজারী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে যায়। এটা তদানীন্তন আরব সমাজ সম্পর্কে সাধারণ কথা। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মতে মক্কায় মূর্তিপূজার প্রবর্তন ও প্রচলন করে আমর ইবনে লুহাই নামক এক ব্যক্তি এবং তা খুব বেশীদিনের কথা নয়। মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ববিদদের অনেকেই মনে করেন, বড় বড় ব্যক্তিত্ব, রাজা-বাদশাহ, সমাজপতি ও ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অতি উঁচু দরের ব্যক্তি মনে করা ও তাদের প্রতি অত্যাদিক বাড়াবাড়িপূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ ও সম্মান প্রদর্শন থেকেই মূর্তি পূজার উৎপত্তি। উক্ত ধরনের ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর তাদের স্মৃতি রক্ষার সীমাতিরিক্ত আগ্রহ ও তার প্রতীক রক্ষার প্রবণতাই উত্তরকালে একদিন মূর্তি পূজার রূপ পরিগ্রহ করে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়ে নমরূদ সাধারণ জনগণের পূজ্য হওয়া সত্ত্বেও তার নেতৃত্বে সরকারী পর্যায়ে মূর্তিপূজার কাজ অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে পালন করা হতো। হযরত মূসা (আ)-এর সময়ের ফিরাউন নিজেই ছিল জনগণের মা'বুদ।[১] তা সত্ত্বেও সে নিজেও মূর্তিপূজা করত। এই পর্যায়ে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ (الاعراف: ١٢٧)

ফিরাউনের সময়ে জনগণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বলল (হে ফিরাউন) তুমি কি মূসা ও তার সঙ্গী লোকদেরকে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য উন্মুক্ত

১. প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সমাজে পরিবার প্রধান—পরিবার প্রতিপালক তার পরিবারের লোকদের দ্বারা পূজিত হতো। সে মরে গেলে তার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে তার পূজা করা হতো।

করে ছেড়ে দেবে আর সে তোমাকে ও তোমার উপাস্যদিগকে পরিহার করবে?

এক কথায় বলা যায়, প্রথম দিক দিয়ে বড় বড় লোকদের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা হত তাদের স্মরণীয় করে রাখার জন্য, কিন্তু কালের স্রোত অগ্রসর হওয়ার, বংশের পর নতুন বংশ গড়ে উঠার ফলে সেই আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সে প্রতীকী মূর্তিসমূহ পুরাপুরি উপাস্য মা'বুদে পরিণত হয়ে গেছে। এভাবেই মূর্তি পূজার উৎপত্তি, প্রচলন ও বিকাশ বা প্রসার হয়েছে এবং বহু তওহীদী জনতা পুরাপুরি মুশরিক জাতিতে পরিণত হয়ে গেছে।

ইবাদতে শির্ক

তওহীদের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তাকে এককভাবে মা'বুদ বানানো এবং কেবল তাঁরই ইবাদত করা এবং স্রষ্টার সৃষ্ট অন্য কারোরই ইবাদত না করা, অন্যদের ইবাদত পরিহার করা এবং তা সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলা। এর বিপরীত হচ্ছে ইবাদতে শির্ক করা। অর্থাৎ বিশ্ব স্রষ্টাকে এক ও লা-শরীক বিশ্বাস করেও কোন-না-কোন কারণ দেখিয়ে অপর কারোর ইবাদত করা। আল্লাহ্‌র একমাত্র 'ইলাহ্' হওয়া—একমাত্র 'রব্ব্' হওয়ার ক্ষেত্রেও শির্ক করা হবে যদি এক সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে বা তাঁর ইবাদতের সাথে সাথে অন্য কারোর একবিন্দু ইবাদত করা হয়। কেননা আল্লাহ্‌কে একক সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়ার অনিবার্য দাবি হচ্ছে তাঁকেই একমাত্র ইলাহ ও একমাত্র 'রব্ব' মেনে নেয়া।

ইবাদতে শির্ক হওয়ার কতিপয় কারণ কুরআন মজীদে নির্দেশিত হয়েছে। তা হচ্ছেঃ

১. একাধিক স্রষ্টায় বিশ্বাসঃ মূর্তি পূজারী ও ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী লোকেরা তাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের কারণেই একাধিক বা বহুসংখ্যক মা'বুদের ইবাদত করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মবিশ্বাসে তিনজন চিরন্তন ভগবানের বিশ্বাস মৌলিকভাবেই রয়েছে, যা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশমান। নাম তিনটি হচ্ছেঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। ব্রহ্মা—স্রষ্টা, অস্তিত্বদানকারী। বিষ্ণু—রক্ষাকারী এবং শিব—ধ্বংসকারী।

আর খৃস্টবাদে এই ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস-ই প্রকট। সে তিন খোদার নাম হচ্ছেঃ পিতা, পুত্র এবং রুহুল কুদুস। জরদশ্‌ত ধর্মমতে অপর দুইজন খোদায় বিশ্বাস রাখা হয়ঃ ইয়াজদান ও আহ্‌রিমন। এই দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে অগ্নি পূজারীরাও দুই খোদায় বিশ্বাসী। আবার অপর একদিকের বিবেচনায় তারা তিন খোদায় বিশ্বাসী।

মোটকথা, একাধিক 'ইলাহ্' বিশ্বাস-ই একাধিক উপাস্যের পূজা-উপাসনা করার মূলীভূত কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ বলে কুরআন মজীদে ঘোষণা করেছে। একাধিক স্রষ্টায় বিশ্বাস না হলে একাধিক উপাস্যের পূজা উপাসনা করা হতো না, এটাই কুরআনের দাবি। কুরআন মজীদে শির্ক-এর এই প্রধান কারণকে বাতিল ঘোষণা করেছে বিপুল সংখ্যক অকাট্য যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে।

২. এর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কহীনতা ঃ এই শ্রেণীর লোকদের ধারণা হচ্ছে, স্রষ্টা বিশ্বলোক সৃষ্টি করে এ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। যেমন ফুটবল খেলোয়ার বল-এ পা দিয়ে টোকা দিয়ে তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর অবস্থান সৃষ্টি লোক থেকে এতই দূরে যে, তিনি সৃষ্টির কোন কথা বা ফরিয়াদও শুনতে পান না। তাদের দোয়া বা দাবি তাঁর নিকট পৌছায় না। এ কারণে তারা এমন সব মাধ্যম গ্রহণ করে, যাদের সম্পর্কে তাদের মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, তারা তাদের দোয়া-প্রার্থনা স্রষ্টার নিকট পৌছাবার মাধ্যম হতে পারে। অন্যকথায়, এদের ধারণায় 'রব্ব' হওয়ার স্থানটা মানবীয় স্থান, প্রকৃত আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছা মাধ্যমের সহায়তা ভিন্ন সম্ভব নয়। 'আর এ কারণেই তারা তাদের নেককার ধর্মনেতা—পাদ্রী-পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, পীর-মুরশিদ, জ্বিন ও মরে যাওয়া নেক লোকদের রূহ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীলতা গ্রহণে নিজদিগকে বাধ্য মনে করেছে এবং তারা মনে করে নিয়েছে যে, এরাই তাদের দোয়া-প্রার্থনা রব্ব-এর নিকট পৌছিয়ে দেয়।

কিন্তু কুরআন মজীদ এই সব ধারণাকে সম্পূর্ণ বাতিল প্রমাণ করেছে বহুসংখ্যক আয়াত দ্বারা। বলেছে, আল্লাহ্ মহান স্রষ্টা—বিন্দুমাত্র দূরে নন। তিনি সকল নিকটের তুলনায়ও অনেক বেশী নিকটে অবস্থিত। তিনি লোকদের উচ্চারিত কথাই শুধু শুনেন না, তাদের মনের প্রচ্ছন্ন কথাও তিনি শুনেন ও জানেন। তিনি এই সবকিছুকেই পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। কাজেই উক্ত ধরনের কৃত্রিম মাধ্যম বা খোদা গ্রহণের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই, তাদের ইবাদত করা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়—নিতান্তই অর্থহীন। কেননা তাদেরকে যদি কেবল মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করা হয় এবং শুধু এই কারণেই তাদের ইবাদত করা হয় যে, আল্লাহ্র নিকট তাদের কথা পৌছাবার এরাই একমাত্র মাধ্যম, তাহলে তা এক অর্থহীন ও নির্বুদ্ধিতাজনক কাজ হবে এ কারণে যে, আল্লাহ্ নিজেই সব শুনেন ও জানেন। এ পর্যায়ের কতিপয় আয়াতাংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ* (ق : ١٦)

এবং আমরাই প্রত্যেক মানুষের অত্যাব নিকটবর্তী তার জীবন-স্নায়ুর চাইতেও।

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (الزمر: ٣٦)

আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য (সর্ব দিক দিয়েই) সম্পূর্ণভাবে যথেষ্ট নন? (নিশ্চয়ই যথেষ্ট)।

اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ (المؤمن: ٦٠)

তোমরা আমাকেই ডাকো, আমিই তোমাদের জবাব দেব।

قُلْ إِنْ تُخْفُوْا مَافِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ (ال عمران: ٢٩)

বল হে নবী! তোমরা যদি তোমাদের মনের কথা গোপন রাখ কিংবা তাকে প্রকাশই কর, আল্লাহ্ তা অবশ্যই জানবেন।

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ (المجادلة: ٧)

তিনজন লোকের গোপন কথা হলে আল্লাহ্ তথায় চতুর্থতম এবং পাঁচজনের হলে আল্লাহ্ সেখানে হন ষষ্ঠ।

কুরআন এসব আয়াতের মাধ্যমে পৌত্তলিকতার শির্ককে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

৩. আর তৃতীয় কারণ হচ্ছে বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনা-পরিচালনার কাজ ছোট ছোট 'খোদা'র উপর অর্পণ করা। প্রত্যেক মানুষ সর্বোচ্চ শক্তির নিকট আত্মসমর্পিত হওয়ার জন্য এক প্রবল আগ্রহ ও অস্থিরতা নিজের মনে প্রতিমুহূর্তেই অনুভব করে। আর তার তুলনায় নিজেকে মনে করে অতীব ক্ষুদ্র, ছোট এবং নগণ্য।

এ এক স্বাভাবিক ভাবধারা, যদিও তা মুখে উচ্চারিত হয় না, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তা প্রকাশ করে না, কেবল অনুভূতির গভীর-সূক্ষ্ম গহনে মানুষ তা তীব্রভাবে অনুভব করে। এসব কারণে মানুষ অনুভবের বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের সমীপে আত্মসমর্পিত হয়, প্রত্যেকটি জিনিসকেই একটা বস্তুগত রূপ দেয়ার জন্য মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে।

এই কারণেই মুশরিক লোকেরা তাদের মানসপটে দানা বেঁধে উঠা কল্পিত রূপকে বস্তুগতভাবে রূপায়িত করে এক-একটা প্রতীক বানিয়ে নেয়। ফলে তাদের প্রতীকী মূর্তিসমূহ এক-একটি প্রাকৃতিক শক্তির বস্তুগত রূপ ধারণা করে বসে, যার পশ্চাতে মানসলোকে থাকে মহা পরাক্রান্ত শক্তির অশরীরী রূপ-রেখা। আর সে বস্তুগত রূপও আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জিনিসসমূহেরেই কোন-না-কোন জিনিসের রূপ হয়ে থাকে। যেমন 'সমুদ্রের খোদা', 'যুদ্ধের খোদা', 'শান্তির খোদা' প্রভৃতি। তারা বিশ্বলোক কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পৃথিবীতে অবস্থিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহের মতই জীবনের সকল দিককে এক অভিন্ন সত্তা কেন্দ্রিক বানিয়ে দেয়। তাদের ইচ্ছা সেই শক্তিতে প্রতিফলিত হয়। তারা মনে করে, এরা যা-ইচ্ছা তা-ই করতে সক্ষম।

আর একারণেই সমুদ্রোপকূলবাসীরা 'সমুদ্রের খোদা'র উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে, যেন সে দেবতা সামুদ্রিক দ্রব্য-সম্ভার তাদের দান করে তাদের জীবনকে ধন্য করে দেয় এবং তার বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করে। অনুরূপভাবে স্থলভাগ ও মরুভূমি অধিবাসীরা স্থলভাগের দেবতার পূজায় আত্মনিবেদিত হয়েছে, যেন তার যাবতীয় কল্যাণ তাদের দেয়া হয় এবং তার সর্বপ্রকারের ক্ষতিকর দিকগুলি থেকে তাদের রক্ষা করা হয়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাদের এসব দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করা থেকে বঞ্চিতই থেকে যেত বলে তাদের মনের কাল্পনিক রূপকে বাস্তবে দাঁড় করাতে চেষ্টা করে এবং প্রতিমূর্তি বানিয়ে নেয় পৃথিবীর মাটি ও গাছ ইত্যাদি দিয়ে। পরে সেই মূর্তিগুলোরই পূজা করতে শুরু করে দিল। অদৃশ্য মূল মহাশক্তির পরিবর্তে তাঁর বিকল্প হিসেবে।

এ কারণে আরব জাহিলিয়াতের এক শ্রেণীর লোক ফেরেশতাদেরও পূজা উপাসনা করত। কিছু লোক জ্বিন-এর পূজা করত, কিছু লোক নীল আকাশে দৃশ্যমান ও স্থিতিশীল 'লুব্ধক' (Dogstar) নক্ষত্রের পূজা করত। কিছু লোক পূজা করত গ্রহ-উপগ্রহের । এই সবের ইবাদত—পূজা-উপাসনার মূল লক্ষ্য ছিল কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষা। মূর্তি নির্মাণে যদিও তারা বৈচিত্র্য ও যথেষ্ট উদারতার আশ্রয় নিয়েছে, তবুও মূলত একটা লক্ষ্য তাদের স্থির ও অপরিবর্তিত বা ব্যতিক্রমহীন ছিল। আর তা হচ্ছে গায়বী—অদৃশ্য ব্যাপারাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলা এবং বিশ্ব পরিচালনা-ব্যবস্থাপনার কাজ এরাই সম্পন্ন করে বলে বিশ্বাস করা।

কুরআন মজীদ তাদের এই বিশ্বাসের উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনে তাদের বিশ্বাসকে ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। কুরআন স্পষ্ট-উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে,

তাদের ধারণানুযায়ী এসব 'ছোট ছোট খোদা' যেসব কাজ আঞ্জাম দেয় বলে তারা মনে করে, আসলে তা সব মহান আল্লাহ্ নিজেই সম্পন্ন করেন এবং তারা যাদের 'খোদা' বানিয়েছে, আসলে তাদেরও খোদা হচ্ছেন স্বয়ং তিনিই। ইরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ (يونس: ٣)

অতঃপর তিনি স্থির সুসমঞ্জস হয়ে গেলেন আরশের উপর, সমগ্র ব্যাপারের ব্যবস্থাপনা করতে লাগলেন।

সৃষ্টি—জীবন দান, মৃত্যু দান, নক্ষত্র ও কক্ষ লোক পরিচালন, সৌর লোক পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ, রিযিক দান, সংরক্ষণ প্রভৃতি সকল কাজ এককভাবে আল্লাহ্ তা'আলাই করেন। তাঁর সাথে এসব ব্যাপারে কেউ শরীক আছে বলে বিশ্বাস করাকে তীব্র ঘৃণা সহকারে প্রতিবাদ করেছেন ও তার প্রতি তীব্র ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। বিশ্বলোক পরিচালনা-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একবিন্দু ক্ষমতা অন্য কেউ চালাতে পারে এরূপ বিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটিত করে দিয়েছেন। এ পর্যায়ের অসংখ্য আয়াতের মধ্যে মাত্র দু'টির এখানে উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ۞

(الاعراف: ٥٤)

তোমাদের 'রব্ব' তো সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয়টি পর্যায়ের সময়কালের মধ্যে। অতঃপর শক্তির মূল কেন্দ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেন, রাত দিনকে আচ্ছন্ন করে তাকে দ্রুত সন্ধান করে। এতদ্ব্যতীত সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রপুঞ্জ তাঁরই নিয়মতন্ত্র দ্বারা কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রিত। জেনে রাখো, সৃষ্টি তাঁরই। ব্যবস্থাপনা-সমষ্টিও একমাত্র তারই নিয়ন্ত্রণাধীন। সারে জাহানের রব্ব আল্লাহ্ বড়ই মহান বরকতওয়ালা।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ

فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ * فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ فَاَنّٰى تُصْرَفُونَ * (يونس: ٣١-٣٢)

বল, আসমান-যমীন থেকে তোমাদেরকে কে রিযিক দেয়? কে কর্তৃত্ব করে শ্রবণ ও দৃষ্টির উপর? মৃত থেকে জীবন্তকে এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে কে বের করে? কে যাবতীয় ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করে? ....ওরা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ্ই (সবকিছু করেন)। তাহলে বল, তোমরা সে আল্লাহ্কে ভয় পাও না? এই আল্লাহ্ই তো তোমাদের পরম সত্য রব্ব। সে সত্যকে বাদ দিলে অতঃপর চরম গুমরাহী ছাড়া আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে?...তাহলে তোমরা কোন্ দিক থেকে বিভ্রান্ত হচ্ছে?

মানুষকে শির্ক-এ নিমজ্জিত করে যেসব ব্যাপার, এখানে তার মধ্য থেকে মাত্র তিনটিরই উল্লেখ করা হলো। বলা হচ্ছে না যে, এছাড়া আর কোন কারণ হতে পারে না। তবে এ তিনটি কারণ যে প্রধান, তা অনস্বীকার্য। কেননা ঈমানদার মুসলিম মাত্রই এই দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করেন যে, আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ব লোকের একমাত্র 'ইলাহ'। তিনি এক ও একক। তিনি সর্বত্র সর্বক্ষণ উপস্থিত, কোথাও কোন মুহূর্তেই তিনি অনুপস্থিত নন। মানুষের সবচাইতে নিকটবর্তী তিনি, তার নিজরে থেকেও। তাঁরই কর্তৃত্বাধীন গোটা সৃষ্টিলোক, সৃষ্টিলোকের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা। এর একবিন্দু কাজও অন্য কোন শক্তির নিকট সোপর্দ করা হয়নি।

এ বিশ্বাসের কারণেই কোন মুসলিম ব্যক্তি এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেই— কোন একটি দিক দিয়েও—মা'বুদ বানাতে পারে না। মুসলিম ব্যক্তি এক আল্লাহ্র ঐকান্তিক ইবাদত করেই ক্ষান্ত থাকতে পারেন না, এই তওহীদী আকীদা ও আমলের পরিপন্থী—শিরকী আকীদা ও আমলের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে— তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও তিনি বাধ্য।

কেবল বিশ্বলোক ব্যবস্থাপনাই নয়, তাত্ত্বিক দিক দিয়ে আল্লাহ্কে এক ও লা-শরীক মেনে নিয়েও কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, 'শাফা'আত' ও মাগ্ফিরাত (Mediation-intercession-Forgiveness) মূলত একান্তভাবে আল্লাহ্র কাজ হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেই তা তাঁর বান্দাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে থাকতে পারেন এবং সেই 'প্রিয় বান্দারা' এই ক্ষেত্রে জনগণের আশ্রয় হয়েও দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু এইরূপ ধারণাও মানুষকে মুশরিক বানাবার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। অথচ আল্লাহ্র কালাম স্পষ্ট অকাট্য ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এই কাজও মূলত এবং কার্যত মহান আল্লাহ্র নিজেরই আয়ত্তাধীন-

কর্তৃত্বাধীন। আল্লাহ্‌র নিজের অনুমতি ব্যতীত কেউই এবং কারো জন্যই শাফা'আত করতে পারবে না. কুরআন বলে দিয়েছেঃ

قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا* (الزمر: ٤٤)

বল, শাফা'আত সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য সংরক্ষিত।

মানুষের গুনাহের মাগ্‌ফিরাত দানও একান্তভাবে সেই এক আল্লাহ্‌রই কাজ। বান্দার গুনাহ হয় কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট। কাজেই তা ক্ষমা করার অধিকারও যেমন একমাত্র আল্লাহ্‌র তেমনি তা করতে পারেনও একমাত্র তিনি-ই। যদি কেউ ধারণা করে যে, গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা অন্য কারো আছে. তাহলে সে স্পষ্টভাবে শিরক করে। কুরআন বলেছেঃ

فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهُ (ال عمران: ١٣٥)

অতএব তোমরা তাদের জন্য ক্ষমা চাও। আর আল্লাহ্‌ ছাড়া গুনাহর ক্ষমাদান আর কে-ই বা করতে পারে?

অতএব কেবল এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করাই তওহীদী আকীদার দাবি নয়, বরং সেই প্রসঙ্গের যাবতীয় কাজ— এমনকি শাফা'আত করা ও গুনাহ মাফ করার কাজ কেবল আল্লাহ্‌ই করেন, করতে পারেন—এই বিশ্বাস রাখা এবং সরাসরিভাবে আল্লাহ্‌র শাফা'আত ও মাগফিরাত পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা তওহীদ বিশ্বাসী মু'মিনের কাজ।

কেননা আরবী 'ইবাদত' (عبادة) শব্দের অর্থ কেবলমাত্র বিনয় ও সম্মান প্রদর্শনই নয়। তাফসীর ও অভিধান লেখকগণ 'ইবাদত' শব্দের অর্থ বলেছেনঃ الخضوع و التذلل (Submission Humiliation) আত্মসমর্পণ, আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় আত্মঅবমাননা—নিজকে হীন-নগণ্য মনে করা।[১] ইমাম রাগেব লিখেছেনঃ العبودية الهار لتذلل ইবাদত হচ্ছে নিজের নগণ্যতা-হীনতা প্রকাশ করা চূড়ান্ত মাত্রায়। তা পাওয়ার অধিকার কেবল তাঁরই, যিনি সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত। আর তিনি আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ নয়। এ কারণেই আল্লাহ্‌র পক্ষেই এরূপ নির্দেশদান সর্বাধিক যুক্তিযুক্তঃ

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ

তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারোরই ইবাদত করবে না।

১. لسان العرب - ابن منظور

আর ফিরোজাবাদী রচিত القاموس المحيط লিখেছেঃ العادة الطاعة ইবাদত অর্থ আনুগত্য, অনুসরণ, মান্যতা, অধীনতা।

মোটকথা, তাফসীর ও অভিধান লেখকগণ 'ইবাদত' শব্দের ব্যাপক তাৎপর্য প্রকাশ করতে চেষ্টা পেয়েছেন। অনেক সময় এ শব্দটি তার প্রত্যক্ষ অর্থের পরিবর্তে পরোক্ষ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে 'ইলাহ্' মনে করা যেমন স্পষ্ট শির্‌ক, তেমনি একমাত্র আল্লাহ্‌কেই 'ইলাহ্' মেনে নেয়া ও কেবল তাঁরই ইবাদত করাই হচ্ছে তওহীদ। কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতাংশসমূহ এই পর্যায়ে পঠনীয়ঃ

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * (الحجر: ٩٦)

মুশরিক তারা, যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে ইলাহ্ বানায়, ওরা এর পরিণতি শীগ্‌গীরই জানতে পারবে।

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ (الفرقان: ٦٨)

রহমানের প্রকৃত তওহীদবাদী বান্দা তারা, যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ বানায় না।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (مريم: ٨١)

মুশরিকরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে বহু ইলাহ্ গ্রহণ করেছে, যেন তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায় ও বিজয় লাভ হয়।

اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى (الانعام: ١٩)

তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য ইলাহ্‌ও রয়েছে?

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِاَبِيهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً (الانعام: ٧٤)

ইবরাহীম যখন তার পিতা আজরকে বলল, তুমি কি মূর্তিগুলিকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করছ?

এসব আয়াত স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুশরিকরা তাদের নিজেদের নির্মিত মূর্তিগুলোকে 'ইলাহ্' মনে করত। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইলাহ্ বানানো যেমন শির্‌ক, তেমনি শিরক্ আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন 'ইলাহ্'র শরীক থাকার কথা বিশ্বাস করা।

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ * الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا أٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * (الحجر: ٩٤-٩٦)

এবং মুশরিকের দিক থেকে ফিরে থাক। আমরা একাই তোমার জন্য যথেষ্ট সে সব বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে অপর ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে। ওরা শীগগীরই এর পরিণতি জানতে পারবে।

أَمْ لَهُمْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * (الطور: ٤٣)

ওদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়াও কোন 'ইলাহ্' আছে নাকি? ওদের এই শির্‌ক থেকে আল্লাহ্ তো মহান পবিত্র।

এই শির্‌কি আকীদা'র কারণেই মুশরিকরা যখন দ্বীন-ইসলামের তওহীদী ঘোষণা—আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই—শুনতে পেত, তখন তারা সে কথা মেনে নিতে আদৌ প্রস্তুত হতো না। বরং অহংকারে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াত।

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ * (الصفت: ٣٥)

ওদের যখনই বলা হতো আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তখনই তারা অহংকার প্রকাশ করত।

এ কারণে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর অতিপ্রাকৃতিক জগতের উপর কর্তৃত্ব আছে এবং অতিপ্রাকৃতিক—অ-বস্তুগত কিংবা অলৌকিকভাবে কাউকে সাহায্য করতে বা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে বলে বিশ্বাস করা-ও সুস্পষ্ট শির্‌ক পর্যায়ভুক্ত। তাই যদি কেউ আল্লাহ্ ছাড়া কারোর সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং অলৌকিক ভাবেই কোন ঘটনা সংঘটিত করতে, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য, রোজগারহীনকে রোজগার, সন্তানহীনকে সন্তান দিতে পারে, তাহলে সে হবে মুশরিক। কেননা সে এমন একটি শক্তি এমন একজনের আছে বলে বিশ্বাস করছে যা মূলত-ই তার নেই, থাকতে পারে না, যে শক্তি থাকতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র এবং তা একান্তভাবে তাঁরই রয়েছে।

তবে সে বিশ্বাস যদি এরূপ হয় যে, সে শক্তি মূলত আল্লাহ্‌র আর সে লোক স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তা লাভ করে এবং তাঁরই অনুমতিক্রমে সে তা ব্যবহার করছে মাত্র, তাহলে সে বিশ্বাস প্রকাশমান বস্তুগত শক্তির প্রতি বিশ্বাসের পর্যায়েই গণ্য হবে। সে বিশ্বাসে শির্‌কের অবকাশ নেই। কেননা সে

শক্তি তো আল্লাহ্‌রই দেয়া। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, যতটা শক্তি ইচ্ছা দিতেই পারেন, যেমন অন্যান্য হাজারও রকমের শক্তি তিনি মানুষকে ও অন্যান্য সৃষ্টিকে দান করেছেন। তাই কোন শক্তির মৌলিকভাবে মালিকত্ব কোন মানুষের (বা অন্য কারোর) আছে বলে বিশ্বাস করা শির্ক, আর মৌলিকভাবে নয়, আল্লাহ্‌র দেয়ার ফলে অধিকারী হওয়ার কথা বিশ্বাস করলে তা হবে তওহীদ। তবে এই শক্তি আছে বলে কারোর নিজের জন্য বা অন্যের জন্য দাবি করার অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। কেননা তা দাবি করার বিষয়ই নয়।

এক্ষণে কোন পিপাসার্ত ব্যক্তি যদি কারো নিকট পানি চায়, তবে তা স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ীই কাজ হবে, তাতে অলৌকিকত্ব বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তি বিশ্বাসের কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু কোন মৃত নবী, পীর, গাওস, ওলীর কবরের নিকট গিয়ে অনাবৃষ্টিকালে যদি বৃষ্টিপাত চাওয়া হয়, তাহলে এইরূপ চাওয়ার মূলে এই বিশ্বাস নিহিত থাকে যে, যার কাছে বৃষ্টি চাওয়া হয়েছে সে অলৌকিকভাবে বৃষ্টি বর্ষাণের ক্ষমতার অধিকারী। আর এটাই শির্ক। কেননা এইরূপ শক্তি যারই আছে বলে বিশ্বাস করা হবে, তাকে-ই 'ইলাহ্' বানানো হবে। অথচ কুরআনের ঘোষণানুযায়ী অলৌকিকভাবে কারোর উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌রই আছে, অন্য কারোর নেই।

হযরত ইউসুফ মিসরে অবস্থানকালে ভাইদের নিকট পরিচিত হওয়ার পর তাদের সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِينَ* اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلٰى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا* (يوسف: ٩٢-٩٣)

আজকের দিন তোমাদের উপর কোন প্রতিশোধমূলক আচারণ নেই। আল্লাহ্ই তোমাদের ক্ষমা করবেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াশীল। তোমরা আমার জামাটি নিয়ে গিয়ে আমার অন্ধ পিতার মুখের উপর ফেল, তিনি দৃষ্টিবান হয়ে যাবেন।

বাহ্যত মনে হয়, হযরত ইউসুফের পিতা হযরত ইয়াকুবের অন্ধত্ব দূর হওয়ার জন্য হযরত ইউসুফের বলা এই প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় এবং এই শক্তি তাঁর নিজের; কিন্তু আসলে তা নয়। কেননা একে তো তিনি নিজে নবী ছিলেন, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে শক্তি প্রাপ্ত। দ্বিতীয়, এটাও তাঁরই রহমতের ব্যাপার, যার উল্লেখ পূর্ববর্তী আয়াতে 'সূরা আরহামুর-রাহিমীন' বলে প্রকাশ করা হয়েছে।

হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ

اِضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا (البقرة: ٦٠)

তুমি তোমার লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডের উপর আঘাত কর. (আঘাত করা হলে) তা থেকে বারোটি ধারা প্রবাহিত হতে লাগল।

পাথরের বুক চিড়ে পানির উক্ত বারোটি ধারা প্রবাহিত করার ক্ষমতা লাঠির যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না হযরত মূসা (আ)-এর। তা-ও আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই সম্পন্ন হয়েছিল। এখানে অলৌকিকত্ব কিছু থাকলেও তা আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্র দেয়া শক্তির বলে প্রাপ্ত। তাই এর সত্যতা বিশ্বাসের শির্কের কোন স্থান নেই। আর বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের নবীর নিকট পানি চেয়েছিল এই কথা মনে করে নয় যে, তিনি নিজ ক্ষমতা বলেই মরু-ভূমিতে পানির ব্যবস্থা করে দেবেন। বরং এ জন্য যে, তিনি আল্লাহ্র নিকট পানির ব্যবস্থা করার জন্য প্রার্থনা করবেন। কেননা সেখানে পানির ব্যবস্থা করার কোন ক্ষমতা নবীর ছিল না।

এইভাবে হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য সাবা-সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন নিজের নিকট উপস্থিত করানো, হযরত ঈসা (আ)-এর মাটি দিয়ে জীবন্ত পাখি তৈরি করা, জন্মান্ধ ও শ্বেত রোগীর রোগমুক্তি, মৃতকে জীবন্তকরণ, মানুষ ঘরে যা খায় ও জমা করে তা বলে দিতে পারা প্রভৃতি ধরনের সব কাজ একমাত্র আল্লাহ্রই অলৌকিক কুদরতের প্রকাশ মাত্র। তাতে অন্য কারোর নিজস্ব মৌলিক ক্ষমতার কোন অধিকার নেই।

হযরত সুলায়মানের জ্বিন্দিগকে কর্মরত রাখার শক্তি আল্লাহ্র দেয়া ছিল। বলা হয়েছেঃ

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ .... يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ (سبا: ١٢-١٧)

কতক জ্বিন ছিল যারা তার রব্ব-এর অনুমতিক্রমে তার সম্মুখেই কাজ করছিল। ... ... তারা তার জন্য কাজ করছিল যেমন সে চাইত।

বাতাসের উপর তাঁর কর্তৃত্ব হয়েছিল আল্লাহ্রই নির্দেশক্রমে ...

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهِ (الانبياء: ٨١)

সুলায়মানের জন্য বাতাস ছিল প্রচণ্ড ঝড়ো, আল্লাহ্রই নির্দেশে তা প্রবাহিত হত।

হযরত ঈসা (আ)-এর উপরিউক্ত শক্তি বা ক্ষমতা সম্পর্কে কুরআন মজীদে তাঁরই জবানীতে বলা হয়েছে:

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*

(ال عمران: ٤٩)

আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির আকৃতির মত বানাই, পরে তাতে আমি ফুঁক দেই, তখন আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই সেটি পাখি হয়ে যায়। আর আমি জন্মান্ধ ও শ্বেতরোগীকে নিরাময় করে দেই—মৃতকে জীবিত করি আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই এবং তোমরা যা খাও ও যা তোমাদের ঘরে সঞ্চয় করে রাখ, সে বিষয়ে তোমাদিগকে অবহিত করি...... এসবের মধ্যেই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শন রয়েছে, অবশ্য যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।

প্রত্যেকটি কাজের উল্লেখের সাথে সাথে 'আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে' বলার তাৎপর্য হচ্ছে একথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দেয়া যে, কাজটি অলৌকিক ধরনের এবং একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যত আমিই তা করছি। কিন্তু তা করার মূলত আমার নিজের কোন ক্ষমতা বা সাধ্য নেই। তা করতে পারছি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে। আল্লাহ্‌র অনুমতি ও শক্তিদান ব্যতীত এ কাজ করা আমার পক্ষে কিছুতেই এবং কখনই সম্ভব হতে পারে না। অন্য কথায় কাজটি আল্লাহ্‌র, তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্তানুযায়ী বান্দার দ্বারা করিয়ে নিচ্ছেন মাত্র।

যেমন প্রত্যেকটি কাজ পর্যায়ে আল্লাহ্ তাঁর নিজের অনুমতি ও শক্তি দানের কথা নিজেই হযরত ঈসা (আ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন সূরা আল-মায়েদার এ আয়াতেঃ

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي

(المائده: ١١٠)

এবং তুমি যখন মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানাও আমার অনুমতিক্রমে, অতঃপর তাতে ফুঁ দাও, পরে তা পাখি হয়ে যায় আমার অনুমতিক্রমে এবং তুমি জন্মান্ধ ও শ্বেতরোগীকে নিরাময় কর আমার অনুমতিক্রমে; আর মৃতকে জীবন্ত কর আমার অনুমতিক্রমে... ...।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র কর্তৃত্ব গোটা প্রাকৃতিক জগতের উপর। এখানে আল্লাহ্‌র অনুমতি ও শক্তিদান ব্যতিরেকে কারোরই কিছু করার সাধ্য নেই। এমনকি আল্লাহ্ যখন আগুনের দাহিকা শক্তি ও পানির আগুন নেভানোর কাজ করতে নিষেধ করবেন কিংবা কাজ করতে দিতে চাইবেন না, তখন সে সব শক্তি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যেতে বাধ্য। যেমন বলা হয়েছেঃ

قُلْنَا يَانَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ (الانبيا : ٦٩)

আমরা নির্দেশ দিলাম, হে আগুন, শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও ইবরাহীমের প্রতি।

নবী-রাসূলগণের মুযিজা দেখানো পর্যায়েও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাই ঘোষণা করেছেন নিম্নোদ্ধৃত আয়াতেঃ

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ (المؤمن: ٧٨)

এবং কোন রাসূলেরই কোন মুযিজা বা নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা বা অধিকার নেই আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত।

অতএব প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর নিজস্ব ক্ষমতা ও ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা বা অধিকার আছে—একথা বিশ্বাস করা সুস্পষ্টরূপে শির্‌ক।

কার্যকারণের সহায়তা গ্রহণ কি শির্‌ক?

কার্যকারণের এই জগত আল্লাহ্ তা'আলারই সৃষ্টি। এখানে তিনি মানুষকে কার্যকারণের বাধ্যবাধকতার মধ্যে জীবন যাপনকারী জীব হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন। অতএব মানুষ এ জগতে বেঁচে থাকার জন্য কার্যকারণের—বস্তুগত দ্রব্য সামগ্রীর আনুকূল্য ও সহায়তা গ্রহণে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য। অতএব নিছক কার্যকারণের সহায়তা গ্রহণ নিশ্চয়ই শির্‌ক হবে না। তবে সেই সাথে যদি এই বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে, কার্যকারণ সমূহেই নিজস্ব স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শক্তি রয়েছে কোন কাজ ঘটানোর, তাতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বা অনুমতির কোন অপেক্ষা নেই, তাহলে তা অবশ্যই শির্‌ক হবে। যেমন ঘরে আগুন লেগেছে। স্বাভাবিক

নিয়মেই আগুনে ঘর জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। এই জ্বালানোর শক্তি আগুনের নিজস্ব এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়াই তা জ্বালাবে—এইরূপ ধারণা পোষণ শির্‌ক। অনুরূপভাবে সে আগুন নেভানোর জন্য অবিলম্বে পানি ঢালতে হবে। পানি আগুন নিভিয়ে ফেলবে। কিন্তু যদি মনে করা হয় যে. পানির আগুন নেভানোর শক্তি একান্তই নিজস্ব, তা আগুন নেভাবেই—আল্লাহ্‌র অনুমতি না হলেও. তবে তা-ও শির্‌ক হবে।

এখানে তওহীদী বিশ্বাস হলো. আগুন জ্বালায় আল্লাহ্‌র দেয়া দাহিকা শক্তির বলে ও তাঁর অনুমতিক্রমে এবং পানি আগুন নিভায় আল্লাহ্‌র দেয়া নির্বাপণ শক্তির বলে ও তার অনুমতিক্রমে। আল্লাহ্‌র দেয়া শক্তি ছাড়া আগুন বা পানি—কারোরই কোন শক্তি নেই, কারোরই কিছু করার নেই। সমগ্র প্রাকৃতিক আইন, বস্তু. দ্রব্য-সম্ভার, ঔষধপত্র সব কিছুর ক্ষেত্রেই শির্‌ক ও তওহীদী আকীদার মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহে এই তওহীদ ও শির্‌কের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছেঃ

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ* (الروم: ٣٣)

মানুষের উপর যখন কোন বিপদ আসে তখন তারা তাদের রব্ব্‌কে ডাকে তাঁরই নিকট ঐকান্তিকভাবে আত্মনিবেদিত হয়ে। পরে তাঁরই নিকট থেকে যখন রহমতের স্বাদ তাদের আস্বাদন করানো হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক তাদের রব্ব্‌-এর সাথে শির্‌ক করতে শুরু করে দেয়।

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ۔(العنكبوت: ٦٥)

যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাঁর জন্য আনুগত্য একনিষ্ঠ করে দিয়ে। পরে তিনিই যখন তাদেরকে নিরাপদে স্থলে পৌঁছিয়ে দেন, তখন তারা শির্‌ক করতে শুরু করে।

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ۔(الانعام: ٦٤)

‘বল. আল্লাহ্‌ই তাদের সে অবস্থা থেকে মুক্তি...সকল বিপদ থেকেই, তারপরে তোমরা শির্‌ক করতে শুরু কর।

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔(النحل: ٥٤)

অতঃপর তোমাদের থেকে যখন বিপদ দূর হয়ে যায়, তখন কিছু লোক তাদের রব্ব্-এর সাথে শির্ক করতে শুরু করে দেয়।

এসব আয়াতে প্রথমে তওহীদ বিশ্বাসের মানসিকতার উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, পরবর্তী অবস্থায় মানুষ শির্ক করতে শুরু করে। পরবর্তী অবস্থায় তারা পূর্ববর্তী অবস্থার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায় বলেই তা সম্ভব হয়। প্রথম অবস্থায় বৈষয়িক কারণের অনুভূতি তীব্র হয় না, মনে করা হয়, এটা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু পরবর্তী অবস্থায় তারা যেসব বস্তুগত উপায়-উপকরণের অনুকূল্য পেয়ে যায়, তখন তারা সেইগুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র-স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে। স্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহ্র অফুরন্ত দান ও সহায়তার কথা তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পড়ে। এখানে মানুষের শির্ক-এর মধ্যে পড়ে যাওয়ার এটাই মৌল কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রাথমিক অবস্থা যেমন একমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ, পরবর্তী অবস্থাও সেই আল্লাহ্রই কুদরতের অবদান। এই বিশ্বাসে অবিচল থাকলে শির্কে পড়ে যাওয়ার কোন কারণ ঘটে না।

বায়ু প্রবাহ ও বৃষ্টিপাত—দুটিই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা, নিতান্তই প্রাকৃতিক নিয়মাধীন বলে বাহ্যত মনে হয়। আধুনিক বিজ্ঞান তার পশ্চাতে দীর্ঘ প্রাকৃতিক ও বস্তুগত কার্যকারণের সন্ধান পেয়েছে, যেগুলোকে এ দুটি ঘটনার মৌল কারণ বলে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং তা-ই বিশ্বাস করাতে চাইছে। কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন, এর পশ্চাতে রয়েছে আল্লাহ্র বিশেষ কুদরতের কারসাজি।

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًى بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ (الاعراف: ٥٧)

সেই আল্লাহ্ই বাতাসকে তাঁর রহমত (বৃষ্টি) বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদ রূপে প্রবাহিত করেন।

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ

(الشورى: ٢٨)

এবং সেই আল্লাহ্ই বৃষ্টি বর্ষণ করেন মানুষের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর এবং তাঁর রহমত বিস্তার করেন।

বাতাসের প্রবাহ চালানো ও তার পরে বৃষ্টি বর্ষণ প্রাকৃতিক নিয়মাধীন কাজ। কিন্তু এই প্রাকৃতিক নিয়ম যেমন একমাত্র আল্লাহ্র সৃষ্টি ও চালু করা, তেমনি

সে প্রাকৃতিক নিয়মের কার্যকরতা–বাতাসের প্রবাহ হওয়া ও বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া–আল্লাহ্‌র নিজস্ব কাজ। তিনিই তা নিজ কুদরতে করান। অন্য কথায় কুরআন প্রাকৃতিক নিয়মকে অস্বীকার করেনি–অস্বীকার করেনি তার সর্বাত্মক কার্যকরতাকে। বরং এই সব কিছুরই উপরে স্বয়ং প্রাকৃতিক নিয়মের স্রষ্ঠা মহান আল্লাহ্‌র কুদরত ও ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মও তার কার্যকরতাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন বানিয়ে দিয়েছে।

অতএব এই বিশ্বাসের অধীন প্রাকৃতিক কার্যকারণের সহায়তা গ্রহণ শির্ক নয়। শির্ক হচ্ছে, তাকে স্বাধীন স্বেচ্ছাধিকারী ও স্বয়ংক্রিয় মনে করা। আর তওহীদ হচ্ছে, তাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও অনুমতির অধীন মনে করা। কাজেই কেউ যদি পিপাসার্ত হয়ে তার চাকরের নিকট পানি চায়, তবে এই চাওয়ায় শির্ক হবে না। কেননা সেতো স্বাভাবিক সাধারণ প্রচলনকেই আশ্রয় করেছে। তাকে কোন অলৌকিক ক্ষমতার মালিক ধারণা করেনি। কিন্তু কোন মৃত ওলী, পীর, গাওসের নিকট পানি চাইলে তার অর্থ হবে সে মনে করে, তার অলৌকিক ক্ষমতা আছে, সে অলৌকিক উপায়ে তার পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারে। এই কথাই বলেছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়াঃ

وَمِنْ اَنْوَاعِ الشِّرْكِ طَلَبُ الْحَوَآئِجِ مِنَ الْمَوْتٰى وَلْاِسْتِعَانَهُ بِهِمْ وَالتَّوَجُّهُ اِلَيْهِمْ وَهٰذَا اَهْلُ شِرْكِ الْعَلَمِ فَاِنَّ الْمَيِّتَ قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَايَمْلِكُ لِنَفْسِهٖ ضَرًّ وَّلَانَفْعًا -

মৃতদের নিকট প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়া, তাদের সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা শির্কেরেই বিভিন্ন রূপ। আর তা-ই হচ্ছে পৃথিবীতে শির্কের মূল। কেননা মৃত ব্যক্তির আমল-কাল নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখানে সে তার নিজের জন্য কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না।[১]

তিনি অপর এক প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

যে লোক কোন নবী বা নেককার ব্যক্তির কবরের নিকট এসে তার কোন প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করবে, কোনরূপ সাহায্য সহায়তা চাইবে–যেমন তার রোগ দূর করার, ঋণ শোধ করার বা এই ধরনের কোন কাজের জন্য দোয়া করবে–যা করার প্রকৃত ক্ষমতা আল্লাহ্‌ ছাড়া কারোর নেই, তা সুস্পষ্ট শির্ক

১. فتح المجيد ص ٦٨ - الطبعة السادسه

হবে। কেউ এরূপ করে থাকলে তার তওবা করা বাঞ্ছনীয়। তওবা করলে ভালো। নতুবা তাকে হত্যা করতে হবে।[১]

কেননা রোগ নিরাময় করার মৌলিক **ক্ষমতা আল্লাহ্** ছাড়া আর কোরোর নেইঃ

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ – (الشعراء : ٨٠)

আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হই, তখন আল্লাহ্ই আমাকে নিরাময়তা দান করেন।

'মধু'তে নিরাময়তা রয়েছে আল্লাহ্ দিয়েছেন বলে–কুরআনও নিরাময় এজন্য যে, আল্লাহ্ই তাকে তাই বানিয়েছেন বলে স্বয়ং আল্লাহ্ই ঘোষণা করেছেন। **এক্ষণে কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, মধু ও কুরআন নিজস্ব শক্তির বলেই নিরাময়তা দিতে পারে, তাহলে অবশ্যই শির্‌ক হবে।**

১. زيارة القبور والاستنجاد بالقبورص : ١٥٦

আইন প্রণয়নে তওহীদ

এ দুনিয়ায় মানুষের জীবন সামাজিক-সামষ্টিক জীবন। একক ও বিচ্ছিন্ন জীবন এ দুনিয়ায় মানুষে পক্ষে সম্ভব নয়। এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের প্রতি মানুষের প্রবণতা একান্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আত্মপ্রেম মানুষের স্বাভাবগত। এ কারণে মানুষ সব কিছু নিজের জন্য আয়ত্তাধীন করতে সচেষ্ট হয়। ফলে ব্যক্তি ও সমাজ সমষ্টির মাঝে দ্বন্দ্ব চিরন্তন। মানুষ এই দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচতে চায়, চায় নিজের অধিকার লাভ করতে, যেমন সমাজ-সমষ্টি সব সময়ই সচেষ্ট থাকে নিজের প্রাপ্যকে বড় করে দেখাতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে। এই দ্বন্দ্বে কখনও ব্যক্তি সমাজ-সমষ্টির উপর বিজয়ী হয়, কখনও সমাজ-সমষ্টি বিজয়ী হয় ব্যক্তির উপর। এই উভয় অবস্থাই অস্বাভাবিক, মানুষের জীবনে নিয়ে আসে সর্বাত্মক বিপর্যয়। এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই প্রয়োজন আইন ও বিধানের। আইন ও বিধান উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেকের ন্যায্য প্রাপ্য যথাযথভাবে পাওয়ার ব্যবস্থা করে। তাই আইনেরও বিধান ব্যক্তি ও সমষ্টি–উভয়ের সার্বিক কল্যাণের জন্য একান্তই অপরিহার্য।

কিন্তু মানুষ এমন আইন-বিধান কোথায় পাবে, যা তাদের উভয়ের প্রতি পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে, যা ব্যক্তিকে সমাজ স্বার্থ বিনষ্ট করতে দেবে না, সমাজকে দেবে না ব্যক্তি-স্বার্থকে হরণ করতে? যে আইন-বিধান ব্যক্তির বিকাশ সাধনে হবে সহায়ক এবং সমাজ ও সভ্যতার হবে পরম পৃষ্ঠপোষক? উভয়ের প্রতি পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে ইনসাফ করবে, ন্যায়পরতা العدل। প্রতিষ্ঠিত করবে?

এইরূপ আইন-বিধান মানুষ নিজে মৌলিকভাবে রচনা করতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি বা মানব-সমষ্টিকে এরূপ একটি আইন বা বিধান রচনার দায়িত্ব দেয়া হয়, তাহলে তা কখনই সুবিচারক বা পক্ষপাতিত্বমুক্ত হবে না। ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত আইন-বিধান রচনা করলে তাতে ব্যক্তি-স্বার্থ প্রধান হয়ে দেখা দেবে, কোন বিশেষ শ্রেণী বা দলকে ক্ষমতা দিলে তাতে অনিবার্যভাবে প্রবল হয়ে দাঁড়াবে শ্রেণী বা দলীয় বিবেচনা। ফলে মানব জীবনে কাঙ্ক্ষিত-সুবিচার ও ন্যায়পরতা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা কখনই স্থাপিত হতে পারবে না। তাহলে মানুষের জন্য আইন-বিধান প্রণয়নকারী হতে পারে কে?

স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায়, মানুষের জন্য আইন-প্রণয়নকারী নিশ্চয়ই চাইবে মানব সমাজকে সঠিক পূর্ণত্বের দিকে চালিত করতে। আর তারই আলোকে ব্যক্তিদের পারস্পরিক কর্তব্য দায়িত্ব এবং তাদের নিজেদের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য নির্ধারণ করে দেবে, তাদের প্রত্যেকের অধিকার আদায়ের নিশ্চয়তা দেবে। আর তাদের জন্য বস্তুগত ও ভাবগত সৌভাগ্য সুনির্ধারিত করে দেবে। এ জন্য তার মধ্যে দুটি মৌলিক গুণ একান্তই আবশ্যকঃ

একটি এই যে, তাকে মানুষের সাধারণ স্বভাব ও প্রকৃতিগত বিশেষত্ব ও ভাবধারা সম্পর্কে জানতে হবে। তাকে ওয়াকিফহাল হতে হবে মানব প্রকৃতি নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম প্রবণতা সম্পর্কে, তাদের দৈহিক ও আত্মিক চাহিদা সম্পর্কে।

তার এ জ্ঞান হতে হবে রোগীর চিকিৎসকের ন্যায়। চিকিৎসক যেমন রোগের চিকিৎসা যথাযথভাবে করতে সক্ষম হতে পারে তখন যদি সে রোগ ও রোগী সংক্রান্ত যাবতীয় অবস্থার খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। অন্য কথায় মানুষের জন্য আইন-বিধান রচনাকারীকে মানবীয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। অধিকারী হতে হবে সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের। তবেই সেই অনুপাতে যথোপযুক্ত আইন রচনা তার পক্ষে সম্ভব হবে। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় সম্পর্কিত তত্ত্ব জ্ঞান থাকতে হবে তার নখদর্পণে।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তাকে হতে হবে প্রকৃতপক্ষেই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সকল প্রকার ব্যক্তিগত খাহেশ, ঝোঁক-প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আত্মস্বার্থের উর্ধ্বে থাকতে হবে তাকে। কেননা আত্মস্বার্থ চেতনা নিরপেক্ষ আইন-বিধান রচনার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তার সুবিচার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

কিন্তু মানুষ যতই ন্যায়বাদী ও সুবিচারক হোক-না-কেন, আত্মস্বার্থ চিন্তা ও নিজস্ব ঝোঁক প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। তাই কোন মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সুবিচারবাদী আইন রচনা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। উপরিউক্ত দুটি গুণের নিরংকুশ অধিকারী কোন মানুষ এ দুনিয়ায় পাওয়া যেতে পারে না। এ দুটি গুণের পূর্ণমাত্রার অধিকারী হতে পারেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। কেননা আল্লাহ্ই হচ্ছেন মানুষের স্রষ্টা।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ - (الملك : ١٤)

তোমরা কি জানো না কে সৃষ্টি করেছেন? .... তিনি তো সেই আল্লাহ্ যিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল।

বস্তুত আল্লাহ্ই হচ্ছেন এই বিশ্বলোকের প্রতিটি অণুপরমাণুর সৃষ্টিকর্তা। এর অংশসমূহ তিনিই সংমিশ্রিত সংযুক্ত করে এক-একটি বস্তুসত্তার অস্তিত্ব গড়ে তুলেছেন। ফলে তিনি তাঁর সৃষ্টি নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে একমাত্র ওয়াকিফহাল সত্তা। মানুষের জন্য প্রকৃত কল্যাণ কিসে, কিসে রয়েছে অকল্যাণ—ইহকাল-পরকালের সঠিক দৃষ্টিতে, তা তিনি ছাড়া আর কারোরই জানা থাকতে পারে না। অতএব মানুষের জন্য যথার্থ আইন-বিধান রচনা করাও কেবলমাত্র তাঁরই পক্ষে সম্ভব।

আর দ্বিতীয় শর্তও কেবল তাঁর নিকটই পাওয়া যেতে পারে। কেননা সর্ব প্রকারের আত্মস্বার্থ চিন্তা ও নিজস্ব ঝোঁক-প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষের ক্ষেত্রে তাঁর যেমন কোন স্বার্থচিন্তা থাকতে পারে না, নির্বিশেষে সকল মানুষই সমানভাবে একমাত্র তাঁরই সৃষ্টি বলে তিনি সকলেরই নির্বিশেষে একমাত্র স্রষ্টা ও মা'বুদ। অতএব কারোর অনধিকার চর্চা থেকে তাঁর কোন স্বার্থরক্ষার ব্যাপার নেই যেমন, তেমনি ক্ষমতা প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব নিয়েও মানুষের সাথে তাঁর নেই কোন কাড়াকাড়ি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফলে তিনি সকল মানুষের জন্য যে বিধান তৈরী করবেন, তা নিশ্চিতরূপেই হবে প্রকৃত ইনসাফ ও ন্যায়পরতার অনন্য মানদণ্ড। সমাজ-দার্শনিক রুশোও মানুষের জন্য কল্যাণকর আইন প্রণেতা এমনি এক নিরপেক্ষ বুদ্ধি-বিবেকের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এরূপ বুদ্ধি-বিবেচনা কোথায় পাওয়া যেতে পারে, তা তিনি নিশ্চিত ও চিহ্নিত করতে পারেন নি। ইসলামই এমন এক অনন্য দ্বীন, যার পক্ষে সেই প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষ বুদ্ধি-বিবেচনার ধারককে চিহ্নিত করতে সম্ভব হয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা।

ইসলামের দৃষ্টিতে মৌলিকভাবে আইন প্রণয়নের একমাত্র অধিকার যখন কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় আইন দাতাই সার্বভৌম এবং সার্বভৌমের নির্দেশ-ই আইন বলে ইসলামের মৌল আকীদার দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। এই সার্বভৌমত্বে আল্লাহর সাথে অপর কারোরই একবিন্দু অংশীদারিত্ব নেই, যেমন মা'বুদ হওয়ার অধিকারে আল্লাহ্র সাথে একবিন্দু শরীকদারী নেই অন্য কারোরই। কুরআন মজীদের আয়াতেই ঘোষণা করা হয়েছেঃ

إِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ (يوسف : ٤٠ / الانعام : ٥٧)

'আল-হুক্ম'—সার্বভৌমত্ব বা আদেশ-নিষেধ করার চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র। অর্থাৎ এই অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই নেই।

আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহৃত সার্বভৌমত্ব বা Sovereignty শব্দটি লাটিন ভাষার Superanus অর্থাৎ Supreme থেকে গৃহীত। এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় absolute authority 'নিরংকুশ কর্তৃত্ব' অর্থে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Bodin সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত ধারণাকে স্পষ্ট ও উন্নীত করেছেন। তাঁর মতে 'সার্বভৌমত্ব বলতে বোঝায়ঃ a perpetual, humanly unlimited and unconditional right to make, interpret and execute law. আইন প্রণয়ন, ব্যাখ্যাদান এবং কার্যকরণের চিরস্থায়ী মানবীয় অসীমাবদ্ধ এবং নিঃশর্ত অধিকার। তাঁর মতে প্রত্যেক সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রের জন্য এরূপ একটি শক্তির অস্তিত্ব একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। Grotius-এর মতে সার্বভৌমত্ব হচ্ছে Supreme political power in him whose acts are not subject to any other and whose will cannot be overridden. 'এমন এক সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা যে তার মধ্যে তার কার্যকলাপ অপর কারোর নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং যার ইচ্ছা কেউই বাতিল বা ব্যর্থ করে দিতে পারে না। Burgess এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাষায়ঃ 'Original, absolute, unlimited power' over the individual subject and over all associations of subject. মৌলিক, নিরংকুশ, সীমাহীন ক্ষমতা স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণের উপর এবং প্রজাসাধারণের সকল সামষ্টিক সংস্থার উপর। Bryce, Laski ও অন্যান্যদের রচনা থেকে জানা যায়, সার্বভৌমত্বের পরিচিতি হচ্ছেঃ Permanance, all comprehensiveness, indivisibility, exclusiveness and absoluteness. চিরস্থায়িত্ব শাশ্বত, সর্বাত্মকতা-সর্বব্যপকতা, অবিভাজ্যতা, অনন্যতা-একচেটিয়াত্ব এবং নিরংকুশতা। Austin-এর সংজ্ঞা হচ্ছেঃ If a determinate human superior, not in a habit of obedience to a lik superior, receive habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior sovereign in that society, and the society (including the superior) is a society, political and independent. (Philosophy of Islamic Law and the orientalists. P-56)

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রদত্ত সার্বভৌমত্বের এই সংজ্ঞানুযায়ী–যার অধিকারী হতে পারেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা।

কুরআন মজীদের বহু আয়াতে আল্লাহ্‌র পরিচিতি স্বরূপ বলা হয়েছেঃ اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ সর্ববিজয়ী, সর্বোচ্চ হুকুমদাতা। اَلْعَزِيْزُ শব্দটি اَلْعِزُّ থেকে নির্গত। তার অর্থঃ

اَلْعِزُّ فِى الْاَهْلِ الْقُوَّةُ وَالشِّدَّةُ وَالْغَلَبَةُ وَالرِّفْعَةُ وَلْاِمْتِنَاعَ –

মূলত العز শব্দের অর্থ মহাশক্তিধর হওয়া, শক্ত দুর্জয় হওয়া, সর্বজয়ী হওয়া, সর্বোচ্চ হওয়া, বিরোধীকে প্রতিরোধকারী হওয়া।

আর العزيز। অর্থঃ 'নিজে সর্বজয়ী, অন্যদের নিকট দুর্জয়, মহাপরাক্রান্ত, মহাসম্মানার্হ। زجاج লিখেছেনঃ عزيز বলতে এমন প্রবল পরাক্রান্ত সত্তা বোঝায়, যার উপর কেউ বিজয়ী হতে পারে না। এরূপ এক সত্তা সারা জাহানে আঁতিপাতি করে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তা হতে পারেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা।

তাই ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ-ই সার্বভৌম নয়, আল্লাহ্র আদেশ ছাড়া কোথাও আইন নেই। কেননা সার্বভৌমের নির্দেশ (command of the sovereign)-ই যে আইন, তা প্রায় সর্বসম্মত।

বস্তুত কুরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলাকেই সার্বভৌমরূপে পেশ করেছে। এ পর্যায়ের কতিপয় আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ - (البروج : ١٦)

যা তিনি চান তা-ই তিনি করেন, করতে পারেন।

لَايُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ - (الانبياء : ٢٣)

আল্লাহ্ যা করেন সে বিষয়ে তিনি কারোর নিকট জিজ্ঞাসিত (জবাবদিহি করতে বাধ্য) হন না, জনগণই জিজ্ঞাসিত হয়।

তিনিই চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব সত্তা– اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ - (القصص : ٨٨)

প্রত্যেকটি জিনিসই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে কেবলমাত্র তাঁর (আল্লাহ্র) সত্তা ছাড়া। সার্বভৌমত্ব তাঁরই জন্য (চূড়ান্ত নির্দেশ তিনিই দিতে পারেন) এবং তাঁরই নিকট তোমরা সকলে প্রত্যাবর্তিত হবে।

আল্লাহ্র এ গুণ-পরিচিতি অবিভাজ্য, যেমন অবিভাজ্য আধুনিক ব্যাখ্যার সার্বভৌমত্ব। আল্লাহ্র এ গুণ মৌলিক, একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব, অন্য কারোর নিকট থেকে পাওয়া, ধার করা বা প্রদত্ত নয়। আল্লাহ্র এ ক্ষমতা সীমাহীন, তা সীমিত করতে পারে এমন কেউ কোথাও নেই।

কুরআনের দৃষ্টিতে এ-ই হচ্ছে সার্বভৌমত্বের তওহীদ বা তওহীদী সার্বভৌমত্ব। এ সার্বভৌমত্ব অন্য কারোর আছে বলে বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়াই হচ্ছে সার্বভৌমত্বে শির্ক এবং এ সার্বভৌমের আদেশ বিধানই হচ্ছে আইন।

أَلَا لَهُ الْحُكْمُ - (الانعام : ٢٦)

জেনে রাখো তাঁরই জন্য একান্তভাবে সংরক্ষিত রয়েছে হুকুম দেয়ার অধিকার।

এ অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আছে বলে বিশ্বাস করা বা মেনে নেয়াই হচ্ছে আইনের ক্ষেত্রে শির্ক। তাই কুরআনে আল্লাহ্র এই নির্দেশ ঘোষিত হয়েছেঃ

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ - المائدة : ٤٨)

অতএব আইন কার্যকর কর লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী। আর তোমার নিকট যে মহাসত্য এসেছে তা থেকে বিমুখ হয়ে থাকা লোকদের ইচ্ছা-খাহেশকে কখনই মেনে নেবে না (মেনে চলবে না, অনুসরণ করবে না)।

আল্লাহ্ তা'আলাই সার্বভৌম। তাঁর আদেশ-বিধানই একমাত্র আইন। সেই আইন-ই তিনি নাযিল করেছেন তাঁর নাযিল করা কিতাবের মাধ্যমে, যার কথা উক্ত আয়াতের শুরুতেই বলেছেনঃ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ - (المائدة : ٤٨)

এবং তোমার প্রতি—হে নবী কিতাব নাযিল করেছি পরম সত্যতা সহকারে, যা তার সম্মুখে বর্তমান কিতাবসমূহের সত্যতা ঘোষণাকারী এবং তার সংরক্ষক।

রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا - (النساء : ١٠٥)

নিঃসন্দেহে আমরা তোমার নিকট কিতাব নাযিল করেছি পরম সত্যতা সহকারে, যেন তুমি আল্লাহ্র দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে লোকদের উপর হুকুম

চালনা করতে পার এবং তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষ সমর্থনকারী কখনই হবে না।

সার্বভৌম প্রদত্ত আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে এই হচ্ছে তওহীদী বিধান।

আইন প্রণয়নে ইজতিহাদ

এই পর্যায়ে একটি প্রশ্ন উঠে। তা হচ্ছে আইন যদি কেবলমাত্র আল্লাহ্র আদেশ-বিধানই হয়ে থাকে এবং সে ক্ষেত্রে অন্য কারোর কিছুই করবার না থাকে, তাহলে ইসলামে ইজতিহাদের অবকাশ কোথায় থাকতে পারে এবং মুজতাহিদদের কি-ই বা করণীয় থাকতে পারে? উপরন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদের কোন কাজ আছে কি?

এর জবাবে বলা যায়, মুজতাহিদ ও ফিক্হবিদগণ মৌলিকভাব কোন আইন প্রণয়ন করেন না, তাঁরা একে তো আল্লাহ্র আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন, তার ভিত্তিতে কিয়াস করে তারই অনুরূপ নতুন ব্যাপারে আইন প্রস্তুত করেন, আর দ্বিতীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে সেই আইন প্রয়োগ করেন মাত্র।

কুরআনের আয়াতসমূহ গভীরভাবে বিবেচনা করলে জানা যায়, তওহীদী ব্যবস্থায় আইন রচনার নিরংকুশ অধিকার ও কর্তৃত্ব এক আল্লাহ্রই জন্য, তেমনি সাধারণ জনগণের মধ্যে কারোরই অধিকার নেই অন্য কোন ব্যক্তি বা জনসমষ্টির উপর স্বীয় রায় বা অভিমত চাপিয়ে দেয়ার, তা নির্বিচারে মেনে নেয়ার জন্য আহ্বান জানানোর নির্দেশ দেয়ার।

কেননা তওহীদী আইন ব্যবস্থায় সকল মানুষ সর্বতোভাবে সমান। কারোরই একবিন্দু প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার নেই অপর কারোর উপর। সকল মানুষ আইনের ব্যাখ্যাদানের অধিকারে যেমন অভিন্ন-যোগ্যতার শর্ত সহকারে, তেমনি আইনের সম্মুখেও সকল মানুষই সমান, সকলেই সমানভাবে আল্লাহ্র আইন মেনে চলতে বাধ্য। কেউ বলতে পারে না, দাবি করতে পারে না যে, সে নিজে বা অপর কেউ আল্লাহ্র আইন পালনে বাধ্যবাধকতার বন্ধন থেকে কিছুমাত্র মুক্ত। অথচ দুনিয়ার মানব রচিত তাগুতী ব্যবস্থাপনায় তা সাধারণ এবং ব্যাপকভাবেই চলছে। তাগুতী ব্যবস্থায় শাসক-প্রশাসক, রাজা-বাদশাহ ও তাদের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণকারী পারিষদবর্গ নিজদিগকে অনেক ধরনের আইন-বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে রেখে থাকে। অনেক প্রকারের ট্যাক্স দেয়ার বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে চলে। আর সর্বপ্রকারের বাধ্যবাধকতার চাপ পড়ে দুর্বল অক্ষম অসহায় লোকদের উপর।

কিন্তু ইসলামের তওহীদী আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থায় তার একবিন্দু অবকাশ নেই। এই দুই ধরনের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য পর্যায়ে প্রথম

উল্লেখ্য সার্বভৌমত্ব–ইসলামী সমাজের সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র সারেজাহানের সৃষ্টিকর্তার, আর তাগুতী সমাজে সার্বভৌমত্ব মানবীয়, তাও আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভক্ত, যথা প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্ব, প্রয়োগিক সার্বভৌমত্ব ও আইনগত সার্বভৌমত্ব। কিন্তু ইসলামে তা যেমন অবিভক্ত, অবিভাজ্য, তেমনি নির্বিশেষে কার্যকর। এখানে ব্যক্তির যেমন কোন বিশেষত্ব নেই, তেমনি নেই কোন শ্রেণীর। এখানে সকল কাজ পূর্ণ সুবিচার ও সাম্যের মানদণ্ডে সুসম্পন্ন হয়।

এখানে আমরা এমন কতিপয় আয়াত উদ্ধৃত করছি, যা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, আইন প্রণয়নের মৌলিক অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র। এ কাজে কেউ-ই আল্লাহ্‌কে বাঁধা দিতে পারে না, সে যেই হোক না কেন। আয়াত সমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে পেশ করা যাচ্ছে।

প্রথম ভাগের আয়াত

নিম্নোক্ত আয়াত দুটি প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোরই আইন প্রণয়নের অধিকার নেই। কেননা এ অধিকার কেবলমাত্র তারই হতে পারে, যার পূর্ণ কর্তৃত্ব চলে মানুষের জীবনের উপর। আর মানব জীবনের পূর্ণ কর্তৃত্বকারী সত্তা একমাত্র আল্লাহ্ই। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ –

তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আর যার যার ইবাদত কর, ওরা কতগুলি নাম মাত্র। এই নামগুলিও তোমরা আর তোমাদের পূর্ব পুরুষরাই রেখে নিয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সমর্থনে কোন অকাট্য দলীল নাযিল করেন নি। হুকুম দেয়ার অধিকার কারোরই নেই, আছে কেবল আল্লাহ্‌র। তিনিই ফরমান দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারোরই ইবাদত করবে না। এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় জীবন-বিধান; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

অপর আয়াতটি হচ্ছেঃ

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ

وَمَـــا اَغْنِىَ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ عَلَيْـــهِ تَوَ كَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَ كَّلِ الْمُتَوَ كِّلُوْنَ - (يوسف : ٦٧)

এবং বলল, হে প্রিয় পুত্ররা, তোমরা একটি মাত্র দ্বারপথে প্রবেশ করবে না বরং বিভিন্ন দ্বারপথে প্রবেশ করবে। কোন জিনিসই তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে অ-মুখাপেক্ষী বানাতে পারে না। চূড়ান্ত ফয়সালা তো আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ-ই করতে পারে না। আমি তাঁরই উপর নির্ভরতা গ্রহণ করছি, আর নির্ভরতা গ্রহণকারী সব লোকেরই কর্তব্য কেবল তাঁরই উপর নির্ভরতা গ্রহণ করা।

উদ্ধৃত দুটি আয়াতেই 'হুকুম দেয়ার অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর নেই' বলা হয়েছে। কথা দুটি একই রকমের। কিন্তু পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত আয়াতে একমাত্র আল্লাহ্র যে সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ অধিকারের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে আইন প্রণয়নের সার্বভৌমত্ব (Legislative Sovereignty). আর দ্বিতীয় উক্ত আয়াতে যে সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্ব (Natural Sovereignty)।

দুটি আয়াতের বিষয়বস্তুই তার প্রমাণ। প্রথম আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম করার অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই নেই। এ কারণে 'আল্লাহ্ ছাড়া হুকুম দেয়ার অধিকার আর করোর নেই' বলার পর-পরই বলা হয়েছে 'তিনিই ফরমান জারী করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারোর ইবাদত করবে না।' এই শেষোক্ত কথাটুকু যেন এক উহ্য প্রশ্নের জবাবস্বরূপ বলা হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে—হুকুম দেয়ার, আইন প্রণয়নের অধিকার যদি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর না-ই থাকে, তাহলে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্দেশ কি? সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কথা বলে প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেয়া হল।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, হযরত ইয়াকুব (আ) তাঁর পুত্রদের ব্যাপারে কোন ক্ষমতার অধিকারী নন। তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের করণীয় কিছু নেই। কেননা যাবতীয় প্রাকৃতিক ব্যাপার—সৃষ্টি ও ধ্বংস একমাত্র আল্লাহ্র কর্তৃত্বাধীন। অতএব তাঁরই উপর নির্ভরতা গ্রহণ করা ছাড়া কোনই উপায় নেই, যদিও কাঙ্ক্ষিত বৈষয়িক সাফল্য লাভের উপায় জানা রয়েছে। এই কারণেই বৈষয়িকভাবে আত্মরক্ষার উপায়স্বরূপ একটি দ্বারপথে প্রবেশ না করে বিভিন্ন দ্বারপথে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এগুলি আল্লাহ্র মুকাবিলায় কোন কাজে আসবে না। কেননা এক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফয়সালা তো একমাত্র আল্লাহ্-ই গ্রহণ করেন। এ আয়াতে

الحكم। এর অর্থ যে প্রাকৃতিক জগতকেন্দ্রিক নৈসর্গিক কর্তৃত্ব, তার বড় ও স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা গ্রহণের কথা বলা এবং তাঁরই উপর সকলকে নির্ভরতা গ্রহণের উপদেশ দেয়া।

মোটকথা, প্রথম আয়াতটি আইন প্রণয়নের নিরংকুশ ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্‌রই রয়েছে বলে ঘোষণা করেছে, তা নিঃসন্দেহে। এ পর্যায়ের অপর একটি আয়াত হচ্ছেঃ

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ - (الاعراف : ٥٤)

নিঃসন্দেহে তোমাদের রব্ব হচ্ছেন সেই আল্লাহ্, যিনি আসমান ও যমীন মাত্র ছঁটি কাল-অধ্যায়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর শক্তির মূল কেন্দ্রের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন। রাত-দিনকে আচ্ছন্ন করে, তার সন্ধানে দ্রুত চলে আসে। আর সূর্য চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ তাঁরই কর্তৃত্বের অধীন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কর্মরত। জেনে রাখো, সৃষ্টি তাঁরই, তাঁর উপর আইন বিধান চালানোর অধিকারও একমাত্র তাঁরই। সারে জাহানের রব্ব আল্লাহ্ অতীব মহান বরকতওয়ালা

তাফসীরকারগণ একমত হয়ে বলেছেন, এ আয়াতে الامر। বলে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্ব 'কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট' এই কথাই বলা হয়েছে। আয়াতে الخلق। ও الامر। দুইটি আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা দুটির তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন। الخلق। বলতে 'নব উদ্ভাবন' 'নব অস্তিত্বদান' বোঝায়। আর الامر। বলতে এই নব উদ্ভাবিত ও নতুন অস্তিত্বপ্রাপ্ত জিনিসের উপর আইন ও নিয়ম চালু করার নিরংকুশ কর্তৃত্ব বোঝায়। বস্তুত সৃষ্টিকে কোন কিছু করার আদেশ দানের এবং কোন কিছু করা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে নিষেধবাণী উচ্চারণের অধিকার তো তাঁরই থাকতে পারে, যিনি সৃষ্টি করলেন। ফলে এ আয়াত একদিকে যেমন আইন প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে, তেমনি সার্বভৌমত্বকেও নির্দিষ্ট করে একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য।

দ্বিতীয় ভাগের আয়াত

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا
بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ
لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ
هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ
اللّٰهِ شَيْـًٔا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ
وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ – سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ فَاِنْ
جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ
شَيْـًٔا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ –
وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ
ذٰلِكَ وَمَا اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ – اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ
بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا
اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ
وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ – وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الظّٰلِمُوْنَ – وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرٰةِ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

التَّوْرٰةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ - وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ - وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ط وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ - وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ - اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ - (المائدة : ٤١-٥٠)

হে রাসূল! আপনাকে যেন চিন্তা-দুঃখ ভারাক্রান্ত না করে সে সব লোক যারা কুফরির কাজে তীব্র গতিতে এগিয়ে চলে যাচ্ছে; যারা মুখে বলে, আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু তাদের দিল ঈমানদার হয়নি। ওরা ইয়াহুদী হয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যে থেকেও মিথ্যা কথা খুব কান লাগিয়ে শুনে, মনোযোগ দিয়ে শুনে অন্যান্য লোকদের স্বার্থে, যারা তোমার নিকট আসেনি। ওরা কথাগুলিকে তার যথার্থ স্থান নির্ধারিত হওয়ার পর স্থানান্তরিত করে। তারা বলে, যদি তোমাদেরে এটা দেয়া হয়, তাহলে তা তোমরা গ্রহণ করবে, আর তা দেয়া না হলে তা থেকে সরে দাঁড়াবে। আর আল্লাহ্ যাকে বিপদে ফেলতে চান, তুমি তাকে আল্লাহ্ থেকে বাঁচাবার কোন পথ পাবে না। ওরা এমন লোক যে, ওদের দিলকে পবিত্র করতে আল্লাহ্ চান নি। ওদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং ওদের জন্য পরকালে রয়েছে বড় ধরনের আযাব। ওরা মিথ্যা কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে, বড় হারামখোর। ওরা যদি তোমার নিকট আসে, তাহলে তাদের পরস্পরে ফয়সালা করে দাও, অথবা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাক। তুমি যদি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাক, তাহলে ওরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার কর-ই, তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফ সহকারে হুকুম

কার্যকর করবে। নিশ্চয়ই জানবে, আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। ওরা কি করে তোমাকে বিচারক মানতে পারে; ওদের নিকট তো তওরাত রয়েছে। তাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র আইন। অবশ্য পরে তারা তা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলেছে। ওরা আসলে তো মু'মিন নয়। আমরা নিঃসন্দেহে তওরাত নাযিল করেছি, তাতে রয়েছে হিদায়ত ও আলো। তার ভিত্তিতে ইসলাম অনুসরণকারী নবীগণ ইয়াহুদী হয়ে যাওয়া লোকদের জন্য আইন জারী করে, রাব্বানী ও পণ্ডিত-পুরোহিতরাও সেই বিধান সহকারে যা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে সংরক্ষিত হয়েছে, (এরই ভিত্তিতে ফয়সালা করত, কেননা তাদেরকেই আল্লাহ্‌র কিতাবের হিফাজতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল) এবং এ ব্যাপারে তারা সাক্ষী ছিল। অতএব তোমরা লোকদের ভয় করো না, ভয় কর কেবল আমাকে এবং তোমরা আমার আয়াত স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করো না। আর যে লোক আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। তাদের জন্য আমরা তাতে বিধান করে দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চক্ষুর বদলে চক্ষু, দাঁতের বদলে দাঁত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সমান প্রতিবিধান। তবে যদি কেউ ক্ষমা করে দেয়, তবে তা তার জন্য কাফফারা হবে। আর যে লোকই আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা নিশ্চয়ই জালিম। এবং তাদের পেছনে নিয়ে এলাম ঈসা ইবনে মরিয়মকে, তার সম্মুখে অবস্থিত তওরাতের সত্যতা ঘোষণাকারীরূপে এবং তাকে দিলাম ইনজীল, তাতে ছিল হিদায়ত ও আলো এবং তা তওরাতের অবশিষ্টের সত্যতা ঘোষণাকারী। সেই সাথে হিদায়ত এবং মহামূল্য উপদেশ মুত্তাকী লোকদের জন্য। অতএব ইন্‌জলী বিশ্বাসী লোকদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী আইন কার্যকর করা। আর যে লোক আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে ফয়সালা করে না, তারাই সীমালংঘনকারী। আর হে নবী! তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে কিতাব নাযিল করেছি, তা সম্মুখবর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা ঘোষণাকারী, তার সংরক্ষকও। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান মুতাবিক আইন কার্যকর কর। আর তাদের ইচ্ছা-খাহেশকে অনুসরণ করতে গিয়ে তোমার নিকট আসা পরম সত্য থেকে বিমুখ হয়ে থাকবে না। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্যই বিধান ও কর্মপদ্ধতি বানিয়ে দিয়েছি। অবশ্য আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে এক অভিন্ন উম্মাত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের যে বিধান দিয়েছেন তা দিয়ে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার ইচ্ছা করেছেন। অতএব তোমরা সকলকে কল্যাণময়তার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও। তোমাদের

সকলকে আল্লাহ্‌র নিকটই প্রত্যাবর্তিত হতে হবে, তখন তিনি তোমাদের পারস্পরিক বিরোধীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করবেন। আর আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান মুতাবিক তাদের মধ্যে আইন কার্যকর কর, তাদের ইচ্ছা-খাহেশকে অনুসরণ করো না, ওদের প্রতি তুমি সতর্কতা অবলম্বন করবে, ওরা তোমাকে আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধানের কোন কোনটি থেকে বিরত থাকার বিপদে ফেলতে পারে। ওরা যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেও, তবু তুমি জানবে, আল্লাহ্ চান, তিনি ওদের কোন কোন গুনাহের শাস্তিস্বরূপ ওদেরকে বিপদে ফেলবেন। আর বেশীর ভাগ লোকই হচ্ছে সীমা অতিক্রমকারী। ওরা কি জাহিলিয়াতের বিধান পেতে চায়? অথচ দৃঢ় প্রত্যয়শীল লোকদের জন্য হুকুমদাতা হিসেবে আল্লাহ্‌র চাইতে উত্তম আর কে হতে পারে?

এ আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর বিবেচনা চালালেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু প্রথম মানুষ থেকেই নবী-রাসূল পাঠাতে শুরু করেছেন, সেই কারণে তিনি যেন মানুষকে তার নিজের জন্য অথবা অন্যদের জন্য আইন-বিধান রচনার মৌলিক অধিকার দেন নি। কেননা মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, অযথার্থ ও অ-সত্যে ভরপুর। মানুষের পক্ষে এ কাজ কার্যতও সম্ভব নয়। মানুষ মানুষের জন্য যদি আইন বিধান রচনা করে, তাহলে হয় সে আল্লাহ্‌র সাথে কুফরির আচরণ করবে, জুলুম করবে, সীমালংঘন করে ফেলবে। এই কারণে যথার্থ ইনসাফ কায়েমের লক্ষ্যে উপযুক্ত আইন বিধান আল্লাহ্ নিজেই মানুষকে দান করেছেন। এ জন্য তিনি কিতাব ও নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। মানুষের জন্য মৌলিকভাবে আইন রচনার আর কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকলো না। মানুষই যদি মানুষের জন্য মৌলিকভাবে আইন রচনা করে তাহলে সে আইন রচয়িতা 'আল্লাহ্' হয়ে বসবে। আবার সে আইন যারা মানবে তারা হবে সেই আইন রচয়িতাদের বান্দা। অথচ মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই বান্দা হতে পারে—মানুষের বান্দা নয়।

আয়াতে উদ্ধৃত 'ওরা কথাগুলিকে তার যথার্থ স্থান নির্ধারিত হওয়ার পর স্থানান্তরিত করে' বাক্যটি ইঙ্গিত করছে ওরা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ও ঘোষিত বিধানকে রদ-বদল করে দেয়ার, তার বিরুদ্ধতা করার হীন কারসাজিতে লিপ্ত হয়েছে, তার বাধ্যবাধকতা থেকে নিজেদের মুক্ত করার ষড়যন্ত্র করেছে।

'বড় হারাম খোর' বলে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ ওদের জন্য যা হালাল করেছেন, ওরা তা হারাম করেছে এবং যা হারাম করেছেন, ওরা তাকে হালাল বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র আইন বাদ দিলে মানুষ তাই করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এছাড়া 'ওদের নিকট তওরাত রয়েছে, তাতে আছে আল্লাহ্‌র আইন' আমরা তওরাত নাযিল করেছি, তাতে রয়েছে হিদায়ত ও আলো. যার দ্বারা নবীগণ হুকুম চালায়'—'যারাই আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না ওরা কাফির'—'ওদের জন্য লিখে দিয়েছি যে, জানের বদলে জান...'—'যারাই আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, ওরাই জালিম'— 'ইন্‌জীল বিশ্বাসীদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার- ফয়সালা-শাসন চালানো'—'যারাই আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা-শাসনকার্য সম্পন্ন করে না তারাই ফাসিক, সীমালংঘনকারী' —প্রভৃতি বাক্যাংশ স্পষ্ট করে দেয় যে, মৌলিকভাবে আইন-রচনাকার্য কেবল মুসলিমদের উপরই নিষিদ্ধ নয়, পূর্বে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিল হওয়া সব কিতাব ও দ্বীনই তা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। আল্লাহ্‌র এককভাবে সৃষ্ট জগতে বসবাসরত আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষের উপর আল্লাহ্‌র বিধান চলবে না, চালানো হবে এক শ্রেণীর মানুষের রচিত আইন-বিধান তা আল্লাহ তা'আলা কি করে বরদাশত করতে পারেন, তার অনুমতিই বা তিনি দিতে পারেন কিভাবে?... তাই ইসলামের ঘোষণা হচ্ছে সর্বপ্রকারের মৌল আইন রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট চিরন্তনভাবে, এটা তাঁরই জন্য শোভন, তাঁরই কাজ। তাঁর দেয়া আইনই হতে পারে সকল মানুষের জন্য সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ—সুবিচারক। আল্লাহ্ এই অধিকার নিজের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন, তিনি অন্য কারোর উপর সে অধিকার অর্পণ করেন নি। অতএব তাঁর দেয়া আইন-বিধান বাদ দিয়ে মানুষের উপর যারাই হুকুম চালাবে তারা একই সাথে কাফির, জলিম ও ফাসিক পরিচিতিতে অভিহিত। কেননা তারা আল্লাহ্‌র আইনকে অমান্য করছে, আল্লাহ্‌র দেয়া আইনের উপর— সেই সাথে নিজেদের ও অন্যান্য যেসব মানুষের উপর হুকুম চালায় তাদের উপর নির্মমভাবে জুলুম করছে। কেননা তাদের নিজেদের উপর নিজেদের হক, অন্য মানুষেরও হক হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান পালন করার। তাছাড়া সুবিচার তো কেবল আল্লাহ্‌র বিধানের ভিত্তিতেই হওয়া সম্ভব, মানব রচিত আইন-বিধান কখনই নিরপেক্ষ নির্বিশেষ সুবিচার করতে পারে না। ফলে তারা হয় জালিম। আর তা করে তারা আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়ার সীমালংঘন করে প্রভু-মনিবের স্থান দখল করে বসে। অথচ তারা আল্লাহ্‌র বান্দা ছাড়া আর কিছুই নয়, যেমন অন্যান্য কোটি কোটি বান্দা রয়েছে তাঁর। ফলে তারা হয় সীমালংঘনকারী—ফাসিক।

উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহে নেতিবাচকভাবে আল্লাহ্‌র বিধান অস্বীকার করে হুকুম-শাসন চালাবার পরিণতি বলার সাথে সাথে ইতিবাচকভাবে স্পষ্ট-অকাট্য

নির্দেশও দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করার—আইন ও শাসন চালানোর। সে ইতিবাচক নির্দেশ হচ্ছেঃ

ক. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ 'অতএব লোকদের মধ্যে হুকুম কার্যকর—শাসন কর আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী'।

খ. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا 'এবং তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্যই আমরা আইন-বিধান ও কার্যপদ্ধতি সুনির্ধারিত করে দিয়েছি।'

এই আইন-বিধান ও কার্যপদ্ধতিই হচ্ছে মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এই জীবন-বিধান প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। দিয়েছেন তাদের প্রয়োজন অনুরূপ, তাদের বিশেষ অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে, তার উপযোগী করে। আর আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান যেহেতু কোনক্রমেই অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ হতে পারে না মানব রচিত বিধান অপেক্ষা, তাই আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ বিধান যথাযথভাবে বর্তমান থাকা অবস্থায় মানুষের আইন রচনার এবং তা সাধারণ জনগণের উপর জারী করার কোন অধিকারই কারোর থাকতে পারে না।

উক্ত কথার পর-পরই কুরআন দৃঢ়তা সহকারে বলেছে যে, আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধানের—তা যা-ই হোক না কেন—অনুসরণ মানুষের মনের ভিত্তিহীন খেয়াল-খুশী ও ইচ্ছা-খাহেশের অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বলা হয়েছেঃ

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ

এবং লোকদের মধ্যে শাসন চালাও আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী এবং লোকদের ইচ্ছা-বাসনা-কামনার অনুসরণ করো না।

আর শেষ পর্যায়ে ওহী সূত্র থেকে লব্ধ নয়—এমন যাবতীয় আইন-বিধানই সম্পূর্ণ জাহিলিয়াতের বিধান বলে কুরআন ঘোষণা করেছেঃ

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ

ওরা কি জাহিলিয়াতের আইন-বিধান পেতে চায়?

জাহিলিয়াতের আইন পেতে চাওয়ার অর্থ আল্লাহ্‌র দেয়া আইন-বিধান বিমুখতা, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত এই মানুষ আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি আগ্রহী না হয়ে তার বিপরীত কল্পিত ভিত্তিহীন ও মানবীয় খাহেশ-খেয়াল মত রচিত আইন-বিধানের প্রতি আগ্রহ-কৌতুহলও আল্লাহ্‌র বিন্দুমাত্র পছন্দ নয়।

যদি কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান পাওয়া না যায়, তাহলে শুধু সেই ক্ষেত্রেও কি মানুষের রচিত বিধান পালন করা যাবে না, এ রকমের একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু প্রধানত কুরআন মজীদ নিজেকে সর্ববিষয়ের সর্বক্ষেত্রের বিধান হিসেবে উপস্থাপিত করেছে বলে কোন একটি ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র মৌলিক বিধান না থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না, দ্বিতীয়ত এমন কোন বিষয় যদি সম্মুখে আসেই, যে-সম্পর্কে কুরআন থেকে কোন সরাসরি স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়াই গেল না, সে ক্ষেত্রে কুরআনেরই মৌলিক বিধানের ভিত্তিতে সমুপস্থিত ব্যাপারে আল্লাহ্‌র মর্জি জানতে চেষ্টা করতে হবে। কুরআন প্রথমত ঘোষণা করেছেঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (النحل: ٨٩)

এবং হে নবী! তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা সর্ব বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘোষণা করেছেনঃ

فَاعْتَبِرُوْا يٰاُولِى الْاَبْصَارِ (الحشر: ٢)

হে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা, তোমরা নীতিভিত্তিক কিয়াস কর।

অর্থাৎ যেখানে স্পষ্টভাবে কোন আইন পাওয়া যাবে না, সেখানে কুরআনের মৌলনীতির ভিত্তিতে ও তারই আলোকে নতুন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।[১]

বস্তুত কুরআনে প্রদত্ত বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার কাজ প্রথমে আল্লাহ্ নিজেই করেছেন। বলেছেনঃ

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ * ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ * (القيامة: ١٨-١٩)

আমরা যখন কুরআন পাঠ করে দেই, তখন হে নবী! তুমি তা অনুসরণ করতে শুরু কর। পরে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরই উপর থাকল।

এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা জনগণের নিকট কুরআন বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর উপর অর্পণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি

---

১. اعتبروا অর্থ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। কোন অবস্থা থেকে এমনভাবে উপদেশ গ্রহণ কর যে, সম্মুখবর্তী জিনিস থেকে সম্মুখে অনুপস্থিত জিনিস পর্যন্ত পৌঁছা—তা অর্জন করা। ফিক্‌হী পরিভাষায় এই কাজকেই বলা হয় قياس Analogy এই কারণে আয়াতের বাহ্যিক হুকুম অনুযায়ী নব উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিধান নির্ধারণ করা কর্তব্য বলে সকল আলেম একমত হয়েছেন। لغات القران ج ص ١٦٢

আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জেনে নেবেন, আর তিনি সেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জনগণের সম্মুখে পেশ করবেন। বলেছেনঃ

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ- (النحل: ٤٤)

আমরা—হে নবী! তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদের জন্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কর, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং সেই সাথে এ-ও আশা করা যায় যে, লোকেরা নিজেরাও চিন্তা-ভাবনা করবে।

আর সর্বোপরি একথাও আমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কুরআন মূলতই কোন দুর্বোধ্য গ্রন্থ নয়। বরং তা অতীব সহজবোধ্য; তা থেকে বোধ গ্রহণ, জ্ঞান আহরণ ও বাস্তবে পালনই হচ্ছে মানুষের কাজ। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (القمر: ١٧)

এবং নিঃসন্দেহে কুরআনকে বুঝবার ও পালন করবার জন্য খুবই সহজ বানিয়ে দিয়েছি। এখন তা গ্রহণ ও পালন করার কেউ আছে কি?

রাসূলে করীম (স) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কুরআন গ্রহণ করে দুটি দায়িত্ব পালন করেছেন। একটি হচ্ছে তা যথাযথভাবে জনগণকে পড়ে শুনিয়ে দেয়া ও সেই সাথে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, সেই অনুযায়ী কাজ করে কুরআনী আইনের বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি জনগণকে শিক্ষা দেয়া। ফলে কুরআনে অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা বলতে কিছুই নেই। হয় কুরআন নিজেই নিজের ব্যাখ্যা দেয়, না হয় রাসূলে করীম (স)-এর নিকট থেকে তার প্রকৃত ও নির্ভুল ব্যাখ্যা লাভ করা যায়। এ পর্যায়ে ও অন্যান্য সকল বিষয়ে রাসূলে করীম (স) যা কিছুই বলেছেন, তা সবই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ওহী সূত্রে প্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজেই তার সাক্ষ্য দিয়েছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى* اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى* (النجم : ٣-٤)

নবী নিজের ইচ্ছামত কিছুই বলে না। যা-ই বলে তা তার নিকট ওহীর মাধ্যমে আসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতএব নবী করীম (স) যা-ই বলেছেন, তা অবশ্যই গ্রহণীয়ঃ

مَآ اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (الحشر: ٧)

রাসূল তোমাদের যাই আদেশ করে, তা পালন কর, আর যা করতে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক।

তৃতীয় ভাগের আয়াত

এ পর্যায়ে উদ্ধৃত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, নবী-রাসূলগণ সাধারণভাবে এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) বিশেষভাবে মানুষের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ্‌র সর্বশেষ কিতাব কুরআন সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছেঃ

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا* (الاسراء: ٩)

নিঃসন্দেহে এই কুরআন সেই জীবন পথের সন্ধান দেয়, যা অত্যন্ত ঋজু দৃঢ় ও ভারসাম্যপূর্ণ এবং তা নেক আমলকারী মু'মিনদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য বিরাট শুভ কর্মফল নির্দিষ্ট রয়েছে।

এখানে যে জীবন-পথের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে আল-ইসলাম। অপর আয়াতে তাকেই বলা হয়েছে 'শরীয়াত'। আয়াতটি এইঃ

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا (الجاثية: ١٨)

অতঃপর আমরা তোমাকে জীবন-ব্যাপারে একটা সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি। অতএব তুমি তা অনুসরণ করে চল।

পূর্ববর্তী আয়াতের اقوم শব্দটি কুরআনী আইন-বিধানের সত্যতা ও দৃঢ়তা বোঝায় এবং তা যেমন স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল, তেমনি তা মানুষকে দান করে পরম সৌভাগ্য ও সম্মানার্হ জীবন; তাকে পরিচালিত করে মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণত্বের দিকে। মানব রচিত আইন বিধান সম্পর্কে এই কথা প্রযোজ্য নয়। তা বাহ্যত কোন কোন খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কল্যাণকর মনে হলেও পরিণতির দিক দিয়ে তা যেমন ভারসাম্যহীন তেমনি মানব জীবনে চরম বিপর্যয় সৃষ্টিকারীও প্রমাণিত হতে বাধ্য।

উপরোদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের সমর্থন করছে এ আয়াতটিঃ

قُلْ إِنَّنِىْ هَدَانِىْ رَبِّىْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا
(الانعام:١٦١)

বল হে নবী! নিঃসন্দেহে আমার রব্ব আমাকে সুদৃঢ় ঋজু পথের সন্ধান দিয়েছেন। তা এমন জীবন বিধান যা (মানুষের জীবনকে) সুদৃঢ় সঠিক করে। আর তা ইবরাহীমের মিল্লাত—সর্বদিক থেকে ফিরে এক আল্লাহ্‌মুখী হওয়া।

এ আয়াতে দ্বীন ইসলামের মৌলনীতি ও শাখা-প্রশাখার উল্লেখ হয়েছে।

বলা হয়েছে مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ - دِيْنًا قِيَمًا 'সুদৃঢ় দ্বীন ও ইবরাহীমের মিল্লাত'। এর তাৎপর্য হচ্ছে, নবী করীম (স) এমন এক শরীয়াতসহ প্রেরিত হয়েছেন, যদ্দারা তিনি জনগণকে পরম সত্যের দিকে হিদায়ত করবেন এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সেই পথের উপযোগী করে তৈরীও করবেন। তাদের পৌঁছাবেন পরম কল্যাণ ও পূর্ণত্বের পর্যায়ে। প্রত্যেক পথেরই একটা চরম লক্ষ্য থাকে। দ্বীন-ইসলাম মানুষের জীবন পথের চরম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত করেছেন আল্লাহ্‌র সেরা ও মহাসম্মানার্হ সৃষ্টি হিসেবে মানুষের জন্য উপযুক্ত পরিণতি। আর দ্বিতীয়, ওহী সূত্রে পাওয়া নয়—এমন আইন-বিধান বাহ্যত যত যুক্তিসঙ্গত ও যুগ চাহিদা সম্মতই মনে হোক, তা মানুষের লালসা-কামনার অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ আলোচনা থেকে 'আইন-প্রণয়নে তওহীদী আকীদা' স্পষ্ট হয়ে উঠে। নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, এ কাজের অধিকার যেমন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য সংরক্ষিত, তেমনি অন্য সকলের নিকট সে অধিকার সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নেয়া হয়েছে। অতএব এ অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর আছে বলে মনে করাই সুস্পষ্টরূপে শির্‌ক। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি থেকেও তাই বোঝা যায়ঃ

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ* (الحج: ٦٧)

প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনাচরণ বিধি বানিয়ে দিয়েছি, তারা তদানুযায়ী আচরণ গ্রহণ করেছে। অতএব দ্বীন-পালনে তোমার সাথে যেন কেউ বিবাদ না করে। তুমি তোমার রব্ব্ এর পথের দিকে আহবান জানাতে থাক। কেননা তুমি নিঃসন্দেহে সুদৃঢ়-ঋজু হিদায়তের বিধানের উপর স্থির রয়েছ।

আয়াতে যে منسك জীবনাচরণ বিধির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ্র নাযিল করা শরীয়াত। তা তিনি প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকেই দিয়েছেন। উত্তরকালে কালের অগ্রগতির সাথে সাথে এবং জনগোষ্ঠীসমূহের উৎকর্ষ বিকাশ, অগ্রগতি ও প্রয়োজনের পরিধি প্রশস্ততর হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ থেকে তাতে পূর্ণত্ব সৃষ্টির প্রয়োজন মনে করেছেন, যদিও তা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী ও তাদের সময়কালের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ছিল।

প্রসঙ্গত এখানে তিনটি শব্দের খানিকটা বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে হচ্ছে। সে শব্দ তিনটি হচ্ছে الدين، الشريعة، الملة সূরা আন্-আম-এর পূর্বোদ্ধৃত ১৬১ নং আয়াতে الدين ও ملة শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআনী পরিভাষানুযায়ী الدين হচ্ছে আল্লাহ্র দেখানো সেই সাধারণ পথ যা প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক স্থানের সকল শ্রেণীর মানুষকে শামিল করে এবং তাতে একবিন্দু পরিমাণ পার্থক্য, পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম স্বীকার করে না কালের অগ্রগতি ও মানব বংশের বিবর্তন যতই হোক না কেন। সেই সকল মানুষের জন্য তা সাধারণ ও অভিন্ন বিধায় তা মেনে চলা সকলের জন্যই কর্তব্য। তা ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়েই একই ধরন ও ভঙ্গীতে কোনরূপ পারস্পরিক বিরুদ্ধতা বৈপরীত্য ছাড়াই উপস্থাপিত হয়।

এ কারণে কুরআন মজীদে এ শব্দটি সর্বত্র একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে, বহুবচনে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। যেমন বলা হয়েছেঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ (ال عمران: ١٩)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট দ্বীন কেবলমাত্র ইসলামই গ্রহণীয়।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ* (ال عمران: ٨٥)

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন যে লোকই পেতে চাইবে, তার নিকট থেকে তা কক্ষণই গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হবে।

পক্ষান্তরে 'শরীয়াত' (شريعة) বলতে বোঝায় নৈতিক ও সামষ্টিক শিক্ষার সমষ্টি, যাতে কালের পরিবর্তন ও সমাজ-বিবর্তনের সাথে সাথে কিছুটা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন ও

চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে। ফলে এই শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হতে কোন অসুবিধা নেই। কুরআনে বহুসংখ্যক শরীয়াতের অবকাশ স্বীকার করা হয়েছে। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা-আলাদা শরীয়াতের অস্তিত্ব কুরআন স্বীকৃত।

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا (المائدة: ٤٨)

তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য শরীয়াতের বিধান ও কর্ম পদ্ধতি বানিয়ে দিয়েছি।

আসলে সমস্ত মানুষকে এক ও অভিন্ন দ্বীন পালনেরই আহবান জানানো হয়েছে। আর তা হচ্ছে ইসলাম। তার মৌল নীতি ও আদর্শ সর্বকালে ও সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন রয়েছে। আর শরীয়াত যুগ কাল ও মানব বংশ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ছিল, যদিও এক অভিন্ন দ্বীনের দিকে যাওয়ার জন্য তা একটি পথ হিসেবেই চিহ্নিত রয়েছে।

আর 'মিল্লাত' (ملـة) বলতে বোঝায় রীতিনীতি, যা অনুসরণ করে মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়। এ শব্দের মধ্যে অন্যদের থেকে গ্রহণের অবকাশ থাকার ভাবধারা পুরাপুরি বিদ্যমান। এ কারণে কুরআনে তা নবী-রাসূল ও জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত করে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ

بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا (البقرة: ١٣٥)

বরং ইবরাহীমের মিল্লাত যা সর্ব দিক থেকে ফিরে একমুখী।

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ (يوسف: ٣٧)

আমি সেই জনগণের রীতি-নীতি পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার নয়।

এ থেকে বোঝা যায়, 'মিল্লাত' ও 'শরীয়াত' অর্থ ও তাৎপর্যগতভাবে অভিন্ন, যদিও একটি দিক দিয়ে পার্থক্য থেকে যায়। আর তা হচ্ছে, 'মিল্লাত' শব্দটি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সাথে সম্পর্কিত হয়। যেমন বলা হয়; 'মিল্লাতে মুহাম্মাদ' বা 'মিল্লাতে ইবরাহীম' কিন্তু আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত করা হয় না, 'আল্লাহ্‌র মিল্লাত'—এটা বলা যাবে না।

চতুর্থ ভাগের আয়াত

এ পর্যায়ের আয়াতসমূহে 'তাগুতে'র নিকট বিচার বা আইনের কার্যকরতা (Execution) চাওয়া থেকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। যেমন রাসূলে করীম (স)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছেঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا* (النساء: ٦٠)

তুমি কি সেই লোকদের অবস্থা বিবেচনা করে দেখনি যারা মনে করে যে, তারা ঈমান এনেছে তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে অবতীর্ণ বিধানের প্রতি; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাগূতের নিকট বিচার ও আইনের কার্যকরতা চাইবার ইচ্ছা করে, অথচ তাকে অস্বীকার করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাদেরকে। আসলে শয়তানই তাদেরকে গুমরাহ করে বহুদূরে সরিয়ে নিতে চায়।

এ আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার ব্যক্তি ও জনসমষ্টি মাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান পালন করা, তার বিপরীত যে তাগুতী আইন ও শাসন প্রচলিত রয়েছে তাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করা, তাদের নিকট আইনের শাসন বা বিধান চাওয়া। জোর পূর্বক চাপাতে ও মানতে বাধ্য করতে চাইলে তাকে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করা। কিন্তু কিছু লোক নিজদিগকে ঈমানদার মনে করেও তা করতে রাযী হয় না; বরং ঈমানদার হওয়ার দাবি করার পরও তারা 'তাগূতে'র নিকট বিচার চায় ও তাগূতী আইনের শাসন মেনে নেয়। তাদের এ ঈমানের কোনই মূল্য আল্লাহ্‌র নিকট স্বীকৃত নয়।

এমনিভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত রীতি-নীতি ও আইন-কানুন সম্পূর্ণ গ্রহণ ও অবলম্বন করে তাগূতী সমাজ, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে থাকবার জন্য প্রতিটি মুসলমান ব্যক্তি ও সমাজ-সমষ্টিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* (البقرة: ٢٥٦)

দ্বীন গ্রহণে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। হিদায়ত গুমরাহী থেকে সম্পূর্ণ পৃথব ও প্রকট হয়ে গেছে। অতঃপর যে লোক তাগূতকে অস্বীকার করবে ও

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণ করবে, সে এমন এক সুদৃঢ় রজ্জু শক্ত করে ধারণ করল, যা কখনই ছিন্ন হয়ে যাবে না। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে বলা হয়েছে তাগুতকে অস্বীকার ও অমান্য করাকে। তাগূত—তাগূতী আধিপত্য, কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব ও শাসন পূর্ণমাত্রায় অস্বীকার না করা পর্যন্ত এক আল্লাহ্‌র প্রতি তওহীদী ঈমান গ্রহণ ও বাস্তব অনুসরণ সম্ভব নয়। আর তওহীদী ঈমান গ্রহণ এক সুদৃঢ় ব্যবস্থা। তার কোন ক্ষয় নেই, লয় নেই। তাতে নেই কোন ব্যর্থতা।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓءُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ* (البقرة: ٢٥٧)

আল্লাহ্ বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন ঈমানদার লোকদের। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে নিয়ে আসেন। আর কাফিরদের বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে তাগূত। তা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে আসে। ওরাই জাহান্নামী, চিরদিনই সেখানে থাকবে।

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার ও তাগূতের অনুসারী লোকদিগকে সুস্পষ্টরূপে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ঈমানদার লোকদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্। আর কাফিরদের বন্ধু পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন তাগূতী শক্তি। তাগূতী শক্তির অনুসারী লোকেরা যেমন আল্লাহ্‌র বিধান মানতে প্রস্তুত হয় না তেমনি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার লোকদেরও কর্তব্য হচ্ছে তাগূতকে—তাগূতী কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব ও আইন শাসনকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা।

আল্লাহ্‌র কিতাব পাওয়া সত্ত্বেও যারা তাগূতকে অস্বীকার করেনি, তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ অনিবার্য। বলা হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا* (النساء: ٥١ - ٥٢)

যাদেরকে কিতাবের একটা অংশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে তুমি দেখেছ, তারা কিভাবে আল্লাহ্ বিরোধী শক্তি ও তাগূতের প্রতি ঈমান রাখে এবং বলে—কাফিররা ঈমানদার লোকদের তুলনায় অধিক সৎপথ অনুসারী। এদের উপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। আর আল্লাহ্ যার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন, তার সাহায্যকারী কাউকেই পাবে না।

অথচ আল্লাহ্ প্রেরিত সব নবী-রাসূলের প্রথম দাওয়াতই ছিল এই তাগূত ও আল্লাহ-বিরোধী শক্তিকে অস্বীকার করারঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النمل: ٣٦)

এবং প্রত্যেক জনসমষ্টিতেই আমরা রাসূল পাঠিয়েছি এই দাওয়াত দিবার দায়িত্ব দিয়ে যে, তোমরা সকলে এক আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল কর এবং তাগূতকে সর্বতোভাবে বর্জন কর।

এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রশ্নটি হচ্ছে—কুরআনের আইন তো অপরিবর্তনশীল, স্থায়ী, চিরন্তন। ক্ষেত্র ও পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করার লক্ষ্যেও তাতে কোনরূপ পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কুরআনী আইনের প্রয়োগ কি করে সম্ভব হবে?

জবাবে বলা যায়, পরিবর্তন ও বিবর্তন যা কিছু ঘটে, তা মূল অবস্থায় ও তার আসল রূপে নয়, তার বাহ্যিক রূপ ও আকৃতি বদলে যেতে পারে। আর আইনের ক্ষেত্রে তার অন্তর্নিহিত মৌল ভাবধারাই সংরক্ষণীয়; তার শিরোনাম বা বাহ্যিক রূপ নয়।

যেমন অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষার ব্যাপারটি। অনেক সময় এক্ষেত্রে একই নিয়ম চালু রাখা সম্ভব হয় না। অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আমরা বলব, যে পরিবর্তন সাধন করারই প্রয়োজন দেখা দেবে, তা শুধু ইসলামী আইনের প্রয়োগে, মৌল ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। কেননা ইসলামী সরকারকে সব সময় মুসলিম জনগণের সাধারণ ও সার্বিক কল্যাণকেই সামনে রাখতে হবে। এ পর্যায়ে কুরআনের আইন হলোঃ

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً* (النساء: ١٤١)

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের উপর কাফিরদের প্রাধান্য বিস্তারের কোন পথই করে দেবেন না।

অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র কোন অবস্থায়ই এমন নীতি গ্রহণ করতে পারবে না, যার ফলে মুসলমানদের উপর কাফিরদের প্রাধান্য বিস্তার ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ ঘটতে পারে। কুরআনের এ মৌল আইনকে রক্ষা করেই পরিবর্তিত অবস্থায়ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রকে।

এ ছাড়া দুনিয়ার অপরাপর রাষ্ট্র-সরকারের সাথে নীতি নির্ধারণে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে সুস্পষ্ট আইন ঘোষিত হয়েছেঃ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ* اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ* (الممتحنة: ٨-٩)

দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নি এবং যারা তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের সাথে তোমরা ভাল ব্যবহার করবে বা তাদের প্রতি সুবিচার করবে, তা থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন সেই লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘড়-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কৃত করার ব্যাপারে অন্যদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। যারা এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারাই জালিম হবে।

এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, ইসলামের দুশমন—ইসলামের সাথে যুদ্ধরত জাতির বা রাষ্ট্রসমূহের সাথে নতুন করে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা ওরা তো সেই লোক ও রাষ্ট্র, যারা মুসলমানদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেছে, তাদের উপর আগ্রাসন চালিয়েছে।

পক্ষান্তরে দুনিয়ার অন্যান্য শান্তিকামী ও শান্তির নীতি অনুসরণকারী জনগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রসমূহের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপন, তাদের প্রতি শুভ আচরণ প্রদর্শন এবং তাদের প্রতি ন্যায়-নীতি অবলম্বন কিছুমাত্র নিষিদ্ধ নয়।

অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার ব্যাপারেও কুরআন স্পষ্ট মৌলনীতি পেশ করেছেঃ

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ (الانفال: ٦٠)

এবং শত্রুদের মুকাবিলায় যতদূর সাধ্যে কুলায় তোমরা শক্তি সংগ্রহ ও প্রস্তুত কর।

এ নির্দেশের কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে দুনিয়ার অপরাপর সামরিক শক্তির তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠা একান্তই কর্তব্য হয়ে পড়ে। এ এমন এক আইন, যাতে কোন পরিবর্তন করার একবিন্দু অবকাশ বা প্রয়োজন কোন দিনই দেখা দিতে পারে না। তবে তার মাত্রায় পার্থক্য ঘটতে পারে যুগের অগ্রগতির প্রেক্ষিতে নিত্য নতুন চাহিদা অনুযায়ী।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র দেয়া আইন মানুষের হাতের ক্রীড়নক নয়। এ পর্যায়ে মৌলিক আইনের মানবীয় জীবনের বিবর্তনের তাকীদে যত পরিবর্তনেরই প্রয়োজন দেখা দিক-না-কেন। এ আইন দৃঢ় প্রতিষ্ঠার, শাশ্বত এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির বিবর্তন ও অগ্রগতির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে অগ্রসর হতে ও সকল সমস্যার সমাধান করতে, সকল চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।

পঞ্চম ভাগের আয়াত

এ ভাগে সে আয়াত উল্লেখ্য, যাতে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের তীব্র ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে তাদের পণ্ডিত পুরোহিত-আলিম-পাদ্রীগণকে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে 'রব্ব্‌' বানাবার কারণে।

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ

(التوبة: ٣١)

ওরা ওদের পণ্ডিত-পুরোহিত-পাদ্রীদেরকে রব্ব্‌ বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে, আর মরিয়ম-পুত্র মসীহকেও.................।

ওরা ওদের পণ্ডিত-পুরোহিত-পাদ্রীদের রব্ব্‌ বানিয়েছিল কেমন করে? ওরা কি তাদের ইবাদত করত? না, ইবাদত করতো না। তবে আইন প্রণয়নের

নিরংকুশ অধিকার ওরা তাদেরকে দিয়েছিল এবং ওরা যে আইন-ই বানাতো, যে আদেশ বা নিষেধই করতো, তা-ই ওরা নির্বিকারচিত্তে ও অকপটে মেনে নিতো বিনয়-অবনত মস্তকে। আর কুরআনের দৃষ্টিতে এই অধিকার যাকেই দেয়া হবে, তাকেই রব্ব্ বানানো হবে। কুরআনের তওহীদী আকীদা হচ্ছে, রব্ব্ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ছাড়া রব্ব্ আর কেউই নয়, হতে পারে না। তাই ওরা ওদের পাদ্রী-পুরোহিত-পণ্ডিতদের রব্ব বানিয়ে আল্লাহ্র সাথে শির্ক করেছে, তওহীদ-পরিপন্থী কাজ করেছে।

ষষ্ঠ ভাগের আয়াত

এ পর্যায়ে উল্লেখ্য সে সব আয়াত, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন আল্লাহ্ ও রাসূলের আগে আগে চলে যাওয়া থেকে। বলা হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (الحجرات: ١)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের অগ্রে কাউকে স্থান দেবে না। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই জানবে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

কোন কোন লোক রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশকে যথাযথভাবে মানে নি বলে আল্লাহ্ অত্যন্ত কড়া ভাষায় এই নিষেধবাণী উচ্চারণ করলেন। আল্লাহ্ বা রাসূলের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করে অন্য কারোর ইচ্ছা বা নির্দেশ মত কাজ করলেই তাকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের অগ্রে স্থান দেয়া হবে। তাই এর পরে বলা হয়েছেঃ

وَاعْلَمُوْآ اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ (الحجرات: ٧)

এবং তোমরা অবশ্য ভুলে যাবে না যে, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের মধ্যেই অবস্থান করছে। সে যদি বহু বিষয়ে তোমাদের অনুসরণ করে, তাহলে তোমরা অবশ্যই বহু কষ্টের মধ্যে পড়ে যাবে।

অর্থাৎ কুরআনের নির্দেশ হল—তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলকেই মেনে চলবে। অথচ তোমরা চাচ্ছ, রাসূল তোমাদের কথামত কাজ করুন, তোমাদের মেনে চলুন। এটা ইসলামী ব্যবস্থার বিপরীত।

উপরে ছয়টি ভাগে উদ্ধৃত আয়াতসমূহ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, আইন রচনার অধিকার আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যের কোন লোককেই দেন নি। কাজেই আমরা এই অধিকার কাউকেই দিতে পারি না—কোন মানুষের রচিত আইন মেনে নিতে পারি না। আমরা যদি তার ব্যতিক্রম কিছু করি, তাহলে তওহীদের সুস্পষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে শির্কের আবর্তে পড়ে যাব, নিঃসন্দেহে।

বস্তুত আইন প্রণয়ন একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ। তিনি নিজেই তা করেছেন। বান্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় আইনের মৌল ধারাসমূহ তিনি নিজেই নির্ধারিত করে নাযিল করে দিয়েছেন এবং তা সবই কুরআনে ও সুন্নাতে রাসূলে বিধৃত রয়েছে। এক্ষণে কেউ যদি মনে করে যে, এ অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোরও রয়েছে এবং সেও মানুষের জন্য হালাল-হারাম নির্ধারণ করতে পারে এবং তা আমাদের মেনে নেয়া উচিত, তাহলে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে সেই অন্যকে রব্ব বানানো হবে। আর কুরআনের ঘোষণায় তাই হচ্ছে সুস্পষ্ট শির্ক।

কেউ অবশ্য প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, উপরের কথা-ই যদি সত্যি হয়, তাহলে রাসূলে করীম (স) যে নানা ধরনের আইন মুসলমানদের জন্য দিয়েছেন, তা তিনি কিভাবে দিলেন আর রাসূলের সুন্নাত মানতেই বা আমরা কি করে বাধ্য হতে পারি এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের—তওহীদ বিশ্বাসী মুসলিমদের করণীয় কি? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়ঃ

১. আল্লাহ্ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায দুই রাকআত দুই রাক'আত করে ফরয করেছিলেন, যেন নামাযের মোট রাক'আত সংখ্যা দশ হয়। কিন্তু রাসূলে করীম (স) দুই দুই রাক'আত করে এবং মাগরিবের এক রাক'আত বারিয়ে দিয়েছেন।

২. আল্লাহ্ তা'আলা বছরে শুধু রমযানের একমাসব্যাপী রোযা ফরয করেছেন, অথচ রাসূলে করীম (স) শাবান মাসে ও অন্যান্য মাসে তিনটি করে রোযা চালু করেছেন।

৩. আল্লাহ্ তা'আলা তো হারাম করেছেন মদ্যপান। কিন্তু রাসূলে করীম (স) হারাম করেছেন সকল প্রকারের মাদক দ্রব্য। এবং

৪. আল্লাহ্ তা'আলা সকলের জন্য মীরাসের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন; কিন্তু দাদাকে কোন অংশ দেননি। অথচ রাসূলে করীম (স) দাদাকে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন। এটা কেমন করে করলেন?

জবাবে বলা যায়—আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিশেষ ব্যবস্থায় রাসূলে করীম (স)-কে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন, মানুষের প্রকৃত কল্যাণ

অকল্যাণ সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় পারদর্শী করে দিয়েছেন। আর আইন যেহেতু মানুষের কল্যাণ নির্ভর, আর রাসূলে করীম (স) সে বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হয়েছিলেন, সেই কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের আইন করার অধিকার আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি যা করেছেন, আল্লাহ্র নিকট থেকে শিক্ষা পেয়ে, তাঁর অনুমতি নিয়ে ও অনুমতিক্রমেই করেছেন। কাজেই আইনের ক্ষেত্রে তাঁর যা কিছু করা, তা মূলত আল্লাহ্রই করা যদিও তা রাসূলের জবানীতে এবং তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহ্ নিজেই রাসূলের পরিচিতি দিয়ে বলেছেনঃ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

(الاعراف: ١٥٧)

নবী লোকদেরকে ভালো কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে এবং তাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল ঘোষণা করে ও খারাপ-নিকৃষ্ট জিনিসসমূহ হালাল ঘোষণা করে। আর তাদের উপর থেকে তাদের সেই দুর্বহ বোঝা ও শৃঙ্খলসমূহ সরিয়ে দেয়, যা তাদের উপর চেপে বসেছিল।

ভালো ও উত্তম-উৎকৃষ্ট জিনিসকে হালাল এবং মন্দ-খারাপ ও নিকৃষ্ট ক্ষতিকর জিনিসকে হারাম ঘোষণার জ্ঞান এবং অধিকার দুটিই তিনি সরাসরিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে পেয়েছিলেন। তাই তিনি যা হালাল বা হারাম ঘোষণা করেছেন, তা মূলত আল্লাহ্ কর্তৃক চিহ্নিত। অতএব তা আল্লাহ্র বিধান হিসেবেই আমাদেরকে মানতে হবে। তাতে আল্লাহ্র কথা হালাল-হারাম ও রাসূলের ঘোষিত হালাল-হারামের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা চলবে না—তার অধিকার আমাদের নেই।

এই চূড়ান্ত কথার প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। তা হলো আধুনিক কালে একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ইসলামী আইন প্রয়োগ ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অভিনব বিষয়ে ইসলামী আইনের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ কিভাবে করবে?

জবাবে বলতে চাই—এজন্য দুটি সংস্থা খুব সহজেই কাজ করতে পারে। প্রথম, সাধারণভাবে সমাজের নিত্য নতুন চাহিদা পূরণের জন্য ফতোয়া দেয়ার কাজে কিছু সংখ্যক শরীয়াত-পারদর্শী লোক নিয়োজিত থাকবেন। তাঁরা হবেন

ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁরা কুরআন ও প্রমাণিত সুন্নাতের ভিত্তিতে শরীয়াতের আইন-বিধান 'ইস্তিম্বাত' (To contrive) করবেন। কেবল নিজেদের চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতেই নয়, কুরআন-সুন্নাহ্‌র অকাট্য দলীলকে ভিত্তি করে তারই আলোকে এই কাজটা করতে হবে। অবশ্য সাহাবীগণের আমল আদর্শ হিসেবে অনুসরণীয় হবে।

আর দ্বিতীয়ত, থাকবে জাতীয় পর্যায়ে একটি 'মজলিসে শূরা'। এই মজলিসের কাজ হবে দেশের অর্থ, রাজনীতি ও সমাজ-অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী আইন প্রয়োগের উপায় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা—ইসলামী আইনের আলোকে।

তবে এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা যে নিষেধ ও সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, তা অবশ্যই সম্মুখে রাখতে হবে। তা হচ্ছেঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ،

(النحل:١١٦)

এবং তোমাদের মুখে যাই আসে সেই অনুযায়ী মিথ্যা-মিথ্যি বলে দিও না যে, এটা হালাল আর এটা হারাম।

আনুগত্যে তওহীদ

আনুগত্যের ব্যাপারটিও তওহীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। তার অর্থ, মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই আনুগত্য করতে বাধ্য নয়। কেননা সমগ্র বিশ্বলোক একমাত্র আল্লাহ্র সৃষ্টি। এখানকার প্রতিটি অনু-পরমাণু এক আল্লাহ্র আইন মেনে চলছে প্রতি মুহূর্ত; সবকিছু কেবল তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পিত হয়ে। কুরআন মজীদ ঘোষণা করেছেঃ

وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ۞

(ال عمران: ٨٣)

এবং তাঁর (আল্লাহ্র)-ই সমীপে আত্মসমর্পিত হয়ে রয়েছে তারা সকলেই, যারাই আসমান ও জমীনে রয়েছে—ইচ্ছা করে হোক, কি বাধ্য হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত সকলকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ۞ (الروم: ٢٦)

بَلْ لَّهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ۞ (البقر: ١١٦)

এ দু'টো আয়াতেরই তরজমা হচ্ছে, 'আসমান-জমীনে যারাই বা যা কিছুই আছে তারা সবই আল্লাহর একান্ত অনুগত তাঁর সম্মুখে বিনয়-অবনত।'

সমগ্র সৃষ্টিলোকের সকল-ই এবং সবকিছুই যখন এক আল্লাহ্র অনুগত, তখন এই বিশ্বলোকের একটি অংশে—পৃথিবীতে—বসবাসকারী সব মানুষেরই স্বাভাবিকভাবেই কর্তব্য হচ্ছে সেই এক আল্লাহ্রই অনুগত হয়ে থাকা, সমগ্র জীবনব্যাপী সমগ্র ক্ষেত্রে ও কাজে আনুগত্য করা এবং কেবল তাঁরই আদেশ-নিষেধ সমূহ পূর্ণ আনুগত্যের সুগভীর ভাবধারা সহকারে যথাযথভাবে পালন করা। অবশ্য সেই এক আল্লাহ্ই যদি তাঁকে ছাড়া আর কারোর আনুগত্য করার অনুমতি বা আদেশ দিয়ে থাকেন, তবে তারও আনুগত্য করা সেই আল্লাহ্রই হুকুম পালনের জন্য। আর তিনিই যদি তেমন আদেশ কারোর পক্ষে না দিয়ে থাকেন, তাহলে তার আনুগত্য না করা।

তার কারণ হচ্ছে, আনুগত্য মালিকের প্রাপ্য মালিকানাধীনের নিকট থেকে। তা পাওয়ার অধিকার পালনকর্তার পালিতের নিকট থেকে। আর একথা স্বীকৃত

যে, সারে জাহানের সৃষ্টিকর্তা, রব্ব, মালিক ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। অতএব সর্বপ্রকারের আনুগত্য একমাত্র তাঁরই পাওয়ার অধিকার।

এখানে আনুগত্যের তাৎপর্য হচ্ছে, আমাদের জীবন, শক্তি-সামর্থ্য, সম্পদ ও সময় যা কিছুই আছে, তা যিনি আমাদেরকে দান করেছেন তাঁরই নির্দেশানুযায়ী সেগুলোকে ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে আমরা বাধ্য। তিনি যা যেখানে ও যেভাবে ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন, তা সেখানে ও সেভাবে ব্যবহার না করা এবং যা যেখানে ও যেভাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন সেভাবে সেখানে তা ব্যবহার করা সুস্পষ্টরূপে জুলুম। আর 'জুলম' কখনই যুক্তিসঙ্গত ও বিবেক-বুদ্ধিসম্মত কাজ হতে পারে না। মূলত আনুগত্যের ক্ষেত্রে তওহীদ হচ্ছে কার্যাবলীতে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌কে মেনে চলা। আমরা যখন একান্তভাবে মেনে নিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ সৃষ্টিকর্তা-পালনকর্তা-রক্ষাকর্তা নেই, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আনুগত্য পাওয়ার অধিকারীও আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই।

এ পর্যায়ে প্রথম উল্লেখ্য আয়াত হচ্ছেঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ *

(فاطر: ١٥)

হে মানুষ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র প্রতি মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মুখাপেক্ষীহীন সর্বজন প্রশংসিত।

এ কারণেই কুরআন আনুগত্যের ব্যাপারটিকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই সংরক্ষিত ঘোষণা করেছেঃ

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ

(التغابن: ١٦)

অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যতদূর তোমাদের সাধ্যে কুলায় এবং শোন ও মেনে চল। আর নিজেদের জন্য ধন-মাল ব্যয় কর।

নিম্নোদ্ধৃত আয়াতাংশে মু'মিনদের প্রশংসা করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ শুনে ও মানে। অন্য কথায় তারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করেঃ

وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ * (البقرة: ٢٨٥)

এবং তারা বলল, আমরা শুনেছি এবং মেনেও নিয়েছি, হে আল্লাহ্ আমরা কেবল তোমারই ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকটই পরিণতি লাভ হবে (বলে স্বীকার করছি)।

আল্লাহ্ তা'আলা আনুগত্যকে কেবল তাঁরই জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক জগত ও মানবীয় জগতের মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণে প্রাকৃতিক জগতে এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছাড়া আর কারোরই আনুগত্যের এক বিন্দু অবকাশ না রেখে কেবলমাত্র মানবিক জগতে আল্লাহ্ ছাড়া আল্লাহ্‌র রাসূলেরও আনুগত্য করার অবকাশ রেখেছেন এবং তার অনুমতিও দিয়েছেন। তাই রাসূল(স)-এর আনুগত্য করা জায়েয শুধু এই কারণে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ই তাঁর অনুমতি দিয়েছেন। বলেছেনঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (النساء: ٦٤)

আমরা যখনই যে রাসূল পাঠিয়েছি তা এজন্য পাঠিয়েছি যে, তার আনুগত্য বা অনুসরণ করা হবে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে।

এ আয়াত স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, নবী-রাসূলের আনুগত্য আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অধীন, তার শাখামাত্র। আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পরিধির বিশালতার মধ্যেই তার স্থান। রাসূল (স)-এর স্বয়ংসম্পূর্ণ বা নিজস্বভাবে মানুষের আনুগত্য পাওয়ার কোন অধিকার নেই। তিনি আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হয়েছেন শুধু এই কারণে যে, আল্লাহ্ নিজেই তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি তিনি এই অনুমতি বা নির্দেশ না দিতেন, তাহলে তাঁর আনুগত্য পাওয়ার কোন অধিকারই হতো না। আল্লাহ্ও রাসূলের আনুগত্য করার অনুমতি বা আদেশ দিয়েছেন এজন্য যে, রাসূলের আনুগত্য করা হলেই কার্যত আল্লাহ্‌র আনুগত্য হয়ে যায়। অন্য কথায়, রাসূল (স) -এর আনুগত্য না করলে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা যায় না। তাই ইরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ (النساء: ٨٠)

যে লোক রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল।

আনুগত্যের ব্যাপারে আল্লাহ্ প্রেরিত নবী-রসূলের অবস্থাই যখন এই, তখন নবী-রাসূল ছাড়া অন্যদের সম্পর্কে আর কি বলার থাকতে পারে। বস্তুত-ই আল্লাহ্ ছাড়া আর এমন কেউ-ই কোথাও নেই, মানুষের নিকট আনুগত্য

পাওয়ার যার নিজস্ব কোন অধিকার থাকতে পারে। তবে আল্লাহ্ নিজেই যার য়ার আনুগত্য করার অনুমতি বা হুকুম দিয়েছেন, তার তার আনুগত্য করা যাবে, করতে হবে শুধু আল্লাহ্র হুকুম পালনের জন্য। আবার আল্লাহ্ যদি কারোর আনুগত্য করার অনুমতি বা নির্দেশ দিয়েও বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ ব্যাপারে সে অনুমতি বা আদেশ প্রত্যাহার করে থাকেন, তাহলে সেই বিশেষ অবস্থায় তার আনুগত্য করা যাবে না।

আল্লাহ্ নিজেই যার যার আনুগত্য করার অনুমতি বা নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আসেন নবী-রাসূলগণ। তারপরের স্থান হচ্ছে মুসলিম সামাজের সামষ্টিক কার্যাবলীর দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের পরে পিতা-মাতার আনুগত্য।

রাসূলে করীম (স)-এর আনুগত্য

রাসূলে করীম (স) -এর আনুগত্য করা আল্লাহ্র মৌলিক ও নিজস্ব আনুগত্যের ভিত্তিতে কর্তব্য বলে কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে। আর সে আনুগত্য হচ্ছে রাসূলের আদেশসমূহ পালন ও তাঁর কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যসমূহ পরিহার করার মধ্যে নিহিত। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ রাসূলে করীম (স) -এর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেনঃ

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ* (ال عمران: ٣٢)

বল হে নবী! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং রাসূলের।...... পরে ওরা যদি পৃষ্ট প্রদর্শন করে, তাহলে জানবে, আল্লাহ্ কাফিরদের পছন্দ করেন না।

আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। যদি কেউ আল্লাহ্র বা রাসূলের আনুগত্য না করে, তাহলে সে কাফির গণ্য হবে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ (النساء: ٥٩)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের।

এ আয়াতে আল্লাহ্র আনুগত্যের আদেশের পর স্বতন্ত্রভাবেই রাসূল (স)-এর আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং এ উভয় আনুগত্যকে ঈমানের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। তার অর্থ দাঁড়ায়, ঈমানদার হলে অবশ্যই আল্লাহ্র

এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ্‌র বা আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্য না করলে ঈমানদার থাকা সম্ভব হবে না।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا (الانفال-٤٦)

এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন কর (অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করতে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি যেন না হয়)।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (الانفال: ١)

এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক (আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলের আনুগত্যও শর্ত ঈমানদার হওয়ার জন্য)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ*

(الانفال: ٢٠)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের। তা থেকে তোমরা ফিরে যেও না এরূপ অবস্থায় যে, তোমরা (রাসূলের কথা) শুনতে পাচ্ছ।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا (المائدة: ٩٢)

এবং তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের। আর তোমরা বিবাদ বা ঝগড়া করো না। তাহলে তোমরা সাহসহীন ও পৌরুষহীন হয়ে পড়বে।

আয়াতটিতে যে বিবাদ বা ঝগড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই রাসূল (স)-এর সঙ্গে এবং রাসূল (স)-এর সঙ্গে তা করা তাঁর আনুগত্যের পরিপন্থী। আর তাঁর আনুগত্যের পরিপন্থী কাজ স্বয়ং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পরিপন্থী। আর তা-ই হচ্ছে মুমিন-মুসলিমদের সাহসহীনতা ও কাপুরুষতার মৌল কারণ।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا (النور: ٥٤)

বল হে নবী! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের। অতঃপর তারা যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহলে তার উপর তাই থাকবে যা তার উপর চাপানো হয়েছে এবং তোমাদের উপর তাই থাকবে যার বোঝা তোমাদের উপর চাপানো হয়েছে। আর যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরা হিদায়তপ্রাপ্ত হবে।

এ আয়াত অনুযায়ী মু'মিনদের হিদায়তপ্রাপ্ত হওয়াকে রাসূল (স)-এর আনুগত্য করার সাথে যুক্ত এবং তার উপর নির্ভরশীল বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ (محمد: ٣٣)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের। আর তোমাদের 'আমল' সমূহকে নিষ্ফল নিরর্থক করে দিও না।

আয়াতটির শেষাংশের বক্তব্য হচ্ছে, রাসূল (স)-এর আনুগত্য সহকারে আমল করা না হলে তা সবই বাতিল ও নিষ্ফল হয়ে যাবে। সে আমল আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ* (المجادلة: ١٣)

এবং তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের। আর আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ* (التغابن: ١٦)

এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, রাসূলের। তোমরা যদি তা না কর, তা হলে জানবে, আমাদের রাসূলের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু পূর্ণমাত্রায় ও সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আনুগত্যস্বরূপ রাসূলে করীম (স) -এর আনুগত্য করার বারবার আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি এক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ের ঘোষণা দিয়ে এতদূর বলেছেন যে, মুসলিম জনগণের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে চূড়ান্ত ফয়সালা ও মীমাংসাকারীরূপেও তাঁকেই মানতে হবে এবং তিনি যে

রায়-ই দেবেন, তা নিঃসংকোচে মেনে নিতে হবে। অন্যথায় কেউ-ই ঈমানদার গণ্য হতে পারবে না। ইরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا* (النساء: ٦٥)

না, তোমার রব্ব্-এর কসম! লোকেরা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না যদি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে হে নবী—তোমাকে তারা বিচারক মেনে না নেয় এবং তুমি যে ফয়সালা দেবে, তা তারা নিঃসংকোচে গ্রহণ না করে ও পুরাপুরিভাবে মাথা পেতে মেনে না নেয়।

কতিপয় আয়াতে আল্লাহ্র আনুগত্য এবং রাসূল (স)-এর আনুগত্য সমান মানে করার কথা বলা হয়েছে। এখানে সে আয়াতসমূহ উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ (النساء:٦٩)

আর যে লোকই আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা সেই লোকদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামত বর্ষণ করেছেন।

وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ* (النور: ٥٢)

আর যেসব লোক আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁর ব্যাপারে তাক্ওয়া অবলম্বন করে, তারাই সফলকাম।

وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا* (الاحزاب: ٧١)

এবং যারাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারাই বিরাটভাবে সাফল্যমন্ডিত হয়।

وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ (الفتح: ١٧)

আর যে-লোক আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্ তাকে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশ থেকে সদা ঝর্ণাধারা প্রবহমান হয়ে থাকে।

وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ (التوبة: ٧١)

এবং আনুগত্য করে আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই রহমত দান করবেন।

وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ (الاحزاب: ٣٣)

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে চল।

কোন কোন আয়াতে রাসূলের অনানুগত্য বা নাফরমানীকে সুস্পষ্ট কুফরি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা রাসূলের আদেশ অমান্য করা ও তাঁর বিদ্রোহ করা স্বয়ং আল্লাহর অমান্য ও তাঁর বিদ্রোহ করার সমতুল্য। বলা হয়েছেঃ

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ*

(ال عمران: ٣٢)

বল, আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র ও রাসূলের। ওরা যদি তা না করে (তাহলে ওরা কাফির হয়ে যাবে,) আর আল্লাহ্ কাফিরদের ভালোবাসেন না।

এই ভিত্তিতেই বলা হয়েছে যে, রাসূলকে অস্বীকার করার আসল অর্থ হলো স্বয়ং আল্লহ্ এবং তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা।

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ* (الانعام: ٣٣)

এবং নিঃসন্দেহে আমরা জানি যে, ওরা যা বলে তা তোমাকে খুবই দুঃখিত ও চিন্তান্বিত করে দিচ্ছে। আসলে ওরা তোমাকে অস্বীকার করছে না, প্রকৃতপক্ষে জালিমরা আল্লাহ্‌র আয়াতকেই অস্বীকার করছে।

এ হিসেবে কুরআনকে অসত্য মনে করা, অমান্য করা, নবীকে অস্বীকার করা, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা—এক কথায় আল্লাহ্ মানতে বলেছেন এমন

কাউকেই অস্বীকার ও অমান্য করা মূলত ও কার্যত আল্লাহ্‌কেই অমান্য ও অস্বীকার করার শামিল করে দেয়া হয়েছে।

নবীর আনুগত্যের প্রকৃত তাৎপর্য

নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র নবী ও সর্বশেষ নবী–রাসূল হিসেবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বশীল ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে—কুরআনের অবতীর্ণ আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো। সেসব আয়াতে থাকত আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধসমূহ। দ্বিতীয় হচ্ছে, আল্লাহ্‌র বিধান—আদেশ নিষেধসমূহকে নিজস্ব ভাষায় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা। এ পর্যায়ে রাসূল (সা)-এর কথাসমূহকে পরিভাষায় বলা হয় 'হাদীস'। তাতে আল্লাহ্‌র কথাগুলিকেই তিনি নিজ ভাষায় ব্যক্ত ও প্রকাশ করতেন। এসব কাজ তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবেই সুসম্পন্ন করতেন। কুরআন মজীদে রাসূলকে الشاهد 'সাক্ষ্যদাতা' المبشر সুসংবাদদাতা এবং النذير ভয় প্রদর্শক বা সাবধানকারী প্রভৃতি গুণে অভিহিত করা হয়েছে, তার সব কয়টিতেই রাসূলে করীম (সা)-এর এই দিকটিকেই স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। আর তৃতীয় হচ্ছে সেসব কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন, যা পালনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। মুসলিম জনগণের নেতৃত্বদান তন্মধ্যে প্রধান। এই দিকেই ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছেঃ

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (الاحزاب: ٦)

নিঃসন্দেহে নবী ঈমানদারদের জন্য তাদের নিজেদের উপরও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

অর্থাৎ মুসলমান জনগণের সাথে নবী করীম (স)-এর এবং নবী করীম (সা)-এর সাথে মুসলিম জনগণের যে সম্পর্ক তা অন্যান্য সমগ্র মানবীয় সম্পর্কের চাইতেও উন্নত ধরনের। কোন আত্মীয়তা বা সম্পর্কের সাথে সেই আত্মীয়তা বা সম্পর্কের তুলনা হতে পারে না, যা রাসূলে করীম (স)-এর সাথে মুসলিম জনগণের রয়েছে। তিনি মুসলমানদের সর্বাধিক কল্যাণকামী, তাদের প্রতি অত্যধিক স্নেহপরায়ণ, দয়ার্দ্র হৃদয়। অন্যরা তাদের প্রতি কোনরূপ স্বার্থপরতা দেখালেও তিনি কারোর সাথেই একবিন্দু স্বার্থপরতা দেখান না। নবী করীম (স) তাদের পক্ষে সেই কথাই বলবেন, সেই কাজই করবেন, যা তাদের জন্য কল্যাণকর। কাজেই তিনি মুসলমানদের যে উপদেশ বা নসীহত দিয়েছেন, যে পথ দেখিয়েছেন, যে কাজ করতে ও যে কাজ না করতে বলেছেন, তা মুসলমানদের পক্ষে অবশ্যই কল্যাণকর হবে বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং

তদনুযায়ী আমল করতে হবে মুসলিম জনগণকে। অন্যথায় নবীর এই দায়িত্ব পালনে সফল হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। অতএব তিনি হচ্ছেন মুসলিম জনগণের অনুসৃত একচ্ছত্র নেতা।

অনুরূপভাবে রাসূল (স) যদি অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত করতে বলেন, আদেশ করেন জিহাদে যাওয়ার জন্য, জালিমদের প্রতিরোধ ও প্রতিআক্রমণ করার জন্য—যার উপর মুসলিম সমাজ-সমষ্টির রক্ষা ও সংশোধন নির্ভরশীল—তা অবশ্যই পালন করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে রাসূলের অনানুগত্যকে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার সমতুল্য ঘোষণা করেছেন।

এসব ক্ষেত্রে নবীর আনুগত্য তেমনিভাবেই করতে হবে যেমন করতে হয় শাসকের আনুগত্য। এই শাসকের কতৃত্বাধীন সব মানুষই তার নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। অন্যথায় সে শাসকের অনুসারী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তাকে তার একজন অনুসারী বলেও স্বীকার করা যায় না। এ ক্ষেত্রে নবী শুধু 'তাবলীগ' বা পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যই দায়িত্বশীল নন, যার কাজ শুধু পৌঁছিয়ে দেয়ার, লোকেরা পালন করল কি করল না, তা দেখার কোন দায়িত্বই তার থাকে না। এই প্রেক্ষিতে নবী করীম (স)-এর প্রকৃত 'পজিশন' স্পষ্ট করে তোলার লক্ষ্যে বলা হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا*

(الاحزاب: ٣٦)

মু'মিন পুরুষ স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল যখন কোন ফয়সালা করে দেন তখন তাদের জন্য আর তা করা বা না করার কোন ইখতিয়ারই থাকে না। এরূপ অবস্থায় যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অমান্য করবে, সে সুস্পষ্টরূপেই গুমরাহ্ হয়ে গেছে বলে মনে করতে হবে।

সামষ্টিক দায়িত্বশীলদের আনুগত্য

প্রকৃত আনুগত্য একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্য সংরক্ষিত। সেই আল্লাহ্রই অনুমতি ও নির্দেশক্রমে আল্লাহ্র রাসূলেরও আনুগত্য অবশ্যই করণীয়। এছাড়াও মুসলিম সমাজে সামষ্টিক দায়িত্বশীল লোকদেরও আনুগত্য করতে হবে। তবে সে আনুগত্য কি ধরনের তা আল্লাহ্র অনুমতি বা আদেশ প্রদানের ধরন থেকেই স্পষ্ট হয়। এই পর্যায়ের আয়াত হচ্ছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا* (النساء: ٥٩)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে থেকে সামষ্টিক দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও। তোমরা যদি কোন ব্যাপারে পরস্পর মতপার্থক্যে পড়ে যাও, তাহলে সে ব্যাপারটিকে আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। এ কাজ অতীব কল্যাণময় এবং পরিণতির দিক দিয়ে খুবই উত্তম।

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার হুকুমের পরে রাসূল (স)-এর আনুগত্য করার হুকুমও স্পষ্ট ভাষায় দেয়া হয়েছে। তারপর তৃতীয় পর্যায়ে 'উলিল আমর'—'সামষ্টিক দায়িত্বশীল লোকদের'ও আনুগত্য করতে বলা হয়েছে বটে; কিন্তু তা পূর্ববর্তী দুইটি আনুগত্য নির্দেশের ন্যায় 'আনুগত্য কর'— (اَطِيْعُوْا) —এই শব্দের উল্লেখ না করেই। প্রশ্ন হচ্ছে—এখানে প্রথম দুই বারের ন্যায় তৃতীয়বারেও 'আনুগত্য কর' এই নির্দেশ স্পষ্ট ভাষায় দেয়া হলো না কেন? এর জবাব এই যে, আনুগত্য মূলত প্রাপ্য আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌রই অনুমতি ও নির্দেশের ভিত্তিতে রাসূল (স)-এরও এবং সে আনুগত্য শর্তহীন। অতঃপর নিঃশর্ত আনুগত্য পাওয়ার অধিকার আর কারোরই নেই। তবে নবীর অনুপস্থিতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য যে আনুগত্য অপরিহার্য, তা আল্লাহ্ ও রাসূল বাদে অন্যদের করা যাবে দুইটি শর্তে। প্রথম শর্ত, সে নিজে আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্য করে চলবে এবং দ্বিতীয় তারা যে কাজ করার আদেশ দেবে, তা অবশ্যই আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের আওতার মধ্যে হতে হবে। তাই যে আদেশ বা নিষেধ পালন করলে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য নষ্ট হয়, নাফরমানী হয়, তা কোনক্রমেই করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্ ও রাসূল (স) ছাড়া শর্তহীন আনুগত্য পাওয়ার অধিকার আর কারোরই নেই।

আল্লাহ্ ও রাসূল (স) ছাড়া অন্য কারোর নিঃশর্ত আনুগত্য করা যাবে না শুধু তা-ই নয়, তাদের সাথে যে কোন ব্যাপার নিয়ে মতবিরোধও করা যাবে। অথচ আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে যে কোন ব্যাপার নিয়ে মতবিরোধ করাই যেতে পারে না। আর সে মতবিরোধের বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা করতে হবে সেই আল্লাহ্

ও রাসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতে। অর্থাৎ এই তৃতীয় আনুগত্যে যদি আল্লাহ্ ও রাসূল (স)-এর আনুগত্য বিনষ্ট হয়, তাহলে তা করা যাবে না, যদি তা পালন করলে আল্লাহ্ ও রাসূল (স)-এর আনুগত্য হয় তবেই তা করা যাবে।

এমনকি সংখ্যাধিক্যের দোহাই দিয়ে বেশী সংখ্যক লোকের মত বলেও কোন কিছু মেনে নেয়া যাবে না, যদি তাতে আল্লাহ্ ও রাসূল (স)-এর আনুগত্য লংঘিত হয়। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ* (الانعام: ١١٦)

আর তুমি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের আনুগত্য বা অনুসরণ কর, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে গুমরাহ্ করে নিয়ে যাবে। কেননা এই অধিকাংশ লোক নিছক ধারণা-অনুমানেরই অনুসরণ করে চলে। আর তারা কেবল ভিত্তিহীন আনুমানিক কথাবার্তাই বলে।

পিতা-মাতার আনুগত্য

পিতা-মাতার মাধ্যমেই মানব জীবন সম্ভব হয়েছে এবং তাদের স্নেহবাৎ-সল্যপূর্ণ লালন-পালনের ফলেই সম্ভব হয়েছে দুনিয়ায় মানব বংশের অস্তিত্ব রক্ষা ও লালিত-পালিত হয়ে বর্ধিত হওয়া। তাই প্রত্যেক মানুষের উপর পিতা-মাতার আনুগত্য করা যেমন কর্তব্য বলে বিবেচিত, তেমনি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাও এজন্য বড় তাকীদ করেছেন। এমনকি মানুষের উপর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র হক্ ও তাঁর প্রতি মানুষের কর্তব্যের কথা বলার পরে-পরে ও সঙ্গে সঙ্গেই পিতা-মাতার হক ও তাদের প্রতি মানুষের কর্তব্যের কথা কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْ هُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا* (الاسراء: ٢٣-٢٤)

এবং ফয়সালা করে দিয়েছেন তোমার রব্ব্ যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারোরই ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে অতীব উত্তম নম্র

ব্যবহার করবে। তাদের দু'জনই কিংবা একজন যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে পৌঁছায়, তাহলেও তাদের জন্য কষ্টদায়ক কথা বলবে না। তাদের ভর্ৎসনা করবে না এবং তাদের জন্য সম্মানজনক কথা বলবে। তাদের খিদমতে দয়ার্দ্র্য বিনয়ের বাহু বিছিয়ে দেবে এবং বলবেঃ হে রব্ব্, তাদের দুইজনের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, যেমন করে তারা দু'জন আমার বাল্যাবস্থায় আমাকে লালন পালন করেছে।

এ আয়াতে পিতা-মাতার প্রতি 'উহ' বলতেও নিষেধ করা হয়েছে। পিতার প্রতি 'উহ' বলা যদি তাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে থাকে এবং সেজন্যই তা হারামও হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধতা করা, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা এবং তাদের অবাধ্য হওয়া-ও নিশ্চয়ই হারাম হবে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তা হারাম। তবে তা নিঃশর্ত নয়। পিতা-মাতার আদেশ অবশ্যই পালন করতে হবে। সেই পিতা-মাতা যদি কোন শির্ক এর কাজ করতে আদেশ না করে, আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানী করতে না বলে, তবেই সেকথা প্রযোজ্য হবে। কিন্তু পিতা-মাতা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানী করতে বলে, কোন শির্ক এর কাজ করতো আদেশ করে, তবে সেকথা —সে আদেশ অবশ্যই পালন করা যাবে না। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ (لقمن: ١٥)

আর পিতা-মাতা যদি তোমাকে বাধ্য করে আমার সাথে শির্ক করতে—যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞানই নেই—তাহলে তাদেরকে মানবে না। তবে তাদের সাথে দুনিয়ার জীবনে ভালো আচরণ অবশ্যই করবে। আর অনুসরণ করবে সেই লোকের পথ, যে আমার দিকে পূর্ণ নিষ্ঠা ও আনুগত্যের ভাবধারাসহ মুখ করেছে।

وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ

(النعكبوت: ٨)

যদি সে পিতা-মাতা দুইজন তোমাকে বাধ্য করে আমার সাথে শির্ক করতে—যে বিষয়ে তুমি কিছুই জানো না—তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। কেননা তোমাদেরকে আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

এর কারণ হলো, এই পিতা-মাতারও কোন মৌলিক বা নিজস্ব অধিকার নেই সন্তানের আনুগত্য পাওয়ার। সে অধিকার আল্লাহর অনুমতি ও আদেশের কারণে জন্মেছে। কিন্তু পিতা-মাতা যখনই সন্তানের নিকট আল্লাহ্র নাফরমানী ও অনানুগত্যের দাবি করবে ও সেই পর্যায়ের কাজ করতে বাধ্য করবে, তখন তাদের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্র দেয়া অনুমতি নিঃশেষ হয়ে গেছে। ফলে তখন আর সে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার থাকবে না, তা করাও যাবে না। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের ঘোষণাবলী এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (الشعراء: ١٥١)

নির্দিষ্ট সীমালংঘনকারীদের আদেশ মানবে না।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ* (القلم: ٨)

ওদের মধ্যে যারা পাপী কিংবা কুফরীতে বেশী অগ্রসর, ওদের আনুগত্য করবে না।

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْكَفُورًا* (الانسان: ٢٤)

সত্য অমান্যকারীদের আনুগত্য করবে না।

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ (الكهف: ٢٨)

এবং আনুগত্য ও অনুসরণ করবে না সেই লোকের, যার দিল আমার যিকিরশূন্য এবং সে তার খাহেশকে অনুসরণ করেছে।

এক কথায় সে সব লোককে অনুসরণ করতে ও তাদের প্রতি আনুগত্য জানাতে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন, যারা আল্লাহ্র নির্দিষ্ট করে দেয়া সীমা লংঘন করেছে, যারা নিজেরা আল্লাহ্র বিধান মেনে চলে না, তা অস্বীকার ও অমান্য করে চলে, যারা সত্য দ্বীনকে মেনে নিতে পারে নি এবং যাদের দিলে আল্লাহ্র স্মরণ নেই বরং নিজেদের মনের খাহেশকেই অনুসরণ করে চলে। কেননা এই সব লোকের আনুগত্য স্বীকার করলে আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানী করা হবে। আর আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানী করে কোন ঈমানদার মানুষই ঈমানদার থাকতে পারে না। এমন কি আল্লাহ্র পরে পরে যে- পিতা-মাতার হক সন্তানের উপর সব চাইতে বেশী, তারাও যদি এ পর্যায়ে পড়ে তাহলেও তাদের আনুগত্য করা চলবে না। তার অর্থ সন্তান পিতা-মাতার প্রতি সবচাইতে বেশী ভালোবাসা পোষণ করে স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু সেই

ভালোবাসা কোনক্রমেই অন্ধ অবিবেচক হওয়া উচিত নয়। সে ভালোবাসা যেন সন্তানকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য লংঘন করতে বাধ্য না করে। তা যেন কখনই ভারসাম্য হারিয়ে না ফেলে। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদ যে কড়া ও কঠোর নির্দেশ দিয়েছে, তা নিম্নোদ্ধৃত আয়াত দ্বারাও স্পষ্ট হয়ে উঠে। সত্যের সাক্ষ্যদান প্রত্যেকটি মু'মিনের কর্তব্য। এমনকি সে সাক্ষ্য যদি নিজের পিতা-মাতা ও অতীব নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও পড়ে তবু সে সাক্ষ্য দান থেকে বিরত থাকা চলবে না। ইরশাদ হয়েছেঃ

يَآيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُونُوا قَوّٰمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْعَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ*

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী ও আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্যদাতা হয়ে দাঁড়াও, তা যদি তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতার এবং নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও পড়ে তবুও......।

কুরআনের ঘোষণানুযায়ী মানুষের জন্য অপরিহার্য আইন প্রণয়নের অধিকার একান্তভাবে আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট। এ অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোরই নেই, আছে বলে মেনে নেয়া যায় না। এ অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে দেয়াও যেতে পারে না। কেননা মানুষ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র। আর সার্বভৌমত্ব যার স্বীকৃত হবে, আইন রচনার অধিকার কেবল তারই স্বীকৃত হতে পারে। যার সার্বভৌমত্ব নেই, আইন রচনার কোন অধিকারও তার নেই। এটা এত বেশি যুক্তিসঙ্গত কথা যে, পাশ্চাত্যের আল্লাহ্‌হীন আইন-দর্শনেও আইনের সংজ্ঞাস্বরূপ বলা হয়েছে : আইন হচ্ছে Command of the Sovereign- সার্বভৌমের নির্দেশ। এ অধিকার যাকেই দেয়া হবে, যারই আছে বলে মেনে নেয়া হবে, কুরআনের পরিভাষায় তাকেই 'রব্ব্' বানানো হবে। আর কুরআনের ঘোষণায় 'রব্ব্' হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ্।

-আল-কুরআনের আলোকে শির্‌ক ও তওহীদ

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র)

আল-কুরআনের আলোকে

শির্‌ক ও তওহীদ

খায়রুন প্রকাশনী

ISBN-984845506X